ওস্তাদ কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু

(অ. কৃ. ব.)

অসীমা প্রকাশনী

লিকাতা - ৭০০০৪১

প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৬৭
প্রকাশিকা ঃ অসীমা নস্কর
অসীমা প্রকাশনী
১৮, তারামণি ঘাট রোড
কলিকাতা—৪১

প্রচ্ছদ শিল্পী ও ব্যাক কভার অলঙ্করণ ঃ
অমর পাল (এইচ. এম. ভি)
সহযোগী ঃ অঞ্জন দাশ গুপ্ত

গ্রন্থকার চিত্র ঃ শিশির স্টুডিওর সৌজন্যে

মুদ্রক ঃ মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস্
৭০, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

শৈশবে পূর্ব বাংলায় বুড়ি গঙ্গার তীরে শুরু হয়েছিল আমার সঙ্গীত-জীবন যার অবিরাম ধারা আজও প্রবাহিত, তিন কুড়ি পনেরো বছর পেরিয়ে এসে দ্বিতীয় শৈশবে পশ্চিম বাংলায় গঙ্গার তীরে তারই স্মৃতি রোমন্থনের কিছু কিছু অংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম, অনেক কথাই না-বলা থেকে গেল, কারণ বলার কথা যত বেশী, সময় আর কর্মশক্তি তত কম।

আমার লেখাপড়া যেমন মায়ের ঘরোয়া পাঠশালায় খুব অল্প বয়সে শুরু হলেও স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল বারো বছর বয়সে (১৯২৪) ছয় নম্বর শ্রেণীতে। তেমনি আমার সঙ্গীত প্রেম ও সঙ্গীত চর্চা খুব কম বয়সে শুরু হলেও ওস্তাদী গান অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ-রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে প্রথম প্রকৃত পরিচয় ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে (১৯৩৪)।

সঙ্গীত-স্মৃতি-রোমন্থন শুরু করেছিলাম সঙ্গীত-গুরু 'ওস্তাদ ৺গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবে'র স্মৃতি দিয়ে যিনি রাগ সঙ্গীতে আমাকে প্রথম অনুপ্রাণিত করে তার অনন্ত মহিমার মহা সমুদ্রের দিকে আমার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তার পর অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছেন আমার সর্বপ্রথম সঙ্গীত গুরু সঙ্গীতাচার্য ৺কৃষ্ণ চন্দ্র দে এবং সর্বশেষ গুরু সঙ্গীতাচার্য ৺তারাপদ চক্রবর্তী যাঁর অন্তরঙ্গ সাহচর্য এবং স্নেহধন্য তালিম সবচেয়ে বেশিদিন পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি। স্নেহাস্পদা প্রকাশিকা এবং সম্পাদিকার আবেদনে এবং গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ তাদানের জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে আরও অনেক সঙ্গীত-সাধকের কথা এসে পড়েছে। তাঁরা হলেন—

সর্বশ্রী বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, সঙ্গীত সম্রাট তানসেন, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গুলাম আলি খাঁ, খলিফা বদল খাঁ, কেশর বাঈ কেরকর, হীরাবাঈ বরোদেকর, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, সাতকড়ি দাস মালাকার, গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কুমার শচীন দেব বর্মন, আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, রবিশঙ্কর এবং আরও অনেকে।

ঈশ্বর সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের সুধায় আমার জীবন-পাত্র ভরে দিয়েছেন আমার তিনজন স্বর্গীয় সঙ্গীত-গুরু। তাঁদের স্নেহের দান আমি শেষ পারানির কড়ি রূপে কণ্ঠে নিয়েছি। তাই জীবন সায়াহ্নে প্রতিদিন বহুবার সাশ্রুনেত্রে তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানাই।:

গ্রন্থকার

নিবেদন

সঙ্গীত-প্রেমী সাহিত্যিক অজিত কৃষ্ণ বসু (অ কৃ.ব.)র পৈতৃক নিবাস পূর্ব-বাংলার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহরের শ্যামল শোভাময় স্থান। কিন্তু রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাসকালে ঢাকার সেই বিগত দিনগুলির কথা স্মরণ করেই ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন থেকে প্রকাশিত এবং জনাব আহ্‌সন-উল্লাহ্‌ কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারত বিচিত্রা' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে "বুড়িগঙ্গার তীরে" শিরনামে 'ঢাকার স্মৃতি কথা' (subtitle) লিখেছিলেন তেরো কিস্তি। এই স্মৃতি চারণের শেষ ছয়টি কিস্তি (ওস্তাদ গুলেমহম্মদ খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর) ছিল 'ওস্তাদ কাহিনী'। এই কিস্তিগুলি পড়ে অকৃবর প্রিয় ছাত্র (কলকাতা আশুতোষ কলেজ) বিশিষ্ট গায়ক ডঃ অনুপ ঘোষাল উৎসাহী হয়ে 'ওস্তাদ কাহিনী' গ্রন্থরূপে প্রকাশের কথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাজ্য-সঙ্গীত অ্যাকাদেমির সর্বময় কর্তা শ্রীমানস মুখার্জীকে বলায় তিনি গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমির থেকে আংশিকভাবে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমার গ্রন্থ-প্রকাশ অভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালে ৩রা জুলাই অ.কৃ ব -র জন্মদিনে তাঁর 'খাপছাড়া কবিতা' গ্রন্থটি প্রকাশ করে। আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রদ্ধেয় ডঃ অনুপ ঘোষাল ও মানস মুখার্জী প্রমুখের সহযোগিতায় এই গ্রন্থটি প্রকাশেরও দায়িত্ব নিলাম। কর্মে অগ্রসর হয়ে দেখলাম গ্রন্থের কলেবর পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃহৎ হল, সংযোজিত হল নতুন নতুন অধ্যায়।

গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের প্রতিটি মুহূর্তে নিরলস সাহচর্য পেয়েছি উদীয়মান গায়ক প্রতাপ নারায়ণের কাছ থেকে। ওস্তাদ ভীষ্মদেব সম্পর্কে তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁর প্রিয় শিষ্য 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং সঙ্গীত-মাসিক 'সুরছন্দা'-এর সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও শিষ্য শ্রীমানস চক্রবর্তী। প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও আছে অনেকের পরোক্ষ সাহায্য, তাদের সকলকে আমি শুভ নববর্ষের আন্তরিক ধন্যবাদ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদনায় এবং মুদ্রণে সামান্য কিছু ত্রুটি থাকলেও আশা করি গ্রন্থটি সঙ্গীতপ্রেমী সুধীজনকে তৃপ্তি দান করবে।

প্রকাশিকা

উৎসর্গ

আমার প্রিয়তম ছাত্র
এবং প্রিয় গায়ক
সঙ্গীত তাত্ত্বিক ডঃ অনুপ ঘোষাল
কল্যাণবরেষু
জীবন সায়াহ্নে
বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যে
আমার এই সামান্য সংযোজনটুকু
তোমার হাতে তুলে দিতে পেরে
আমি আনন্দিত।
তোমার সঙ্গীত সাধনা
সার্থক হোক।

সূচীপত্র

ওস্তাদ কাহিনী

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহর, আমার স্বপ্নের শহর, যেখানে কেটেছে আমার বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের অনেক বছর। বুড়িগঙ্গার তীর ছেড়ে ভারত স্বাধীন হবার অনেক আগেই চলে এসেছি গঙ্গার তীরে কলকাতায়, কিন্তু এখনও আমার মন অনেক গোধূলি লগ্নে আর অনেক সন্ধ্যায় বুড়িগঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়ায়।

এই বুড়িগঙ্গার তীরে চওড়ার চাইতে অনেক বেশি লম্বা করোনেশন পার্ক, সকালে সন্ধ্যায় বেড়াবার চমৎকার জায়গা। ১৯২৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে এক গোধূলি বেলায় এই করোনেশন পার্কেই ঢাকাবাসী জনসাধারণের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

আমি তখন ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

আমার দেহের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়, কিন্তু সচেতন মনের জন্ম হয়েছিল বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা শহরে।

পূর্ব বাংলায় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা শহর। তিনজন বিশিষ্ট সঙ্গীত-গুণী কলকাতা থেকে ঢাকা গিয়েছিলেনঃ শিবসেবক মিশ্র, পশুপতিসেবক মিশ্র এবং ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ। সাল ১৯৩২। কিছুদিন বাদে মিশ্র ভ্রাতারা চলে এলেন ঢাকা ছেড়ে। খাঁ সাহেব ঢাকায় থেকে গেলেন। কারণ তাঁর গান মুগ্ধ করল ঢাকার উঁচুদরের সমঝদার সঙ্গীত-পাগল সুধী সমাজকে, খাঁ সাহেবও ভালবেসে ফেললেন তাঁর খাঁটি দরদী শ্রোতাদের। ঢাকার প্রখ্যাত গাইয়েরা খাঁ সাহেবের সাগরেদ হয়ে তালিম নিতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নিত্যগোপাল বর্মন, ঢাকা শহরের সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় গায়ক এবং সঙ্গীত

শিক্ষক। বাল্যকালে তিনি কিছুদিন আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন, সেই সূত্রে আমি ছিলাম তাঁর স্নেহভাজন। আমি ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে কিছুদিন পড়ে নাম কাটিয়ে দিয়ে ঐ সালেরই শেষ দিকে ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম ক্লাসে আর না পড়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেব বলে।

নিত্যবাবুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন খাঁ সাহেবের কাছে। বলেছিলেন একটানা বছর দুয়ের কাছাকাছি যখন থাকবেই ঢাকায়, তখন এত বড় গুণী ওস্তাদের তালিম পাবার সুযোগ ছেড়ো না। নবাবপুর রোডের মুকুল থিয়েটার নামক সিনেমা হল সংলগ্ন একটি একতলা ঘরে খাঁ সাহেব শিষ্যদের তালিম দিতেন। বাল্যকাল থেকে কিছু কিছু সঙ্গীত চর্চা করতাম। তাই এ বিদ্যায় কিছুটা অগ্রসর ছিলাম। ১৯২০ সালে আট বছর বয়সে কিছুদিন কলকাতায় মাতামহ ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের ভবনে ছিলাম। তখন মুখোমুখী প্রতিবেশী অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে আমার গান শুনে খুশী হয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে দুটি গান শিখিয়েছিলেনঃ 'হরি হে, বিপদভঞ্জন তব নাম' (কীর্তনাঙ্গ) এবং 'আমার সাধের তরী হে মুরারি ভাসে অকূলে' (জৌনপুরী)। আমাকে নিয়মিত তালিম দিয়ে তৈরী করার বাসনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আমি ঢাকায় পৈতৃক ভবনে ফিরে যাওয়ায় সে সুযোগ আমি নিতে পারি নি, সুযোগের মূল্য বুঝবার মতো বুদ্ধিও তখন আমার ছিল না। আমাকে পেয়ে খুশীই হলেন খাঁ সাহেব, বিশেষ করে যখন নিত্য বাবুর মুখে শুনলেন আমি এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি, সুতরাং এলেমদার ব্যক্তি।

কোনো ওস্তাদের কাছে এর আগে তালিম নিই নি। রীতি মতো নাড়া বেঁধে খাঁ সাহেবের সাগরেদ হয়ে গেলাম। তিনি কিছুদিন ইমন রাগের সারগম সাধিয়ে তারপর এই রাগের একটি খেয়াল গান দিলেনঃ

'এরি আলি পিয়া বিন সখি
কল ন পড়ত মোহে
ঘড়ি পলছিন দিন।
যবসে পিয়া পরদেস গওয়ন কিন
রাতিয়া কাটত মোহে
তাবে গিন গিন'।

অতি সুন্দর গায়কী খাঁ সাহেবের ঘরানার। গানটির চাল আমাকে মুগ্ধ করল। এই গান আমি আগেও অনেক শুনেছি বিভিন্ন গায়ক গায়িকার মুখে, মনে হয়েছে নিতান্তই মামুলী, বিশেষ আকর্ষণ কিছু নেই এ গানে। কিন্তু গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে এই আপাত সাধারণ গানই অসাধারণ হয়ে উঠল।

গানটি একটি বিরহিনী নারীর জবানীতে। সে তার এক সখীকে বলছে 'ওগো সখি, আমার প্রিয় বিহনে সারা দিনে যেন আর সময় কাটতে চায় না। প্রিয় যখন থেকে পরদেশে চলে গেছে, আমার সারা রাত কাটছে কেবল আকাশের তারা গুণে গুণে'।

গানটি কার রচনা জানি না। সম্ভবতঃ কোনো বিখ্যাত কবির নয়, কোনো ওস্তাদ গায়কের বা গায়িকার। কিন্তু বিরহ যন্ত্রণা উপশমেব জন্য আকাশের তারা গোণার কল্পনায় কবিত্ব আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে, অন্ততঃ আমি করি, কল্পনার চোখের সামনে তারায় ভরা আকাশের সুন্দর একটি ছবি ফুটে ওঠে। খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বর ছিল মেয়েলী নয়, রীতি মতো মর্দানা। কিন্তু অসামান্য মাধুর্য, ছিল তাতে, যাকে বলে দরদ। চেহারায় যাকে বলে লাবণ্য, গানে তাকেই বলে 'দরদ'। নাক, চোখ, ঠোঁট, গাল, চিবুক, চোয়াল, কপাল সবই ভালো হলেও যেমন লাবণ্যের অভাবে মোট চেহারাটা মনকে মুগ্ধ করে না, তেমনি করে যতই সুরের আলাপ আর তানের বাহার আর পরিপক্ক কালোয়াতি থাক না কেন, গায়কের কণ্ঠে দরদ না থাকলে তাঁর গানে শ্রোতার মন ভেজে না।

কণ্ঠে অসামান্য দরদের দৌলতেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের

জগতে মর্মস্পর্শিতাব দিক দিয়ে আবদুল করিম খাঁ সাহেব ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে আমি যখন তালিম নিতে শুরু করলাম (১৯৩৫) তখন ওডিয়ন রেকর্ডে করিম খাঁ সাহেবের 'পিয়া বিন নহী আওয়ত চৈন' এবং 'যমুনাকে তীর', গান দুটি ঢাকার বাজার মাত করেছে। গ্রামোফোনে এই গান শুনতে শুনতে গুল মহম্মদ খাঁ সাহেব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠতেন, "খুদানে করিম ভাইয়াকে গলেমে কায়েসা দরদ দিয়া।"

আমাকে প্রথম গান (এরি আলি পিয়া বিন) দেবার আগে বেশ কিছুদিন শুধু সরগম আর কণ্ঠ সাধনাই করিয়েছিলেন খাঁ সাহেব, সে কথা আগেই বলেছি। এখনকার চাইতে তখন বুদ্ধি অনেক কাঁচা ছিল। মনে মনে হয়তো কিছুটা অভিমান মেশানো সংশয় জেগেছিল ওস্তাদ আমাকে কিছু 'চিজ' দিচ্ছেন না, অথবা কাল হরণ করে আমাকে বঞ্চনা করছেন। এবং ওস্তাদ হয়তো আমার মনের ভাব কিছটা আঁচ করতে পেরেছিলেন, বোধ হয় তাই তিনি একদিন তালিম-দান পর্ব সারা করে কথায় কথায় একটি মজাদার গল্প শুনিয়েছিলেন।

গল্পটিতে সম্রাট আকবরের সভা-গায়ক তানসেনের গর্ব ছিল তাঁর তুল্য গায়ক ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। এক দিন তিনি শুনলেন বৈজু নামে এক অতুলনীয় গায়ক একটি জঙ্গলের মধ্যে থাকে, তার গানের তুলনা নেই। শুনে ভারি বেজার হলেন তানসেন। ভাবলেন, 'আমি বেঁচে থাকতেও যখন গাইয়ে হিসেবে লোকে বৈজুর নাম উল্লেখ করে, তখন দেখে আসা দরকার বৈজু সত্যি কেমন গায়।' ছদ্মবেশ ধারণ করে তানসেন চলে গেলেন সেই জঙ্গলে, যার ভেতরে বৈজু থাকে বলে তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে ঠিক কোন অংশে বৈজু থাকে, তা কেউ বলতে পারে নি।

তানসেন জঙ্গলের ভেতরে কিছুদূর গিয়ে মনুষ্যকণ্ঠের একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন। সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে গিয়ে দেখেন একটি পাগলাটে ধরণের লোক দুহাতে মুখের সামনে একটা হাঁড়ির

মুখ ধরে একটানা আওয়াজ করে চলেছে গম্ভীর কণ্ঠে। খানিক বাদে আওয়াজ থামিয়ে লোকটি একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, এই ফাঁকে তানসেন গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "ভাই, এখানে বৈজু কোথায় থাকে বলতে পার? মস্ত গায়ক বলে যার নাম?"

লোকটি বলল, "আমারই নাম বৈজু, এই জঙ্গলে থাকি। কিন্তু আমি তো ভাই গায়ক নই, গানের শিক্ষার্থী মাত্র, একটু আগে হাঁড়ি নিয়ে গলা সাধছিলাম, দেখনি তুমি?"

"দেখেছিলাম বটে," বললেন তানসেন। "গান্ধার সাধছিলাম", বললেন বৈজু, যিনি তাঁর পাগলাটে স্বভাবের জন্য বৈজু বাওরা অর্থাৎ 'বৈজু পাগলা' নামে বিখ্যাত ছিলেন। "ছত্রিশ বছর ধরে গান্ধার সাধছি, এখনো সিদ্ধ হতে পারলাম না।"

সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, এই সাত সুরের তৃতীয় সুরের পুরো নাম হচ্ছে গান্ধার। এই সাতটি সুর নিয়েই সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীগুলি তৈরী, এই সাতটি সুরকে ভালোভাবে কায়দায় না আনতে পারলে ভালো গাইয়ে হওয়া যায় না। বৈজু এই সাতটি সুরকে কায়দায় আনতে পারা দূরের কথা, ছত্রিশ বছর ধরে সাধনা করেও স্বরগ্রামের তৃতীয় সুরটিকেই আয়ত্তে আনতে পারেন নি, তবে তিনি কেমন তরো গাইয়ে?

তবু তাঁর এত নাম যখন গাইয়ে বলে, তখন একটু শোনাই যাক না এই ভেবে তানসেন তাঁকে বললেন, "আপনার গানের সুখ্যাতি শুনে অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। মেহেরবানী করে একখানি গান যদি শোনান তো কৃতার্থ হবো।"

বৈজু সবিনয়ে বললেন, "লোকে কেন আমার সুখ্যাতি করে জানি না। হয়তো আমাকে বাওরা ভেবে মেহেরবানী করেই করে। আমি মোটেই গাইয়ে নই, গাইয়ে হবার চেষ্টা করছি মাত্র। তবু আপনি যখন দয়া করে আমার গান শুনতে আসার মেহনত করেছেন, আমার অক্ষম কণ্ঠে একটি গান গেয়ে আপনাকে শোনাচ্ছি।"

একটি গান গাইলেন বৈজু। স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন তানসেন।

অভিভূত হলেন সেই অতুলনীয় স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনে। দুচোখ বেয়ে নামল অসহ্য আবেগের অশ্রুধারা। মানুষের কণ্ঠ থেকে এমন আশ্চর্য গান বেরোতে পারে, তা কখনো কল্পনা করেন নি তানসেন, বৈজুর গান না শুনলে তাঁর বিশ্বাস হতো না।

গান শেষ হলে দুটি ব্যগ্র হাতে বৈজুর হাত চেপে ধরে তানসেন বললেন, "আজ আমি ধন্য হলাম, এমন গান আমি আর কখনো শুনিনি।" বৈজুর প্রশ্নের উত্তরে তানসেন নিজের পরিচয় দিতেই বৈজু ব্যস্ত হয়ে ওঠে বললেন, "আপনিই ভারতের সঙ্গীত সম্রাট তানসেন? আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

তানসেন বললেন, "অভিবাদন আমিই আপনাকে করছি। সত্যিই আমার মনে মনে একটু দম্ভ ছিল আমি ভাল গাইতে পারি। আজ আপনার গান শুনে আমার সেই দম্ভ ধুলোয় মিশে গেল।"

এ কাহিনী ওস্তাদজি কোথা থেকে পেয়েছিলেন এবং এর বিশ্বাস-যোগ্যতা কতখানি, তা জানি না। কিন্তু খাঁ সাহেবের অভিভূত করা কণ্ঠস্বরে আর বলার অনবদ্য ভঙ্গীতে ছিল আশ্চর্য যাদু, যার ফলে কাহিনীটি আমি তাঁর গানের মতোই উপভোগ করেছিলাম। কাহিনীটির মাধ্যমে তিনি হয়তো এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সঙ্গীত বিদ্যায় রাতারাতি সিদ্ধি লাভ করা যায় না, কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করে যেতে হয়।

রাতারাতি সিদ্ধি প্রসঙ্গে গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবেরই অসাধারণ কৌতুক-রসিকতার একটি গল্প মনে পড়ল। ঢাকার একজন বিশিষ্ট ধনী ভদ্রলোকের ভীষণ শখ হলো তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রীকে খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখিয়ে ওস্তাদ গায়িকা বানাবেন। খাঁ সাহেবের আশ্চর্য গান শুনে আর তাঁর সঙ্গীত শিক্ষাদান দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল এমন গুরুর কাছে তালিম পেলে তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই ভালো গায়িকা হতে পারবেন। অন্যের উপস্থিতিতে কথাটা পাড়তে সংকোচ বোধ করে তিনি এক দিন নিরালায় খাঁ সাহেবকে বললেন, "খাঁ সাহেব, আপনার গান

শুনে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমার বড় শখ আমার স্ত্রীকে আপনার কাছে গান শিখিয়ে ভালো গাইয়ে বানাব। আপনি মেহেরবানী করে তালিম দেবেন ওকে ?"

খাঁ সাহেব খুশী হয়েই বললেন, 'হাঁ, হাঁ, জরুর দিব'। প্রশ্ন করলেন শিক্ষার্থিনীর সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান কিছু আছে কিনা। ভদ্রলোক জানালেন তা নেই। খাঁ সাহেব বললেন তাতে কিছু যাবে আসবে না, তিনি প্রাথমিক স্তর থেকেই তালিম দেবেন।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন তালিম পেয়ে তাঁর স্ত্রী আসরে গান শোনাবার মতো গায়িকা কত দিনের মধ্যে হতে পারবেন। খাঁ সাহেব বললেন, "আমি যেমন তালিম দেব তেমনিভাবে যদি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত রিয়াজ করেন তা হলে চার বছরের মধ্যেই ঘরোয়া আসরে মোটামুটি রকম গাইবার লায়েক বানিয়ে দেবো।"

'চা-র বছ-র !!!' এত লম্বা মেয়াদ পছন্দ হলো না ভদ্রলোকের। তিনি সম্ভবত ভাবলেন ওস্তাদজি ইচ্ছা করলে আরো তাড়াতাড়ি পারেন, কিন্তু অনেক দিন ধরে দক্ষিণা পাবার মতলবেই মেয়াদটা টেনে অত লম্বা করছেন। বললেন, "ওস্তাদজি, আপনি ওকে এক বছরের মধ্যে গাইয়ে বানিয়ে দিন। টাকা খরচা করতে আমি পিছ-পা নই, আমি আপনাকে তিন হাজার টাকা দেবো।"

খাঁ সাহেব বললেন, "আপনি এত টাকা খরচা করবেন কেন ? কটা দিন সবুর করুন, অনেক সস্তায় আপনার মতলব হাসিল হয়ে যাবে, আর আপনার স্ত্রীকেও বেশী মেহনত করতে হবে না।"

ভদ্রলোক একটু ধাঁধায় পড়ে প্রশ্ন করলেন, "সেটা কি করে হবে ?"

খাঁ সাহেব বললেন, 'আমি জলদি সবগুলো রাগ-রাগিনীর পিল বানিয়ে কম দামে বিক্রি করব। আপনার জরুর তালিম নেবার বা রিয়াজ করবার কিছু দরকার হবে না, যখন যে রাগ গাইতে হবে আগে সেই রাগের একটা পিল একটু জল দিয়ে গিলে ফেললেই সে রাগ গেয়ে আসর মাত করতে পারবেন।"

এই মজাদার গল্পটি ওস্তাদজির নিজের মুখেই শুনেছিলাম। আশা করি ওস্তাদজির রসিকতাকে রসিকতা বলে বুঝতে পেরেছিলেন ভদ্রলোক।

"ভদ্রলোকের স্ত্রীকে কি তালিম দিয়েছিলেন, ওস্তাদজি?" জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি।

ওস্তাদ হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "না সেই খুশনসিব আমার হয়নি।"

তানসেনের দর্পচূর্ণের আরেকটি কাহিনীও একদিন আমাকে (অথবা আমাদের, কারণ আমার কয়েকজন গুরু-ভ্রাতা অর্থাৎ ওস্তাদজির সাগরেদও শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন) শুনিয়েছিলেন খাঁ সাহেব, সেটি নিম্নরূপ।

নায়ক গোপাল মস্ত গুণী গায়ক। একদিন তানসেন রওয়ানা হয়ে গেলেন তাঁর ঠিকানায়, পৌঁছে দেখলেন বাড়ির সামনে একটি ইঁদারা, তা থেকে বালতি দিয়ে জল তুলে তুলে মাটির তৈরী কতকগুলো ঘড়ায় ঢালছে দাসীরা। আর তাদের কাজ তদারক করছে অভিজাত একটি তরুণী, যার চেহারায় প্রতিভা আর ব্যক্তিত্বের ছাপ। দাসীরা ঘড়ায় জল ভরতেই মেয়েটি ঘড়ার বুকে টোকা দিচ্ছে, টোকা দিয়ে অপছন্দ হলে ঘড়াটাকে বাতিল করে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। টোকা দিয়ে যে ঘড়াটাকে তার ভাল লাগছে, সেটিকে রাখছে। এভাবে সাতটা ঘড়া পছন্দ হতে মেয়েটি সেগুলোকে ঐ দাসীদের দিয়ে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দিল। বাকি অনেকগুলো ঘড়া ইঁদারার ধারে পড়ে রইল।

তানসেন এখানে এই প্রথম এলেন। তিনি মেয়েটিকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখে তাকে বিরক্ত না করে নীরবে তার ব্যস্ততা লক্ষ্য করছিলেন। দাসীরা সাতটি ঘড়া বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতেই মেয়েটি নবাগত তানসেনের দিকে তাকালেন, এবং তানসেন তাঁকে বললেন, "এটা কি বিখ্যাত গায়ক নায়ক গোপালের বাড়ি? আমি তাঁর দর্শন প্রার্থী।"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, এটাই নায়ক গোপালের বাড়ি। এবং আমি তাঁর কন্যা! কিন্তু পিতৃদেবের মৃত্যু হয়েছে। আজ তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। বড় দুঃখের বিষয় তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না। আপনার পরিচয়?"

আত্মপরিচয় দিলেন তানসেন। শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে নায়ক গোপালের কন্যা বলল, "আপনিই গায়ক শ্রেষ্ঠ তানসেন? আপনার প্রশংসা পিতৃদেবের মুখে আমি অনেক শুনেছি। আমার কি সৌভাগ্য তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিনে আপনি এলেন। ঈশ্বরই কৃপা করে আপনাকে পাঠিয়েছেন, আসুন আমার সঙ্গে শ্রাদ্ধবাসরে।"

যেতে যেতে তানসেন প্রশ্ন করলেন, "টোকা মেরে মেরে অতগুলো ঘড়া ফেলে দিলে কেন?"

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, "কি আশ্চর্য! আপনি সুরের এত বড় সাধক হয়েও আমাকে এই প্রশ্ন করছেন? টোকা মেরে যে ঘড়াগুলোকে বেসুরো দেখলাম সেগুলোকে ফেলে দিলাম। সুর তপস্বী পিতৃদেবের আত্মা তো বেসুরো ঘড়ার জলে তৃপ্ত হবে না। তাই টোকা দিয়ে দেখে মিলিয়ে সাত সুরের সাতটি ঘড়া শ্রাদ্ধবাসরে পাঠিয়ে দিলাম।"

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে তানসেন ভাবলেন, "সুর তপস্বীর যোগ্য মেয়েই বটে।"

বাড়ির ভিতরে গিয়ে তানসেন দেখলেন শ্রাদ্ধের নানা উপকরণ দিয়ে শ্রাদ্ধবাসর সুন্দর ভাবে সাজানো। একটি বেদীর ওপর শোয়ানো রয়েছে একটি তানপুরা। মেয়েটি তানসেনকে বলল, "এটি পিতৃদেবের তানপুরা। আপনার সুরে এর তার বেঁধে নিন। আপনার সঙ্গীতের খুব প্রশংসা করতেন তিনি। আপনার সঙ্গীত আলাপ দিয়েই তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শুরু হোক, তাতে তাঁর আত্মার পরম তৃপ্তি হবে।"

তানসেন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর একটি প্রিয় রাগের আলাপ শুরু করবার একটু পরেই তানসেনকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি

আর্তনাদ করে উঠল, "হায়, হায় এ আপনি কি করলেন তানসেন? আপনি কি নিখুঁত ভাবে ঠিকমতো স্থর লাগাতে শেখেন নি? সব উপকরণ আপনার ভুলে অপবিত্র হয়ে গেল, সব ফেলে দিয়ে বাসর আবার সাজাতে হবে নতুন উপকরণ দিয়ে।"

জল ভরা সাতটি ঘড়াসহ অন্যান্য সব জিনিস সরিয়ে ফেলা হলো। দুঃখে, লজ্জায় আর অপমানে তানসেন বেরিয়ে পড়লেন সেখান থেকে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে এক নিরালা স্থানে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখলেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন নায়ক গোপাল।

নায়ক গোপাল বললেন, "বৎস তানসেন, দুঃখ করো না। তুমি বিরাট প্রতিভাবান গায়ক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মেয়ে ভারি পিতৃভক্ত, সে জানে স্থর লাগাবার কায়দায় এতটুকু খুঁত থাকলেও আমি তা সইতে পারতাম না। তোমার স্থর লাগাবার কায়দাটি স্থন্দব হলেও তাতে একটুখানি খুঁত ছিল। আলাপের মুখটা কিভাবে তোমার ধরা উচিত ছিল সেটা আমি গেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, তা থেকেই তুমি বুঝতে পারবে কোথায় তোমার ত্রুটি হচ্ছিল, যার জন্য তোমার গান আমার মেয়ে সইতে পারেনি।"

বলে নায়ক গোপাল গেয়ে দেখিয়ে দিলেন। অদ্ভুত স্থন্দর তাঁর সেই স্থর লাগাবার কায়দা, শুনে সঙ্গে সঙ্গে মনে গেঁথে নিলেন তানসেন।

নায়ক গোপাল বললেন, 'ফিরে যাও আমার শ্রাদ্ধবাসরে। গিয়ে নিখুঁতভাবে স্থর লাগাও, যেভাবে আমি দেখিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ভেঙে গেল তানসেনের। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে গেলেন শ্রাদ্ধবাসরে। যেখান থেকে অপমানিত বোধ করে চলে এসেছিলেন। এবার আর ভুল হবে না, জোরের সঙ্গে নায়ক গোপালের কন্যাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েই সম্পূর্ণ নতুন করে সাজানো শ্রাদ্ধবাসরে আবার গাইতে বসলেন তানসেন। এবার গানের মুখটি ধরলেন নায়ক গোপালের স্বপ্নে শিখিয়ে দেওয়া ভঙ্গীতে। মুগ্ধ হয়ে

সে গান শুনল নায়ক গোপালের কন্যা, শুনল আর সবাই। গান শেষ হলে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, "ধন্য তানসেন!"

গল্পটির মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ কোনো গাইয়ের মনে অহংকার থাকা উচিত নয়, বিনয় থাকা উচিত।

ওস্তাদজির কাছে ইমন রাগের তালিমে কিছু দূর এগিয়েছি, এমন সময়ে একদিন ঢাকা শহরের সুত্রাপুর অঞ্চলে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে পৃষ্ঠপোষক এবং ভারত-বিখ্যাত তবলা-বিশারদ, মুরাপাড়ার ধনী জমিদার রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে এক ঘরোয়া বৈঠকে তাঁর মেঘমল্লার রাগের আলাপ আর খেয়াল গান শুনে চমৎকৃত হলাম, যতক্ষণ তিনি গেয়েছিলেন ততক্ষণ যেন দেহের শিরায় শিরায় শিহরণ অনুভব করছিলাম। তিনি যখন মেঘ রাগ গাইতে শুরু করেছিলেন তখন আকাশ মেঘ-শূন্য ছিল। খাঁ সাহেবের গান যখন জমে উঠল তখন ঘরের ভিতরে ঠাণ্ডা অনুভব করা গেল, আর মনে হলো বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি। তাঁর মেঘ রাগ গাওয়ার ফলেই ঐ মেঘের ঘটা আর বৃষ্টিপাত কিনা বুঝতে পারি নি, ভেবেছিলাম ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। কিন্তু বাইরে তখন সম্পূর্ণ ফাঁকা আকাশ। ঘরের ভেতর বসে সেই গান শুনে মনে হয়েছিল বাইরে মেঘের পরে মেঘ জমে আঁধার করে এসেছে, আর ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে। মেঘ রাগ পরে একাধিকবার শুনেছি গঙ্গার তীরে কলকাতায়, কিন্তু বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা শহরে আমার গুরু ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে এই রাগের যে অনির্বচনীয় রূপায়ন শুনেছিলাম, তেমনটি আর কখনো শুনিনি।

সেই গান আমার সঙ্গে বসে শুনেছিলেন আমার গুরুভাই এক ভদ্রলোক, আমার চাইতে ওস্তাদজির অনেক বেশি পুরনো সাগরেদ, তাঁর বাঁধানো গানের খাতার অনেকগুলো পৃষ্ঠা ভরা ছিল খাঁ সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া তালিমের বিবরণে। পৃষ্ঠাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে মনে হয়েছিল ওস্তাদজি তাঁর গানের ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়ে যাবেন এই সাগরেদটির গানের খাতায়, সঙ্গীত-সাধনার বাইরে

যিনি ছিলেন জীবন-বীমার দালাল।

ওস্তাদের মেঘ-মল্লার শুনে ক্ষেপে উঠলেন তিনি: "ওস্তাদজি, এই রাগ আমাকে শেখাতে হবে।"

ওস্তাদজি বললেন, "হ্যাঁ, জরুর।" অর্থাৎ এই প্রিয় সাগরেদটিকে তাঁর অদেয় কিছুই নেই, সে যখন যে রাগ বা যে গান চাইবে তাই পাবে।

এই সাগরেদটিকে 'চিজ' বাৎলাতে তিনি এমন অকৃপণ কেন, যার কণ্ঠস্বরের ক্রমিক বিকৃতির জন্য তার কোনোদিনই গায়ক হওয়া সম্ভব হবে না, অথচ আমাদের বেলায় অমন কৃপণের মত হোমিওপ্যাথিক ডোজে টিপে টিপে 'চিজ' ছাড়েন কেন, যাদের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক এবং গায়ক হওয়া সম্ভব? এই প্রশ্ন এক দিন প্রকারান্তরে করেছিলাম ওস্তাদকে।

ওস্তাদজি বলেছিলেন, "ঠিক ঐ জন্যেই।" তারপর বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠের মতো তাঁর হৃদয়েও যে কত দরদ ছিল, তার পরিচয় পেয়েছিলাম ঐ ব্যাখ্যা থেকে।

ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে যেমন হয়, বীমা-দালাল রাকেশ বাবুর গলার সর্বকালীন আওয়াজ ছিল সেই রকম। হোমিও-প্যাথিক. অ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী, হেকিমী, টোটকা ইত্যাদি অনেক রকম চিকিৎসাই করিয়েছিলেন তিনি, কোনো ফল হয়নি। তবু কুঁজো মানুষের চিৎ হয়ে শোবার শখের মতো তাঁর ও ছিল গান গাইবার শখ, আর খাঁ সাহেবের গান তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল যে খাঁ সাহেবের কাছে সুরের তালিম পাওয়া ছিল তাঁর বেসুরো জীবনে স্বর্গ-সুখের সামিল।

"জানি ওর গান গাওয়া এ জন্মে হবে না। তাই ওকে আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছি।" ওস্তাদ বলেছিলেন আমাকে। "কিন্তু ও বেচারা কিছুতেই ছাড়তে রাজি হয়নি আমাকে, আমার পা ছুঁয়ে কেঁদে বলেছে 'ওস্তাদজি, আমাকে পায়ে ঠেলবেন না।' আমি ঠেলতে পারিনি, ভেবেছি খোদা তাকে প্রচুর বঞ্চিত করেছেন, তার ওপর আমি আবার

বঞ্চিত করি কেন? আমি জিন্দগিভর তালিম দিয়েও ওকে গাইয়ে বানাতে পারব না জানি, তাই ওকে বলেছিলাম ওর কাছ থেকে আমি আর টাকা নেবো না, ও শোনে না আমার মানা। টাকা রেখে দেয় আমার পায়ের কাছে। নিতেই হয়, ফিরিয়ে দিলে ওর দিলে চোট লাগবে। বেচারা!"

সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল ওস্তাদজির সাগরেদ-বৎসল দরদী বুকের ভেতর থেকে।

আমাদের—যাদের গাইয়ে হবার সম্ভাবনা আছে তাদের—আপাত দৃষ্টিতে কৃপণের মতো টিপে টিপে অল্প অল্প করে 'চিজ' দেওয়া সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন ঃ

"গাদা গাদা চিজ আর গণ্ডায় গণ্ডায় গান দিয়ে কি হবে তোমাদের? আমার কাজ হচ্ছে তোমাদের গলা তৈরী আর তাতে সুর কায়েম করে দেওয়া। আমার ঘরানার গায়কী তোমাদের আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া। আর দেখ, লোভী হয়ে ঘন ঘন রাগ বদল না করে একটা রাগ অনেক দিন ধরে সেধে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারলে তারপর অন্য রাগগুলো অনেক সহজে আর অনেক তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারবে।"

"তোমাকে এখন যে চিজ, যে তালিম দিচ্ছি, তার মুল্য এখন হয় তো বুঝতে পারছ না, বুঝতে পারবে পরে।" একথাও বলেছিলেন তিনি।

সত্যিই পরে বুঝেছি। তার অনেক বছর পরে কলকাতায় ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের (১৯৬০) সময়ে—সাক্ষাৎকারটি অমৃতবাজার পত্রিকার তরফ থেকে করেছিলাম—কথায় কথায় এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম যে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ এবং সঙ্গীতচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর মতো বিরাট সঙ্গীত গুণীর কাছে তালিম পাওয়া আমার জীবনে বৃথা হয়ে গেল, কারণ সাহিত্য আর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সঙ্গীত সাধনায় সময় দিতে না পেরে আমার গাইয়ে হওয়া হলো না। শুনে ওস্তাদ গুলাম আলি খাঁ আমাকে বলেছিলেন, "না, তালিম পাওয়া আপনার বৃথা হয় নি।

গাইয়ে হয়ে আসর জমাতে পারেন নি, কিন্তু সাচ্চা সমঝদার তো হতে পেরেছেন। তালিম না পেলে রাগ সঙ্গীতের এত গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন না, তার রসে এমন করে ডুবে যেতে পারতেন না। জীবনে একি একটা কম লাভ?"

আগেই বলেছি আমার দেহের জন্ম হয়েছিল গঙ্গা নদীর তীরে কলকাতা শহরে (জুলাই ১৯১২), কিন্তু আমার সচেতন মনের জন্ম হয়েছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহরে। তারপর জীবনের এতগুলো বছর চলে গেল, এখনো ঢাকা আমার স্বপ্নের শহর, তামাম দুনিয়ার সেরা শহর। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের ভাষা একটু বদলে বলতে পারি ঃ

"এমন শহর কোথাও গেলে
পাবে নাকো তুমি।
সব শহরের সেরা আমার
মনের জন্মভূমি।"

মনে পড়ছে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের কথা, যে মাসে আমি ঢাকা শহরে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ (শাস্ত্রীয়) কণ্ঠ সঙ্গীতে তালিম নিতে শুরু করেছিলাম এবং তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলাম। তাঁর বিষয়ে অনেক কথাই মনে পড়ছে। ওস্তাদজির কথা তো বলে শেষ করা যাবে না, এমনই আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি।

মনে পড়ছে তাঁর মুদ্রাদোষ সহ্য করবার একটি কাহিনী। ঢাকার এক ধনী সঙ্গীতামোদীর বাড়িতে সন্ধ্যায় ওস্তাদজির গানের আসর বসেছিল। ঘরোয়া বৈঠক, ভেবেছিলাম নির্বিঘ্নে, গভীর মনোযোগ সহকারে আমরা আশ মিটিয়ে সেই অনবদ্য সঙ্গীত উপভোগ করব। কিন্তু আমাদের বৈঠকে এসে শ্রোতা হিসেবে যোগ দিলেন গৃহস্বামীর এক নিকট আত্মীয়, যিনি দিন কয়েকের জন্য ঢাকায় এসেছেন এবং গান বাজনা শুনতে ভালবাসেন। তিনি বাড়ির ভেতরে অন্দর মহলে

ছিলেন, ওস্তাদজির দরাজ এবং দরদ-ভরা কণ্ঠের সুরের যাদু তাঁকে বৈঠকখানায় টেনে এনেছে।

ণ আমরা নির্বিঘ্নে মশগুল হয়ে গান শুনছিলাম, এই ভদ্র- এসে সেই আনন্দে বাদ সাধলেন। নীরবে গান শোনা তাঁর ...ষ্ঠীতে লেখেনি, তার মুখ-নিঃসৃত ঘন ঘন 'কেয়া বাৎ, আহা হা, 'সোভানাল্লা' প্রভৃতি ধ্বনিতে গানের আসর ঘন ঘন চমকিত মুখরিত হতে লাগল। তাঁর সমঝদারী ভাব প্রকাশ বা ভাবোচ্ছ্বাস শুধু তাঁর হঠাৎ চীৎকারে নয়, প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকানো আর হাত পা নাড়াতেও রূপায়িত হচ্ছিল।

শ্রোতাদের মধ্যে আমার মতো আরো অনেকেই এই মূর্তিমান উৎপাতটির ওপর মনে মনে যে বিষম ক্ষেপে উঠেছেন, সেটা তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছিলাম। তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবার বাসনাও নিশ্চয় অনেকের মনে জেগেছিল, কিন্তু সবাই বাধ্য হয়ে মনের বিরক্তি মনের মধ্যেই চেপে রাখছিলাম নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে, বিশেষ করে ভদ্রলোক যখন গৃহস্বামীর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় অতিথি। ওস্তাদজির প্রথম গানটি গাওয়া শেষ হলো। শুরু হলো চা-পানের জন্য সাময়িক বিরতি। সেই মহাউৎপাত সৃষ্টিকারী ভদ্রলোকটি খাঁ সাহেবের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ওস্তাদজি। এমন গান আমি অনেকদিন শুনিনি।"

ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবও গভীর আবেগে অভিভূত। ভদ্রলোকের দুটি হাত নিজের দুটি মুঠোয় ধরে বললেন "ভাইসাহেব, আপনার মতো এমন শ্রোতা ও আমি অনেকদিন পাই নি। সুরকে আপনি ভালোবেসেছেন, খোদার যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তাই তো আমার গলায় তাঁর মেহেরবানিতে যখন সুর ঠিক মতো লাগছিল, তখনই আপনার মন দুলে উঠেছিল, আপনার গলা থেকে আপনা থেকেই পুকার বেরিয়ে আসছিল। আপনি নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না।"

ওস্তাদজির সেই কথায় বিন্দুমাত্র ভান বা মেকি ভদ্রতা ছিল

না. ছিল পরিপূর্ণ নির্ভেজাল আন্তরিকতা, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, কারণ স্নেহভাজন প্রিয় শিষ্যরূপে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশে তাঁর অকপট উদার চরিত্রেব সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। বুঝলাম উক্ত শ্রোতা ভদ্রলোকের যে মুদ্রাদোষগুলোকে গান উপভোগে বাধা-সৃষ্টিকারী উৎপাত বা আপদ বিবেচনা করে আমরা বিরক্ত হয়েছিলাম, তাকে ওস্তাদজি সুর-প্রেমিকতার মূর্ত প্রকাশ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। আমাদের ক্ষমাহীন অসহিষ্ণুতার কথা ভেবে আমরা (অন্ততঃ আমি) মনে মনে লজ্জা পেলাম। আমার মনে পড়ে গেল কবিগুরু তাঁর 'গানভঙ্গ' কবিতায় লিখে গেছেন ঃ

"একাকী গায়কের নহে তো গান,
গাহিতে হবে দুইজনে ;
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা,
আরেকজন গাবে মনে।"

কিন্তু শ্রোতা গায়কের সরব গানের সঙ্গে শুধু নীরবে মনে মনে গাইলেই তা যথেষ্ট হবে না, তাঁর বোবা হয়ে থাকা চলবে না, রস—ভোগের আবেগকে মুখর হয়ে প্রকাশ করতে হবে, তাঁর হৃদয়ে যে সুরের প্রতি প্রেম আছে, সেটি গায়ক শিল্পীকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তবেই তো তিনি শ্রোতার সঙ্গে সুরের মাধ্যমে একাত্মতা অনুভব করবেন এই ভেবে যে, তাঁর সুর-সৃষ্টির প্রয়াস সফল এবং সার্থক হয়েছে। ওস্তাদ হয়তো এই রকম ভাবতেন।

কবিগুরু ঐ কবিতাতেই অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।"

চা-পান পর্ব সারা হলে ওস্তাদজি ঐ ভদ্রলোককেই সাগ্রহে এবং সবিনয়ে অনুরোধ জানালেন ঃ "এবার আপনি ফরমায়েশ করুন কি রাগ গাইব।"

এই ফরমায়েশ প্রসঙ্গে ওস্তাদজির মুখেই শোনা একটি মজার

গল্প তিনি আমাদের মাঝে মাঝে শুনিয়ে মজা দিতেন, নিজেও মজা পেতেন। গল্পটি সংক্ষেপে বলছি।

কোনো এক ছোট শহরে এক বিখ্যাত ওস্তাদ গায়ক দিনকয়েকের জন্য বেড়াতে গেছেন। সেই শহরে এক নয়া ধনী ভদ্রলোক ছিলেন, যাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব ছিল প্রচুর, কিন্তু অভিজাত হবার শখ কম ছিল না। তাঁর শখ হলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক সমঝদার হবার। মোসাহেবদের বললেন, "এত বড় ওস্তাদ এত কাছে এসেছেন, অথচ আমার গরীবখানায় একদিন ওঁর পায়ের ধুলো পড়বে না, গানের আসর বসবে না, সেটা ভালো দেখাবে না। একদিন ওঁকে সসম্মানে নিয়ে আসতে হবে। ওঁর গান শুনব, ভাল দক্ষিণা দেব, জোরদার আদর-আপ্যায়ন করব, তোমরা ওঁর কাছে গিয়ে খুব বিনয় করে আমার আমন্ত্রণ জানিয়ে জেনে এসো উনি মেহেরবানী করে আসবেন কিনা, গান শোনাবেন কিনা।"

মোসাহেবরা গিয়ে পরম বিনয় সহকারে আমন্ত্রণ জানাতেই ওস্তাদজি আসতে রাজী হয়ে তারিখ আর সময় দিলেন, যখন গাড়ি এসে তাঁর দলসহ তাঁকে নিয়ে যাবে।

ওস্তাদজি আসবেন শুনে সেই নয়া বড়লোক ভারি খুশী। মোসাহেবদের নেতা বললেন, "ওস্তাদ এসে কিন্তু হুজুর গান ধরবার আগে আপনাকে বলতে পারেন কি রাগ গাইব ফরমায়েশ করুন। অনেক ওস্তাদ এই রকম করেন বলে শুনেছি। তাই আপনি হুজুর আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন কি রাগ ফরমায়েশ করবেন।"

নয়া বড়লোক বললেন, "এই সেরেছে। রাগ-টাগের ব্যাপারে যে আমি একেবারেই কিছু জানি না।"

মোসাহেব-প্রধান বললেন, "জানবার আপনার কিছু দরকারও নেই। শুনেছি ওস্তাদ খাঁ সাহেব কানাড়া রাগে সিদ্ধ। আপনি ওঁকে কানাড়া রাগ গাইতে বলবেন।"

নয়া বড়লোক বললেন, "কিন্তু ঠিক সময় মতো নামটা মনে পড়বে তো হে? যদি ভুলে যাই?"

মোসাহেব নেতা বললেন, "আমি মনে করিয়ে দেবো। অবশ্য গোপন ইশারায়, যার কথা আপনি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।"

"কি সেই গোপন ইসারা?" মোসাহেব নেতা বললেন, "কানাড়া নামটা যদি আপনার সময় মতো ঠিক মনে পড়ে, তাহলে তো ভাবনাই নেই। কিন্তু যদি মনে না পড়ে, তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাবেন, আমি ডান হাতে আমার কান ধরে নাড়া দেবো। আমার কান নাড়া দেখেই আপনার কানাড়া মনে পড়ে যাবে। এইটে মনে রাখবেন যে, আমি যা ডান হাত দিয়ে ধরব, তার সঙ্গে আপনি শুধু একটা 'আড়া' যোগ করে দেবেন। কান আর আড়া মিলে কানাড়া।"

শুনে নয়া বড়লোক তাঁর প্রধান মোসাহেবের আশ্চর্য বুদ্ধির খুব তারিফ করলেন, ভাবলেন, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ওস্তাদজির কাছে বেকুব বনবার ভয় রইল না।"

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই যেমন সন্ধ্যা হয়, তেমনি ওস্তাদজি যখন বললেন, "ফরমায়েশ করুন কি রাগ গাইব।" ঠিক তখনই বড়লোক মশাই 'কানাড়া' নামটি ভুলে গেলেন। কিছুতেই মনে করতে না পেরে প্রধান মোসাহেবের দিকে তাকালেন। আর ঠিক সেই সময় একটা মশা এসে মোসাহেবটির নাকের ডগায় হুল ফুটিয়ে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাতটি এসে পড়ল তাঁর নাকের ডগায়। তাই দেখে ফরমূলা অনুযায়ী নাক আর আড়া এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নয়া বড়লোক খুব সমঝদার শ্রোতার মতো গম্ভীরভাবে বললেন, "নাকাড়া রাগ শোনান, ওস্তাদজি।"

গল্পের ঘটনাটি সত্যি সত্যি ঘটেছিল, না এটি উপদেশাত্মক বানানো গল্প তা জানি না।

যাই হোক, ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের অনুরোধ শুনে সেদিনের উচ্ছ্বাস-প্রবণ ভদ্রলোকটি কিন্তু ঐ রকম হাস্যকর ভুল কিছু করলেন না, তিনি রাগ-রাগিনীর ওস্তাদ না হলেও তাদের সঙ্গে তাঁর

পরিচয় ছিল ভালোরকম (এ খবর অবশ্য পরে শুনেছি)। তিনি একটু চিন্তা করেই সবিনয়ে প্রার্থনা জানালেন ('ফরমায়েশ' নয়, কারণ এই 'ফরমায়েশ' শব্দটির মধ্যে হুকুমের গন্ধ আছে) খাঁ সাহেবের কণ্ঠে 'জয়-জয়ন্তী রাগ শুনতে পেলে তিনি অতিশয় তৃপ্ত হবেন।

লক্ষ্য করলাম আনন্দের আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে ওস্তাদজির মুখ। বুঝলাম অনুরোধটি তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে। পছন্দ আমাদেরও হয়েছিল। কারণ জয় জয়ন্তী একটি গভীর গম্ভীর প্রকৃতির রাগ, যা ওস্তাদজির জোয়ারিদার (গম্ভীর) মধুর কণ্ঠের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। গম্ভীর ধরনের রাগই বেশি পছন্দ করতেন ওস্তাদজি, যদিও হাল্‌কা রাগ বা হাল্‌কা ভাবের গানও তিনি চমৎকাব গাইতেন, কিন্তু সে যেন পোলাউর সঙ্গে একটু চাটনি পরিবেশনের মতো, বৈচিত্র্য বা ব্যতিক্রম হিসেবে।

সেই রাতে ওস্তাদজির কণ্ঠে জয়-জয়ন্তী রাগে যে খেয়াল গান শুনেছিলাম, তার স্মৃতি আজও আমার সারা হৃদয়কে আনন্দে আচ্ছন্ন করে দেয়। অনেক গভীর রাত্রে চোখ বুজে স্মৃতির চোখে দেখি ওস্তাদজি এক প্রিয় বিরহে বেদনার্তা বিরহিনীর বিরহ বেদনা সঙ্গীতে মূর্ত করে গাইছেন ঃ

"দামনি দমকে, ডর মোহে লাগে।" বিখ্যাত এই হিন্দি খেয়াল গান, যার বাংলা অনুকরণ (দামিনী দমকে, যামিনী আঁধার রে") গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছেন অসামান্য গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কিন্তু মূল হিন্দি গানটি গীত হয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, বাংলা অনুকরণে তা হয় না।

ওস্তাদজির জয়-জয়ন্তী রাগে খেয়াল গাওয়া শুনে মনে হলো তিনি ভাবে বিভোর হয়ে নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। দেহে-মনে যেন এক অপূর্ব আনন্দময় বৈদ্যুতিক শিহরণ অনুভব করলাম, আমাদের বিরাগভাজন যে মুদ্রা-দোষগ্রস্ত ভদ্রলোক ওস্তাদজির আগেকার গানটিতে ঘন ঘন বাহবাধ্বনি দিয়ে আমাদের গান শোনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছিলেন, তিনি একেবারে বদলে গেলেন। ভাবের গভীরে

ডুবে গিয়ে তিনি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন ; সেই কান্নার আওয়াজ আগেকার কেয়াবাৎ, সোভানাল্লা প্রভৃতি চীৎকারের মতো বিরক্তিকর নয়। আমরা অন্যান্য শ্রোতা তাঁর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদিনি বটে, কিন্তু আমার মনে হয় ঐ গান শুনে আসরের কারো চোখই শুকনো ছিল না।

গান শুনিয়ে শ্রোতার চোখ থেকে অশ্রু ঝরাবার এই যে অসাধারণ ক্ষমতা, এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। অবশ্য এটি আমার সংগ্রহে অন্যের মুখে শোনা গল্প। অনেক বছর আগেকার কথা। ফৈয়াজ তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন, মুখে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সেই বয়সেই অসাধারণ কুশলী গায়ক হয়েছেন, চারদিকে খুব নাম-ডাক, বড় বড় আসরে প্রচুর তারিফ পেয়ে পেয়ে মনে একটু গর্বের ভাব এসেছে।

সেই সময়ে তিনি এলেন হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মহাকেন্দ্র কলকাতা মহা নগরীতে, এখানে এসে ঠুংরি গানের অবিসম্বাদী সম্রাট ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খাঁ সাহেবের গান একটি বৈঠকে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ফৈয়াজ, মানুষের কণ্ঠে গাওয়া গান এত উচ্চস্তরে উঠতে পারে? কী আশ্চর্য যাদু এই সঙ্গীত-যাদুকরের গানে! কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ ক'রে এ গান, অনিবার্যভাবে প্রতিটি শ্রোতার দু চোখে জলের ধারা বইয়ে দেয়।

ফৈয়াজের মন থেকে দর্প ঝরে গেল। তিনি ভাবলেন, "গান গেয়ে অনেক চমক লাগিয়েছি, অনেক বাহবা, তারিফ, হাততালি পেয়েছি, কিন্তু গান শুনিয়ে এমন করে তো কখনো কোনো শ্রোতার চোখে আঁসু বহাতে পারিনি।"

ঠুংরি গানের যাদুকর মৌজুদ্দিন খাঁ সাহেবকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন ফৈয়াজ, বললেন, "যত দিন না গান শুনিয়ে আপনার মতো শ্রোতাদের চোখে আঁসু বহাতে পারছি, ততদিন মনে ক'রব

আমি সত্যিকারের গাইয়ে হ'তে পারিনি। যে গান শুনে শ্রোতার দু'চোখ অশ্রুতে ভিজে ওঠে, তেমন গান গাইবার শক্তি আয়ত্ত করাই হবে আমার সাধনার লক্ষ্য।"

সার্থক সাধনায় তাঁর সেই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানের সঙ্গে আমার কানের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে ঢাকা শহরে, যখন আমি সেখানে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী কণ্ঠ সঙ্গীতের তালিম নিতে শুরু করেছি।

ঢাকা শহর ছিল পূর্ববাংলার সঙ্গীত-তীর্থভূমি, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।

সেই সময়ে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুজন দিকপালের গানের রেকর্ড ঢাকার সঙ্গীতামোদী মহলে অভূতপূর্ণ সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁরা হলেন ফৈয়াজ খাঁ (হিন্দুস্থান রেকর্ড) এবং আবদুল করিম খাঁ (ওডিঅন রেকর্ড)। সঙ্গীতে অসাধারণত্বের স্বীকৃতিরূপে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভূষিত হয়েছিলেন যথাক্রমে 'আফতাব-এ মৌসিকি' (সঙ্গীত জগতের সূর্য) এবং 'খান সাহেব' উপাধিতে।

আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কথা পরে বলা যাবে। এখন ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গ যখন শুরু করেছি, তখন তাঁর কথাই বলি।

সে সময়ে গ্রামোফোনের ছোট রেকর্ড বাজত তিন মিনিট আর বড় রেকর্ড সাড়ে চার মিনিট মাত্র। একখানা খেয়াল বা ঠুংরি গান ঐ অল্পমেয়াদী রেকর্ডে গাওয়া অনেকটা চৌবাচ্চায় পুকুর ধরানোর প্রয়াসের মতো। তবু ফৈয়াজের ঐ রেকর্ডের গান শুনে কিছুটা আভাস পেলাম তাঁর বিরাট মাহাত্ম্যের। এও আমার ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের তালিমের কৃপায়। ওঁর কাছে তালিম পাবার আগে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই আমি উচ্চাঙ্গ রাগ-সঙ্গীতের মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। 'ওস্তাদী' বা কালোয়াতী গান সম্বন্ধে মনে প্রায় বিতৃষ্ণা বা ভীতির ভাবই ছিল বলা যায়। ভাবতাম ও জিনিস নিতান্তই ক্লান্তিকর, বিরস। তার আরো একটি

কারণ সত্যিকারের গুণীর রাগ-সঙ্গীতের গান তখনো শুনিনি, অক্ষম বা মাঝারি গোছের রাগ-সঙ্গীত শিল্পীর মন্দ পরিবেশন শুনে রাগ-সঙ্গীত সম্বন্ধে মন্দ ধারণা হয়েছিল।

গ্রামোফোন রেকর্ডে আমাকে বিশেষ ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ করল ফৈয়াজ খাঁর সমুদ্র-কল্লোলের মতো গুরুগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের তানগুলি। কিন্তু সে গান তখন আমার মগজে যতটা প্রবেশ করল, মরমে ততটা নয়।

পরের বছর (১৯৩৬) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য কলকাতা এলাম, পরীক্ষার পর ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে সঙ্গীত সম্মেলনে (নিখিল বঙ্গ না নিখিল ভারত, তা মনে নেই) এক রাতে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গান প্রত্যক্ষভাবে শুনবার প্রথম সৌভাগ্য হলো। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ঠিক তার আগেই গাইলেন শ্রীমতী কেসর বাঈ, প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রথম তাঁর গান শুনলাম। আগে শুনে-ছিলাম ওডিঅন রেকর্ডে। শ্রীমতী কেসর বাঈ তখন ভারতের সর্ব-প্রধানা এবং পরম সম্মানিতা খেয়াল গায়িকা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যে এমন মধুর এবং মনোমুগ্ধকর হতে পারে কেসর বাঈ সাহেবার গান শুনবার আগে তা ভাবিনি কখনো। তিনি খেয়াল গাইলেন কাফী কানাড়া রাগে। তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতে হল শুদ্ধ সমস্ত শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ। গানের শেষে আমাদের বিনম্র অভিবাদন জানিয়ে তিনি যখন মঞ্চের নেপথ্যে চলে গেলেন, তখন আমাদের সবারই মনে হতে লাগল তাঁর গান বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, আরো কিছুক্ষণ চললে ভালো হতো যদিও ঘড়ির হিসেবে তিনি খুব কমক্ষণ গাননি।

এরপরই ঘোষকের কণ্ঠে ঘোষিত হলো এবং ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হলো এবার আসবেন এ রাতের সর্বশেষ শিল্পী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, তিনি খেয়াল গাইবেন কেদারা রাগে। পাশের প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন শ্রীমতী কেসর বাঈ মধুর বামাকণ্ঠে সুরের যে যাদু সৃষ্টি করে গেছেন, এরপর কোনো পুরুষকণ্ঠ কি আর আসর জমাতে

পারবে? আমারও মনে সংশয় জাগল।

সৌম্য দর্শন প্রবীণ ওস্তাদ ফৈয়াজ এসে আমাদের অভিবাদন করে মাইকের সামনে বসলেন। তাঁর পৌরুষব্যঞ্জক সুদর্শন গোঁফ-জোড়া যেন গভীর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। খেয়াল গান শুরু করবার আগে তাঁর বিখ্যাত ঘরানার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি কিছুক্ষণ 'আলাপ' অর্থাৎ সুরবিস্তার করে রাগ রূপটি অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুললেন। তিনি আওয়াজ দিতেই আসর জমে গেল। সিদ্ধপুরুষ একেই বলে। আগে রেকর্ড শুনে যেমনটি ধারণা করেছিলাম, সামনে তাঁর গান শুনে বুঝলাম সে ধারণা কত অসম্পূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলাম। কেদারা রাগটি আমার মোটামুটি রকম জানা ছিল। রেকর্ডেও এ গানের একাধিক গান শুনেছিলাম। কিন্তু এ রাগের রূপায়ণ যে এত বৈচিত্র্যময় এবং এত চমৎকার হতে পারে, ফৈয়াজের গান শুনবার আগে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

ফৈয়াজের যে একটি আশ্চর্য কবিমন ছিল, তার পরিচয় পেয়েছিলাম এক সকাল বেলার আসরে। ঐ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলেই।

সেই দিন ফৈয়াজের গানের প্রোগ্রাম ছিল না। তিনি এসেছিলেন শ্রীমতী কেসর বাঈ কেরকরের গান শুনতে। ফৈয়াজ ছিলেন আগ্রার 'রঙ্গিলা' ঘরানার গায়ক। কেসর বাঈ অত্রৌলি ঘরানার প্রতিনিধি, বিখ্যাত ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের প্রধানা শিষ্যা। দুই ঘরানার স্টাইল অর্থাৎ গায়কী আলাদা।

সে এক স্মরণীয় অপূর্ব দৃশ্য। স্টেজে বসে সুললিত 'ললিত' রাগে খেয়াল গাইছেন, ভারতের শ্রেষ্ঠা খেয়াল গায়িকা কেসর বাঈ, আর শ্রোতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে তাঁর জন্য বিশেষ ভাবে রাখা একটি সোফায় বসে তাঁর গান পরম আগ্রহে শুনছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক ফৈয়াজ খাঁ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল খাঁ সাহেবের এই উপস্থিতিতে সম্মানিত উৎসাহিত অনুপ্রাণিত বোধ করছিলেন কেসর বাঈ। তার ফলে অতি অপূর্ব গাইলেন তিনি। মাঝে মাঝে তারিফ

করে উঠতে লাগলেন খাঁ সায়েব, আর স্টেজে বসেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে তাঁর তারিফ সসম্মানে শিরোধার্য করে নিচ্ছেন কেসর বাঈ। অবশেষে গানটি যখন শেষ হয়ে গেল তখন মুগ্ধতার উত্তেজনায় অধীর ফৈয়াজ খাঁ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে এবং শ্রীমতী কেসর বাঈ-এর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "অ্যায়সা গাবৈয়া তামাম হিন্দুস্তানমে ঔর নহী হ্যায়। ইনকা গানা শুনেমে মুঝে অ্যায়সা লাগা কি ইমলিকে পত্তীপর হাথী নাচ রহা থা।" অর্থাৎ 'এর মতো গাইয়ে তামাম হিন্দুস্থানে আরেকটি নেই। এর গান শুনে আমার মনে হচ্ছিল যেন তেঁতুল-পাতার উপর হাতী নাচছে।'

এই অতি সুন্দর কবিত্বময় উপমাটির তাৎক্ষনিক প্রয়োগ করে (খাঁ সাহেবের উপস্থিত-কবিত্ব এ থেকে বোঝা যায়) তিনি বুঝিয়ে দিলেন কেসর বাঈ-এর কমনীয় নারী কণ্ঠের নরম তেঁতুল পাতার ওপর তানবহুল খেয়াল গানের দুরন্ত শক্তিশালী হাতী যে দাপটের সঙ্গে অবলীলাক্রমে নেচে গেল, সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কবিত্ব তো বটেই। ভিন্ন ঘরানার গায়িকাকে প্রকাশ্যে এত বড় প্রশংসা করে নিজের উদার হৃদয়ের পরিচয় দিলেন তিনি।

সম্মেলনের আরেকটি প্রভাতী আসরের কথা বলছি, যে আসরের শেষ (এবং বলা বাহুল্য শ্রেষ্ঠতম) শিল্পী ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ। তিনি অনবদ্য খেয়াল গান ('উন সঙ্গ লাগে') গেয়েছিলেন রামকেলি রাগে, যা শুনে ঠিক আমার সামনের সারিতে বসা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল এবং ঠুংরি গায়ক অবিস্মরণীয় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় উৎসাহিত হয়ে আনন্দোজ্জ্বল মুখে মাথা দোলাছিলেন এবং তাঁর পাশের বন্ধুটিকে বলছিলেন এমন চমৎকার বন্দিশের রামকেলি খেয়াল তিনি আর কখনো শোনেন নি।

এখানে বলে রাখি ভীষ্মদেব ছিলেন কলকাতাপ্রবাসী বিখ্যাত ওস্তাদ 'খলিফা' বদল খাঁ সাহেবের প্রিয়তম শিষ্য। বৃদ্ধ বদল খাঁ ছিলেন ওস্তাদদের ওস্তাদ। তাই তাঁকে 'খলিফা' বলা হতো। বঙ্গদেশে

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চায় বদল খাঁ সাহেবের অবদান ছিল অসামান্য। কলকাতায় তাঁর আর দুজন অসাধারণ শিষ্য ছিলেন সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)।

ভীষ্মদেবের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন ওস্তাদের কাছে তালিম নিচ্ছেন, এইভাবে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গান শুনতে শুনতে তাঁর ভালো ভালো সুরের কাজ, ভালো ভালো তান মনের নোটবইতে যত্নে টুকে রাখছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে বলা হয়তো অবান্তর হবে না যে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁও ভীষ্মদেবের গান শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন (যেমন হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী বা জ্ঞান গোসাঁইর গান শুনেও) এবং তাঁকে কিছু কিছু মূল্যবান 'চিজ' দিয়েও ছিলেন তাঁর নিজের অমূল্য সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে, দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি। অধিকাংশ ওস্তাদই ছিলেন অত্যন্ত সংকীর্ণ চিত্ত, কৃপণ, নিজেদের ঘরানার ভালো ভালো 'চিজ' তাঁরা নিজেদের ঘরানার মধ্যেই সীমিত রাখতেন। বাইরে যেতে দিতেন না, ঘরানার বাইরের কাউকে শেখাতেন না। আমাদের হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষক পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে—ব্যাপকভাবে রাগসঙ্গীতের প্রচার, প্রসার এবং জনপ্রিয় করণে যাঁর অবদান অমূল্য—এজন্য দুঃখ করেছিলেন। বহু বিশিষ্ট ঘরানার ধ্রুপদ, ধামার খেয়াল টপ্‌পা ঠুংরি ভজন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর গানগুলোর বাণী এবং স্বরলিপি সংগ্রহ করে তাঁর সংকলিত কোষগ্রন্থে ('ক্রমিক পুস্তক মালিকা' যা ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে মারাঠী এবং হিন্দী সংস্করণে) স্থায়ীরূপ দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সারা ভারত পরিভ্রমণ করে ওস্তাদদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। একাধিক ক্ষেত্রে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে শূন্যহাতে, যার ফলে সেই ওস্তাদদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেক মূল্যবান রত্ন চিরতরে হারিয়ে গেছে।

শুধু সঙ্গীত পরিবেশনে অনন্য শিল্পীই নন। সঙ্গীতে অসামান্য

পণ্ডিতও ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ। তাঁর প্রচুর সহায়তায় এবং অমূল্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে ভাতখণ্ডেজির এই বিরাট কোষগ্রন্থমালা, যার জন্য ভাতখণ্ডেজির প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

ফিরে যাই মূল প্রসঙ্গে, ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের অসামান্য খেয়াল গান শুনে মনে হলো খেয়াল গান যেন তাঁরই জন্যে সৃষ্ট হয়েছিল, এবং তিনিও জন্মেছিলেন খেয়াল গাইবার জন্যেই।

ফৈয়াজ খাঁর গান রেকর্ডেও শুনবার আগে শ্রদ্ধেয় এবং বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায়ের ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জীতে ফৈয়াজ খাঁর অনবদ্য ঠুংরি গানের প্রশংসা পড়ে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ফৈয়াজ প্রধানতঃ ঠুংরি গায়ক। তাঁর খেয়াল গানের উল্লেখ পাইনি দিলীপকুমারের লেখায়। এখন ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের দুর্দান্ত খেয়াল গান শুনে (এবং ঠুংরি না শুনে) দিলীপকুমারকে ভ্রান্ত বলে মনে হলো। ঠুংরি গান খেয়াল গানের তুলনায় অনেকখানি হালকা, তার মেজাজও আলাদা। ওস্তাদ মহলে কুল-মর্যাদায় খেয়ালের চাইতে ঠুংরির স্থানও নীচুতে ; এজন্য আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে অনেক খেয়ালী ওস্তাদ ঠুংরি গাইতে চান না।

কিন্তু শ্রোতাদের অনুরোধে—যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বনাম-ধন্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—ফৈয়াজ খাঁ নিজের আগেকার মেজাজ যেন যাদুমন্ত্রে বদলে ফের নতুন মেজাজে গাইলেন সেকালের ঠুংরি সম্রাট মৌজুদ্দিন খাঁ সাহেবের অনবদ্য ভৈরবী রাগিনীর ঠুংরি গান ঃ 'বাজুবন্দ খুলি খুলি যায়।'

মনে হলো এ যেন আরেক ফৈয়াজ, যেন এঁরই জন্য ঠুংরি গানের জন্ম হয়েছিল এবং ইনিও জন্মেছিলেন ঠুংরি গাইবেন বলেই। মৌজুদ্দিন এই গান গেয়ে শ্রোতাদের চোখে জল আনতেন শুনেছিলাম। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মুখে এই গান শুনেও আমাদের চোখে জল এসে গেল। সঙ্গীতের মাধুর্য মাত্রা ছাড়িয়ে উঠলে শ্রোতার চোখে জল ঝরে হয়তো এই কারণে, যে, গভীর আনন্দ অনুভূতির সঙ্গে বেদনা বোধের নিকট সম্বন্ধ আছে।

সেই প্রভাতী আসরে ওস্তাদ ফৈয়াজের অনবদ্য খেয়ালের পরই তাঁর অনবদ্য ঠুংরি শুনে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে আমার মন চলে গিয়েছে ঢাকা শহরে আমার সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে। ঢাকায় তাঁর খেয়াল গান শুনেও আমি তাঁকে শুধু খেয়াল গাইয়ে বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু তারপর একদিন তাঁর তালিম দেবার ঘরে বসে তাঁর একটি ঠুংরি গান শুনে চমকিত হয়েছিলাম ঃ

"কাটত রৈন পিয়া বিন
তরপ সারী,
পিয়া মিলবেকো
বতন বাতা প্যারী।"

এই ছিল গানটির অস্থায়ী অর্থাৎ প্রথমাংশ। (এই টুকুই আমি তালিম পেয়েছিলাম, পরের অংশ অর্থাৎ অন্তরায় তালিম পাবার আগে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে। তাই গানের বাকি অংশ অর্থাৎ অন্তরা আমার মনে নেই।) ওস্তাদ গুল মহম্মদ ঢাকা শহরকে ভালবেসেই বাকি জীবনের জন্য তাঁর আপন শহর বলে ভেবে নিয়েছিলেন, যদিও জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঠান বংশোদ্ভূত। তখন ভাবিনি কিন্তু এতদিন পরে এখনকার পরিণত দৃষ্টিতে পিছন দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে হয়তো তাঁর জীবনে এমন কোনো গভীর ট্র্যাজেডি ছিল যা তিনি মুখ ফুটে কাউকে বলতে চাননি—যা তাঁকে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার অসাধারণত্ব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত খ্যাতি, সম্মান বা আর্থিক সাফল্য বিষয়ে উদাসীন করেছিল। তাই আমাদের দেশের সঙ্গীত-রসিকবৃন্দ যা থেকে তাঁকে মনে রাখবে বা এক ডাকে চিনবে, এমন খ্যাতি তিনি রেখে যাননি বা রেখে যেতে পারেন নি, রেখে যাবাব কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করেন নি বলেই। দুঃখ লাগে ভাবতে, তাঁর মত অসাধারণ গুণীর গানের একখানা রেকর্ডও নেই ; থাকলে তা আমাদের সঙ্গীত ভাণ্ডারের একটি পরম সম্পদ হয়ে থাকত বলে আমার ধারণা।

আমার জীবনের অন্যতম পরম সৌভাগ্য যে আমি নিতান্ত খাম-খেয়ালির বশেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাশ থেকে নিজের নাম কাটিয়ে দিয়ে ১৯৩৪ সালে ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম এবং তেমনি খামখেয়ালির বশেই ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধে তালিম নিতে শুরু করেছিলাম। তাঁর কাছে পাওয়া তালিমই আমাকে রাগসঙ্গীতের রসের জগতে প্রবেশের পাসপোর্ট দিয়েছিল। এর মূল্য অপরিসীম।

কিন্তু ওস্তাদ ফৈয়াজ প্রসঙ্গ এখনো শেষ হয়নি। তাঁকে আমার শেষ দেখা এবং তাঁর গান শেষ শোনার অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার কথা বলি। সঠিক সালটির উল্লেখ করতে পারছি না, কারণ তখন ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না এবং আমার স্মৃতির খাতায় সেই অভিজ্ঞতার ছবিটি আঁকা আছে, কিন্তু সাল-তারিখ লেখা নেই। শুধু মনে আছে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সেই সর্বশেষ কলকাতা আগমন।

আমি তখন কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলের বাসিন্দা। পিসতুতো ভাই কান্তিকুমার আর আমি প্রায়ই তানপুরায় ঝংকার দিতে দিতে রাগ সঙ্গীত অভ্যাস করতাম এবং পিসেমশাই স্নেহবশতঃ তা বরদাস্ত করলেও মাঝে মাঝে বলেই ফেলতেন, এই সব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনলেই তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়, কান কাঁদতে থাকে।

একদিন শুনলাম সেদিনই সকালে বালিগঞ্জ ষ্টেশনের অনতিদূরে বিশিষ্ট এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ঘরোয়া বৈঠকে ওস্তাদ ফৈয়াজ গান শোনাবেন। তিনি তখন ঐ বাড়ীতে দিন দুয়েকের জন্য অতিথি। ধনী ভদ্রলোক ছিলেন ওস্তাদ ফৈয়াজের এবং তাঁর গানের পরম ভক্ত, খাঁ সাহেব কলকাতায় এলে প্রায়ই তাঁর আগ্রহে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

এতদিন সঙ্গীত সম্মেলনের বড় আসরে দূর থেকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে খাঁ সাহেবের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি, এবার ছোট্ট ঘরোয়া পরিবেশে, কাছে বসে তাঁর অ-মাইক স্বাভাবিক কণ্ঠের গান শুনবার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে মন চাইল না। আমরা যাবার সময়

পিসেমশাইকেও একরকম জোর করেই সঙ্গে নিয়ে গেলাম। বললাম, "ভালো না লাগলেও ভবিষ্যতে বলতে পারবেন ভারতের সেরা ওস্তাদের গান স্বকর্ণে শুনেছেন। অন্তত সেই জন্যও চলুন।"

আসরটি নিতান্তই পারিবারিক, বাইরের লোকের জন্য নয়। তবু বিশেষ অনুনয় করে প্রবেশাধিকার পেলাম।

প্রথমে খাঁ সাহেবের শ্যালিকার পুত্র বালক শরাফৎ হোসেন অতি চমৎকার একখানা ভৈরবী ঠুংরি শোনালে ত্রিমাত্রিক এক তালে ঃ "একেলি মত যাও রাধে যমুনা-কিনার।" অতি মধুর সুরেলা কণ্ঠ। গাইবার সাবলীল ভঙ্গীটুকুও অতি সুন্দর, সেদিনের সেই বালক, শরাফৎ পরে ওস্তাদ শরাফৎ হোসেন খাঁ রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

বালক শরাফৎ কর্তৃক আসর মাতের পর যে ক'জন শিল্পী গাইয়ে বা বাজিয়ে ছিলেন মনে থাকবার মতো যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। সবার শেষে ওস্তাদ ফৈয়াজ এসে আসরে বসলেন। আমাদের একেবারে মুখোমুখি। সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আজ তবিয়ৎ ভালো নেই, ভেবেছিলাম গাইব না। কিন্তু শুনলাম অনেকে খুব দূর থেকেও এসেছেন মেহেরবানি করে আমার গান শুনতে। না গাইলে গোস্তাকি হবে, তাই হালকা করে একটি ঠুংরি গেয়ে শোনাব।"

গাইলেন অনবদ্য ঠুংরি গান।

"বাজে মোরি পায়েলিয়া।"

অতি ছোট ঘরোয়া আসর। মাইক ছিল না, কারণ মাইকের প্রয়োজন ছিল না। মাইকের মাধ্যম দ্বারা বিকৃত নয়, ওস্তাদ ফৈয়াজের নিজস্ব স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে তাঁর গান সেই প্রথম শুনলাম। মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে গেলাম শুনে। সম্মেলনে মাইক যন্ত্রের মাধ্যমে যা শুনেছি, তার চাইতে এ কণ্ঠ অনেক বেশী মধুর।

গানটি কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা কোনো গোপনারীর জবানিতে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সে লুকিয়ে অভিসারে চলেছে কেউ যেন তার এই গোপন অভিসার যাত্রা টের না পায়, এই তার মনোবাসনা, এবং

পাছে কেউ টের পায় এই ভয়ে সে প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগ জর্জর, তার সঙ্গে শত্রুতা করছে তার পায়েলিয়া অর্থাৎ পায়ের নূপুর। তার চলার ছন্দে ছন্দে নূপুরগুলি রুনু ঝুনু বেজে উঠে তার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ধরা পড়ার আশংকায় অভিসারিকা গোপবালা প্রতি মুহূর্তে শংকিতা।

লজিক বা যুক্তি ঠাকুরানী অভিসার যাত্রিনীকে ডেকে বলতে পারেন, "বাছা, পায়ের নূপুরের ধ্বনি যদি তোমার এতই উদ্বেগের কারণ, তাহলে অভিসারে রওনা হবার আগে পা থেকে পায়েলিয়া-গুলোকে খুলে রেখে গেলেই তো পারো ?"

কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যের বা ঠুংরি গানের অভিসারিকারা পায়েলিয়া পায়ে পরেই অভিসারে যাবে, এবং যমুনা কিনারে একলা যাওয়ার বিরুদ্ধে হাজার সাবধান বাণী শুনেও একলাই যমুনা কিনারে যাবে, তা না হলে বৈষ্ণব কবিতার আর ঠুংরি গানের রস জমে না।

গান গাইতে গাইতে সুরের মায়ায় বিভোর, আত্মহারা হয়ে গেলেন সুরের মায়াবী ফৈয়াজ। আমার মনে হতে লাগলো যান্ত্রিক মাধ্যমের কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে ফৈয়াজের গান যারা শোনেন নি, তাঁরা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার সৌভাগ্য থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত।

কান্তিকুমার আর আমি দুজনই রাগসঙ্গীত চর্চার সহধর্মী, ওস্তাদ ফৈয়াজের পরমভক্ত, তাঁর সেই অনবদ্য সঙ্গীত শুনে আমরা চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু লক্ষ্য করলাম যিনি উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতের নাম শুনলেই ক্ষেপে উঠতেন বা বিদ্রূপ করতেন, যিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন, আমার সেই পিসেমশাই পরম নিবিষ্টভাবে দু'চোখ বুজে খাঁ সাহেবের গান শুনছেন, বুকটা দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে, আর দু'চোখ বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা।

গান শুনে এই মহান শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায় এত অভিভূত হয়েছিলাম যে ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁকে প্রণাম করি, কিন্তু করি নি,

সংকোচ বাধা দিয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলে ধন্য হই। কিন্তু কথা বলি নি। তারপরই সবাইকে নম্র অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিয়ে বিশ্রাম নিতে বাড়ির অন্দরে ফিরে গেলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ। তারপর আর কখনো তাঁকে দেখিনি। খাঁ সাহেব অত্যন্ত অমায়িক নিরহঙ্কার মানুষ ছিলেন বলে শুনেছি। তাঁকে এত কাছে পেয়ে আলাপের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আলাপ করিনি। এ আফসোস আমার কোনো দিন যাবার নয়।

এবার হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের আরেকজন অবিস্মরণীয় দিক্‌পাল ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গে আসি, যাঁর স্বর্গীয় সঙ্গীতের সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহরে, রেকর্ডের মাধ্যমে।

ফৈয়াজ এবং আবদুল করিম দুজন সমসাময়িক ওস্তাদ ছিলেন সে সময়ে সর্ববাদিসম্মতভাবে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের জগতে দুই প্রধান। দুজনের মধ্যে কে বেশি বড় গায়ক। সে ধরনের তুলনা-মূলক বিচার অবান্তর এবং অনর্থক বলেই আমার বিশ্বাস। এ তো ওজনের ব্যাপার নয় যে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মেপে দেখা যাবে কার ওজন বেশি। তাছাড়া সঙ্গীতের রসগ্রহণ ব্যক্তিগত রুচি বা পছন্দের ব্যাপার, সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিরপেক্ষ তুলনাত্মক বিচার সম্ভব নয়। ঢাকায় আমার ওস্তাদ (গুল মহম্মদ খাঁ সাহেব) বলতেন ফৈয়াজ মস্ত গায়ক, কিন্তু তার সঙ্গে একই আসরে গাইবার যোগ্য বলে আমি নিজেকে ভাবতে পারি, কিন্তু কি আশ্চর্য, অতুলনীয় যাদু খোদা দিয়েছেন করিম ভাইয়ের গলায়! ওর সঙ্গে এক আসরে গাইবার কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না।"

মোটামুটি ভাবে বোধ হয় এ কথা বলা যায় এই দুই বিরাট গায়কের গানের রেকর্ডগুলি বাজিয়ে শুনে শ্রোতারা হয়তো অনুভব করবেন ফৈয়াজের গান ছিল দরবারী, আর আবদুল করিমের গান ছিল তপোবনী, ইংরাজী বিশেষণে বোঝাতে গেলে বোধ হয় বলা

চলে ফৈয়াজের গান ছিল 'ম্যাজেস্টিক' আর আবছুল করিমের গান ছিল 'ডিভাইন'। অথবা হয়তো সত্যের আরো কাছে আসা যায় যদি বলি ফৈয়াজ খাঁর গান ছিল মুখ্যতঃ রাজসিক এবং আবছুল করিমের গান মুখ্যতঃ সাত্ত্বিক।

অবশ্য মাধুর্যের মাপকাঠি দিয়ে মাপলে বোধ হয় আবছুল করিমকে অতুলনীয় বলা চলে। গাইতে গাইতে সুরের যাছুতে ডুবে গিয়ে তিনি নিজে যেমন আত্মহারা হয়ে যেতেন, শ্রোতারাও তেমনি যেন অন্য জগতে চলে যেতেন। তাঁর 'পিয়া বিন নহী আওয়ত চৈন', 'যমুনাকে তীর', 'পিয়া মিলনকী আস' প্রভৃতি গানগুলির রেকর্ড শুনলে শ্রোতারা তাঁর কণ্ঠের অতুলনীয় মাদকতাময় যাছুর পরিচয় পাবেন। এ গানগুলি বারবার শুনলেও পুরানো হবে না। এই জাতের গানকেই বলা চলে সত্যিকারের 'ক্লাসিক' গান। এবং একথাও হয়তো ঠিক যে তাঁর সমকালে রাগ সঙ্গীতের আর কোন গায়ক শ্রোতাদের মনের ভিতর দিয়ে এমন করে মরমের গহনে প্রবেশ করতে পারেন নি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমঝদার শ্রোতা কলকাতা শহরে যত আছেন তত আর কোথাও নেই, একথা আমি শুনেছিলাম কলকাতায় মহারাষ্ট্র নিবাস ভবনে (হাজরা রোড) একটি সঙ্গীত সভায় ভারতের অন্যতম প্রধান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী প্রধান পণ্ডিত বিনায়ক নারায়ণ পট্টবর্ধনের মুখে। তিনি বলেছিলেন, 'বহু বছর ধরে আমি ভারতের নানা স্থানে গানের আসরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গেয়ে আসছি। কলকাতার মতন এত বেশী সংখ্যক সুশৃঙ্খল, আগ্রহী, সমঝদার শ্রোতা আমি আর কোথাও পাইনি। এমন কি বোম্বাইতেও নয়।'

আবছুল করিম কলকাতায় এসে গান শুনিয়ে কলকাতাকে মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সীজারের মত তিনি বলতে পারতেন ঃ 'এলাম, গাইলাম, জয় করলাম।' কারণ ঠিক তাই তিনি করেছিলেন।

ওস্তাদ আবছুল করিম জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিল্লীর কাছাকাছি 'কিরাণা' নামক একটি গ্রামে একটি সঙ্গীতজ্ঞ মুসলিম পরিবারে,

১৮৭২ সালে নভেম্বর মাসে। তাঁর দু'জন পূর্বপুরুষ নায়ক ধোন্দু এবং নায়ক বান্নু ছিলেন গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের দরবারের সভাগায়ক (১৪৮৬—১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। নায়ক ধোন্দু ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। পারিবারিক কিংবদন্তী যদি সত্যি হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে নায়ক ধোন্দুকে দেখা দিয়ে তাঁকে বর দিয়ে গিয়েছিলেন, 'তোর কণ্ঠ আমার বাঁশীর মত মধুর হবে।'

শৈশব থেকেই প্রধানত দুই কাকা আব্দুল্লা খাঁ ও ননহে খাঁর কাছে গান শিখে আবদুল করিম মাত্র এগারো বছর বয়সেই পুরোদস্তুর আসরে গেয়ে আসর মাত করেছিলেন। কথিত আছে এক বছর তিনি জুনাগড়ের নবাবের দরবারে সভাগায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর গানের যাদুতে নবাব সাহেবের নিদ্রাহীনতা রোগ সেরে গিয়েছিল। মানুষের এমন কি পশুপক্ষীরও স্নায়ুর ওপরে সঙ্গীতের এই জাতীয় প্রভাবের কথা আমার ওস্তাদজি এবং তারপর ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের মুখেও শুনেছি।

তবলা সারেঙ্গী এবং বীণাবাদনে ও আবদুল করিম খাঁ সাহেবের অসাধারণ দখল ছিল, যদিও কণ্ঠসঙ্গীতের যাদুকর রূপেই তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল।

আবদুল করিম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং সাধারণ ভিত্তির ওপর যে গায়নশৈলী সৃষ্টি করেছিলেন, মাধুর্যে এবং মনোহারিত্বে যা অতুলনীয়, তাঁর জন্মস্থানের নামানুসারে তাই প্রসিদ্ধ হয়েছে 'কিরাণা ঘরানা' নামে।

এই 'কিরাণা ঘরানার' প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গায়কের (বা গায়িকার) কণ্ঠস্বরের মাধুর্য এবং সবরকম চঞ্চলতা বা তাড়াহুড়ো পরিহার করে সুসমঞ্জস্য প্রশান্ত গতিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে রাগের বিস্তার। স্বরের ওজনের ওপর ও অসামান্য গুরুত্ব দেওয়া হয় 'কিরাণা ঘরানায়'। রাগ সঙ্গীতের লক্ষ্য হচ্ছে সুর এবং ধ্বনির যথোচিত প্রয়োগে শ্রোতার মরমে গভীর ভাবে তা সঞ্চারিত করে দেওয়া। এই সঞ্চরণের ব্যাপারে স্বরের ওজনের গুরুত্ব অসাধারণ। এই

কথাটি সুরের যাদুকর আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গায়কী সম্পর্কে আলোচনায় আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন খাঁ সাহেবের কন্যা এবং কিরাণা ঘরানার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা গায়িকা স্বনামধন্যা শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর, আমি যাঁর গানের অত্যন্ত ভক্ত। আবদুল করিম প্রবর্তিত কিরাণা ঘরানার (মর্মস্পর্শী মাধুর্যের জন্য যে ঘরানার তুলনা নেই।) আর দুজন অসাধারণ গায়িকা রোশনারা বেগম (যিনি পরবর্তীকালে পাকিস্থানে স্থায়ীভাবে ছিলেন এবং সেখানেই লোকান্তরিত হন)। এবং শ্রীমতী গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল। দক্ষিণী রাগ সঙ্গীতের মহান সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী করিম খাঁ সাহেবের শিষ্যদের কাছ থেকে কিরাণা ঘরানার তালিম নিয়েছেন।

কিরাণা ঘরানার প্রধান শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন সওয়াই গন্ধর্ব, বেহেরে বুয়া, ভীমসেন যোশী, বাসবরাজ রাজগুরু প্রমুখ।

১৯৪০ সালে ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে আসার আগে সর্বশেষ কলিকাতা থেকে ঢাকায় গিয়েছিলাম ১৯৩৯ সালে। তখন আবার বেশ কিছু দিনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম আমার সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের। তখন কবিগুরুর ভাষায়ঃ "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব।" নাৎসী নায়ক হিটলার প্রবর্তিত দ্বিতীয় বিশ্ব লড়াই চলেছে ইউরোপে, হিটলারী বাহিনীর অগ্রগতি এবং আমাদের শাসক এবং শোষক ইংরাজ জাতের দুর্গতি দেখে অনেকে খুশী হয়ে ভাবছেন ও জাতের মেরুদণ্ড হিটলার এবার এমনভাবে ভেঙে দেবেন যেন আর কোনোদিন জোড়া না লাগে; কেউ কেউ শংকিত চিত্তে ভাবছেন যুদ্ধে জিতে হিটলারের জার্মানী যদি ভারত দখল করে, তাহলে ইংরেজের চাইতে জার্মানরা বেশী অত্যাচারী হবে না তো ? ইংরেজ জাতের তবু একটু চক্ষুলজ্জা ছিল, যা কিছু করতো আইনের কাঠামোটি বজায় রেখে, জার্মান নাৎসীদের তো ওসব বালাই নেই।

কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম কি হবে তা নিয়ে ওস্তাদজির কিছুমাত্র

মাথাব্যথা দেখতে পেলাম না, খোদার যা মর্জি তাই হবে, তাই হোক এই তাঁর মনোভাব লক্ষ্য করলাম। কিন্তু ঘুরে ফিরে তাঁর মুখে আর্ত-হাহাকার: করিম ভাইয়া নেই! ভারতের সঙ্গীত জগতকে কাঁদিয়ে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন আবদুল করিম, মাত্র ৬৫ বছর বয়সে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জগতে তাঁর একমাত্র প্রণম্য পুরুষ অগ্রজোপম সুরসম্রাট চলে গেছেন, দুনিয়াটাকে বড় ফাঁকা মনে হচ্ছে, বলতে বলতে দুচোখ ভিজে উঠল ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের।

আবদুল করিম খাঁ সাহেব শ্রীঅরবিন্দকে গান শোনাবার জন্য শিষ্যবৃন্দসহ ট্রেনে পণ্ডিচেরি অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিচেরি যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। মাঝপথে অসুস্থ বোধ করে নেমে পড়লেন একটি স্টেশনে। বললেন, "ও অখ্‌ত আ গিয়া" অর্থাৎ "সময় এসে গেছে"। সময় মানে মর্ত্যভূমি থেকে শেষ বিদায় নেবার সময়। স্টেশনের প্লাটফর্মের ওপর বিছানো হলো চাদর। শেষ নামাজ পড়লেন আবদুল করিম। তানপুরার তারের ঝংকারে কণ্ঠ মিলিয়ে সঙ্গীতে শেষ প্রার্থনা জানালেন পরমেশ্বরকে, তারপর অন্ত-ধামে চলে গেলেন মরদেহ ছেড়ে, তারিখ ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৭। হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের ইতিহাসে বিষণ্ণতম তারিখ।

আবদুল করিম ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম, ধর্মীয় উদারতায় কবীরের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল ছিল।

হিন্দুস্থানী (উত্তর ভারতীয়) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অসামান্য পারদর্শী তিনি দক্ষিণ ভারতের (কর্ণাটি) শাস্ত্রীয় সঙ্গীতও গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। গ্রামোফোন রেকর্ডেও দক্ষিণী রাগে কয়েকটি চমৎকার গান রেকর্ড করে গেছেন যা শুনে উভয় জাতীয় শ্রোতাই তৃপ্ত হবেন।

করিম খাঁ সাহেব যে শুধু গায়ক হিসেবে বিরাট বড় ছিলেন তাই নয়, মানুষ হিসেবেও ছিলেন বিরাট বড়। গান গেয়ে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, তেমনি অকাতরে অকৃপণ হাতে তা ঢেলে দিয়েছেন দরিদ্র আর দুর্গতের সেবায়। তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল সাধারণ।

অবিরাম সুরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ফলে করিম খাঁ সাহেবের দুই চোখে সদাসর্বদা গভীর স্বপ্নালুভাব ফুটে থাকত। তাই দেখে একদিন শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট অতিশয় সংকুচিতভাবে চুপি চুপি খাঁ সাহেবের একজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "খাঁ সাহেবের চোখে সর্বদাই অমন ঢুলু ঢুলু ভাব কেন? কোনরকম নেশা আছে নাকি ওঁর?"

শিষ্যটি বলেছিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সুরের নেশায় উনি সর্বদাই ডুবে থাকেন।"

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতেব এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সম্পর্কিত একটি মর্মস্পর্শী মধুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অবিস্মরণীয় কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন তখনকার আগ্রাপ্রবাসী বন্ধু ভূতপূর্ব বিশিষ্ট কৌতুকশিল্পী ও মুকাভিনেতা (এবং তখন বিখ্যাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের পরিব্রাজক প্রতিনিধি) রমণীমোহন ঘোষাল মহাশয়। তিনি গায়ক ছিলেন না; কিন্তু রাগ সঙ্গীতের পরম ভক্ত ছিলেন এবং বাসও করতেন রাগ সঙ্গীত মুখরিত পরিবেশে। অবশ্য বাথরুমে বা স্নান ঘরের নিভৃতে অনেকেই যেমন একটু আধটু গান গেয়ে থাকেন, তিনিও তেমনি গাইতেন।

ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে রমণীবাবুকে বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় নানা শহরে ঘুরে বেড়াতে হতো। এই ভ্রমণক্রমে একবার তিনি যে হোটেলে আশ্রয় নিলেন, তিনি জানতেন না সেই হোটেলেই সদলে উঠেছেন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁও। একদিন ভোর বেলা নিজের ঘরের বাইরে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রমণীবাবু আপন মনে গুণ গুণ করে গাইতে শুরু করলেন তাঁব প্রিয়তম গান। যে গান তাঁকে সবচেয়ে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল, আবদুল করিমের রেকর্ডে গাওয়া সেই অতুলনীয় ভৈরবী ঠুংরি :

"যমুনাকে তীর।"

গুণ গুণিয়ে গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে তাঁর চোখে জল এসে গেল। একবার হঠাৎ খেয়াল হলো কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন, অমনি সংকোচে তাঁর গান থেমে গেল, কারণ তাঁর গান যে

কাউকে শোনাবার মতো নয় তা তাঁর অজানা ছিল না।

রমণীবাবু তাকিয়ে দেখেই চমকে উঠলেন। সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর গান শুনছেন স্বয়ং আবদুল করিম খাঁ সাহেব। কল্পনাতীত এই পরিস্থিতিতে রমণীবাবু বিব্রত লজ্জিত হয়ে গান থামাতেই খাঁ সাহেব বললেন, "থামলেন কেন বাবুজি? বড় ভালো লাগছিল আপনার গান।"

গভীর আন্তরিকতার সুস্পষ্ট সুর ছিল খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বরে, রমণীবাবু নিজের সঙ্গীত অক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থেকেও নির্ভুল বুঝতে পারলেন, সত্যিই তাঁর গান খাঁ সাহেবের ভালো লেগেছে।

তবু ভীষণ লজ্জিত বোধ করে রমণীবাবু বললেন, "খাঁ সাহেব গান আমি জানি না, কিন্তু আপনার এই গান আমাকে পাগল করে দিয়েছে, আমার বেসুরো, আনাড়ি গলায় গাইবার ধৃষ্টতা করে আমি আপনার স্বর্গীয় গানটির অমর্যাদা করেছি। আমার কসুর আপনি মাফ করুন।"

"আপনি ভালোবেসে গেয়ে আমার গানকে মর্যাদা দিয়েছেন বাবুজি।" বললেন সুরসৃষ্টির অদ্বিতীয় যাদুকর আবদুল করিম। "নিজের কণ্ঠে এ গান আমি অনেক গেয়েছি, অনেক শুনেছি। কিন্তু আজ পরের কণ্ঠে আপনার কণ্ঠে, আমার গান শুনে আমার যে কি ভালো লেগেছে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। ঐ আমার ঘর। আজ রাতে যদি মেহেরবানী করে পায়ের ধুলো দেন, আপনাকে প্রাণভরে আমার গান শোনাব।"

বলা বাহুল্য খাঁ সাহেবের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন রমণীবাবু। খাঁ সাহেবের সঙ্গীতামৃত-লোভী শ্রোতায় ঘর ভরে গিয়েছিল। "মিয়া তানসেনের অমর সৃষ্টি দরবারী কানাড়া রাগের যে অনবদ্য রূপায়ণ সে রাতে শুনবার দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল," আমাকে তাঁর আগ্রা শহরের বাড়িতে বলেছিলেন রমণীবাবু, "অমনটি শুধু আবদুল করিম খাঁ সাহেবের পক্ষেই সম্ভব।"

১৯৬৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর, শনিবার বিকেলে ঢাকা শহরে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খান সাহেব তাঁর পুত্রের ভবনে দেহ ত্যাগ করেন। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আমার অতি প্রিয় ঢাকা শহরে আমার পরম শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতগুরু এই মাটির পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন, গঙ্গার তীরে কলকাতা শহরে বসে এই সংবাদ ছাপা হরফে পড়ে বিষাদাচ্ছন্ন মনে তাঁর সম্বন্ধে কত কথাই না জেগে ওঠে।

সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে ঢাকার সঙ্গীতসমাজ তাঁকে ভাল বেসেছিল, পরম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল, তিনিও ঢাকার সঙ্গীত-প্রিয় মানুষকে এমন গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন যে সেই ভালবাসার বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতে তিনি নিজের মনকে রাজি করাতে পারেন নি। তাঁর স্নেহধন্য শহরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমার সঙ্গে ওস্তাদজির শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৪০ সালে, যখন আমি তাঁকে প্রণাম করে শেষবারের মতো ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি। তখন আমি তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতাম, এতগুলি বছরের অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও ঠিক সেই ধারণাই পোষণ করি। তাঁর মত বড় গুণী ঢাকায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নিজেকে সীমিত না রেখে, কলকাতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এলে তাঁর খ্যাতি আরো অনেকবেশী ব্যাপক হতো, আর্থিক সমৃদ্ধিও হতো অনেক বেশী। সে কথা সেই শেষ বিদায় নিয়ে আসবার সময়ে বলেছিলাম তাঁকে। তিনি মৃদু হেসে নিরাসক্ত ফকিরের মতো বলেছিলেন, "কি হবে আমার বেশী নাম ডাক, বেশী জমজমাটি, বেশী ধন দৌলত দিয়ে?" বলেছিলেন এমন ভাবে যে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ঢাকায় তাঁর মন বসে গেছে, এখানকার 'ঘরোয়া পরিবেশ' ছেড়ে গিয়ে তিনি কলকাতার 'বাজারে' পড়তে চান না, ঢাকার অল্পেই তাঁর দিল্ এত ভরে গেছে যে তিনি মনে করছেন তিনি জিন্দগীভর এখানেই থাকবেন, এটাই খোদার মরজি। ছোট বেলায় এক নাটকে একটি গান শুনেছিলাম, যার প্রথম অংশ ঃ

"আমি চাহি না হইতে
এ বিশ্ব জগতে
বিরাট বিপুল বিস্ময় মহান।
করো মোরে ধন্য
সৃজিয়ে নগণ্য,
যাহে জীবগণ লভয়ে কল্যাণ।"

ওস্তাদজির কথা শুনে আমার এই গানটির কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল।

ঢাকা শহরটি সঙ্গীত চর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। ঢাকার সঙ্গীত চর্চার একটি বিশেষ ঐতিহ্য ছিল, বাবার এবং কাকাদের মুখে শুনেছি তাঁরা যখন যুবক ছিলেন তখন ঢাকায় হরি ওস্তাদ (কর্মকার) ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিখ্যাত গায়ক; তিনি প্রধানতঃ ধ্রুপদ গাইতেন জবরদস্ত ভঙ্গীতে এবং দরাজ কণ্ঠে। তিনি থাকতেন নবাবপুর এলাকায়, যেখানে মাঝে মাঝে (এবং কখনো ঘন ঘন) ধ্রুপদের ঘরোয়া আসর বসত। তাই পাখোয়াজ বাজনাও এই এলাকায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল।

হরি ওস্তাদের গানের ভঙ্গীতে মধুর রসের চাইতে বীর রসের প্রাধান্য ছিল কিছু বেশী, তিনি মাঝে মাঝে বীর রসে মেতে উঠে পাখোয়াজীর সঙ্গে লয়ের লড়াই করতেন। হরি ওস্তাদের সাগ্‌রেদ এমদাদ খাঁও প্রধানতঃ ধ্রুপদই গাইতেন, কিন্তু শুধু লয়ের কসরতে মেতে না থেকে ধ্রুপদ গানে তিনি বেশ কিছুটা মাধুর্যের আমদানি করেছিলেন। তার ফলে গায়ক হিসেবে তিনি ওস্তাদের চাইতে বেশী জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন।

ধ্রুপদে যেমন হরি ওস্তাদ, তেমনি টপ্পাতে ঢাকার আসরে পসার করেছিলেন ভারতের উত্তর অঞ্চল থেকে বাংলায় এসে একজন গুণী গায়ক, যাঁর নাম হস্‌নু মিয়া। তিনি থাকতেন বেশীর ভাগ সময়ে ঢাকার ইস্‌লামপুর পাড়ায়। তাঁর ঢাকায় সঙ্গীত জীবন ছিল হরি ওস্তাদের সমসাময়িক আমার জন্মের (১৯১২) আগে। সুতরাং তাঁর

গান শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। আমার সঙ্গীতরসিক গুরু-জনদের মুখে শুনেছি টপ্পার 'দানা' টপ্পা গানের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাঁর গলায় চমৎকার অনায়াসে খেলত, তাই কালোয়াতী গানের যারা সমঝদার বা বোদ্ধা রসিক নন, তাঁরাও ওস্তাদ হস্‌নু মিয়ার টপ্পা গান শুনে মুগ্ধ হতেন। মিয়া সাহেব ঢাকা শহরেই কায়েম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর গানের খ্যাতি বাইরেও গিয়েছিল। আগরতলা রাজবাড়ি থেকেও তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসত, ঢাকার প্রিয় টপ্পা ওস্তাদ তিনি আগরতলায় গিয়ে রাজপ্রাসাদের আসর মাত করে আসতেন। সেই সময়ে ঢাকার সঙ্গীতামোদীদের প্রিয় হয়েছিলেন রোহিনী কর্মকার নামে আরেকজন গায়কও, তাঁর বিশেষত্ব ছিল ঠুংরি গান। শুনেছি তিনি বাংলার বাইরে গিয়ে ঠুংরির তালিম পেয়ে এসেছিলেন, এবং শুনে শুনে ও অনেক ভাল ঠুংরি গান তুলে এনেছিলেন, কারণ তিনি নাকি ছিলেন যাকে বলে শ্রুতিধর গায়ক—যে কোনো গান শুনেই তিনি মগজে তা হুবহু ধরে রাখতে পারতেন। অনেকটা আমাদের বর্তমান যুগের টেপরেকর্ডিং করার মতো। কথাটা অবিশ্বাস করি না, কারণ লোকান্তরিত সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি কোন্ ঘরানার বা কোন্ চালের ঠুংরি বাইরের সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে ঢাকার সঙ্গীত জগতে পেশ করেছিলেন, তা বলতে পারি না। এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে রোহিনীবাবু বাইরে গিয়ে যে ঠুংরির তালিম পেয়ে এসেছিলেন, এবং অথবা শুনে শুনে মনে গেঁথে এনেছিলেন, ঢাকায় ফিরে এসে সেই ঠুংরিকে আপন মনের মাধুরী মিলায়ে তাঁর নিজের মেজাজ এবং কণ্ঠের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঢাকার শ্রোতাদের মাতিয়ে দেবার মতো একটি ঢঙ্ বানিয়ে নিয়েছিলেন।

যেমন করেছিলেন স্বর্গতঃ রামনিধি গুপ্ত মহাশয়, যাঁর টপ্পা গান 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ঢাকার সঙ্গীত সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় নিধুবাবুর প্রসঙ্গ আপাত-দৃষ্টিতে অবান্তর মনে হতে পারে কারণ নিধুবাবুর সঙ্গীত পরিবেশন

ছিল গঙ্গার পারেই সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে কলকাতায়, ঢাকায় তিনি কখনো গাইতে যান নি। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ অবান্তর যে নয় তা আমার বক্তব্য থেকেই বোঝা যাবে। নিধুবাবু বাংলার বাইরে যে টপ্পা (হিন্দী এবং উর্দু ভাষায়) শিখেছিলেন বেশ সময়, অর্থ এবং পরিশ্রম ব্যয় করেই, বাংলায় তিনি ঠিক সেই গান শুনিয়ে আনন্দ আর খ্যাতি পান নি বা চান নি। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অসাধারণ, তাই একটি গানের মাধ্যমেই তিনি বলেছেন ঃ "নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা ?" টপ্পার বিশেষত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু অবাঙালী ভাষায় বাঙালী শ্রোতাকে টপ্পা শুনিয়ে তাঁর আশা মিটবে না এবং বাঙালী শ্রোতাদেরও মন ভরবে না জেনে তিনি গানের বাণী বাংলা ভাষায় নিজেই বানিয়ে নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ কবি মন তাঁর ছিল।

ঢাকার রোহিনী কর্মকার নিধুবাবুর বাংলা টপ্পার মতো বাংলা ঠুংরি বানান নি, কিন্তু তাঁর গানের শ্রোতাদের মধ্যে লখনৌর ঠুংরি এবং বারানসীর ঠুংরি গানের দুই বিশিষ্টচাল বা ধারার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁদের কাছে শুনেছি রোহিনী কর্মকারের ঠুংরি গাইবার ধরনে কিছু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ছিল যা ঢাকাই সঙ্গীত রসিকদের মুগ্ধ করেছিল।

ঢাকায় তবলা চর্চার ব্যাপক প্রচলনের মূলে ছিলেন ঢাকার তবলা বিশারদ এবং তবলা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রসন্ন বণিক্য মহাশয়। তিনি তবলার তালিম পেয়েছিলেন সেকালের বিশিষ্ট ওস্তাদ আতা হোসেনের কাছে। তবলা-শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রধানতম, বিখ্যাততম শিষ্য পূর্ব বাংলার মুরাপাড়ার বিশিষ্ট জমিদার রায় সাহেব কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশেষ করে যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতে যাঁর খ্যাতি সারা ভারতে বিস্তৃত এবং বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে ভারতের অধিকাংশ প্রথম সারির গায়ক এবং বাদকদের সঙ্গেই যিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করবার আগে কেশব-

বাবুর ঢাকার বাড়ীটি (ঢাকার সুত্রাপুরের বাজারের অনতিদূরে) ছিল সঙ্গীতের একটি পীঠস্থানস্বরূপ, এবং তিনি ছিলেন একাধারে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা শিল্পী এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন অভিজাত পৃষ্ঠপোষক। ভারত বিখ্যাত বহু গায়ক এবং বাদক তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছেন, এবং গান বাজনা শুনিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তবলা-ওস্তাদ নাথ্থু খাঁ, যাঁর কাছে কেশববাবু তবলায় 'দিল্লি বাজ' শিখে নিয়েছিলেন। কেশববাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই উচ্চাঙ্গ গান-বাজনার বৈঠক বসত, তাতে উদীয়মান শিল্পীদেরও সুযোগ দেওয়া হতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও রাগসঙ্গীতের চর্চা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রদের জন্য রাগ সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা যতদূর জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিশেষত্ব ছিল। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন আছে বলে শুনিনি। প্রতি বছর ছাত্রদের (এবং সেই সঙ্গে অধ্যাপকদের) বার্ষিক সম্মেলনে এক বা একাধিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে এনে সঙ্গীতের আসর বসানো ও ছিল নিয়মিত ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে বলি ঢাকার আমন্ত্রণে যে সব বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত গুণীরা এসে তাঁদের কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীত শুনিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, রামপুরের ওস্তাদ তসদ্দুক হোসেন খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কাকা স্বনামধন্য ওস্তাদ কালে খাঁ (সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যাল 'স্মৃতির অতলে' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন), বারানসীর সিদ্ধেশ্বরী বাঈ, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুমার শচীনদেব বর্মন, শচীন দাস মতিলাল প্রমুখ অসাধারণ সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ।

ঢাকায় ধ্রুপদ গায়ক ওস্তাদ এমদাদ খাঁ সাহেবের সম-সাময়িক ছিলেন খেয়াল গায়ক ওস্তাদ মাহমুদ হোসেন খাঁ সাহেব। টপ্পা এবং

ঠুংরি গানেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল; বিশেষ করে কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি কলকাতার বিশিষ্ট টপ্পা ওস্তাদ রমজান খাঁর কাছে তালিম পেয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদ গায়ক রূপে ঢাকার অভিজাত শিক্ষিত মহলে তাঁর সম্মান ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে তাঁর একাধিক শিষ্যও ছিলেন।

আমি মাহমুদ হোসেন খাঁ সাহেবের গান সর্বশেষ শুনেছিলাম ১৯৩১ সালে, যে সালে ঢাকার জগন্নাথ ইনটারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই-এ পাশ করে আমি কলকাতায় চলে এসেছিলাম বি-এ পড়তে।

তখন তাঁর বার্ধক্য শুরু হয়ে গেছে, সঙ্গীত জীবনের শেষ পর্ব চলছে, গলার জোর আর গলার ওপর দখল আগেকার মতো জোরালো নেই। তিনি তখন কোনো আসরে গান গাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছেন, তবু তাঁর একজন প্রবীণ শিষ্যের বিশেষ অনুরোধে আমাদের পাড়ায় (গেণ্ডারিয়া) এসেছিলেন। কোনো গৃহস্থের গৃহে নয়, একটি আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিবেশে। সন্ধ্যাবেলা। পরিবেশের উপযোগী ইমন কল্যাণ রাগে একটি গম্ভীর চালের খেয়াল গান শুনিয়ে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন বৃদ্ধ ওস্তাদ মাহমুদ হোসেন খাঁ সাহেব।

তারই অনুরূপ নামধারী (মহম্মদ হোসেন) এবং তাঁর চাইতে বয়সে বেশ ছোট একজন গায়ক ঢাকায় রাগসঙ্গীত ভক্ত সমাজে—বিশেষ করে ছাত্র এবং অধ্যাপক মহলে সমাদর লাভ করেছিলেন। যিনি তাঁর 'খসরু' ডাকনামেই ছিলেন অধিকতর পরিচিত। তিনি ছিলেন কুমিল্লার লোক, বি-এ পাশ করেন কলকাতায়। সহজাত সঙ্গীত প্রতিভা ছিল তাঁর। ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে তালিম পেয়ে তার অসাধারণ স্ফুরণ ঘটেছিল। কলকাতায় বি, এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে এসেছিলেন, কিন্তু গানের আসর মাত করে তাঁর এম-এ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে উঠল না। ওস্তাদ মাহমুদ হোসেন খাঁ সাহেব খসরু মিয়াকে বিশেষ স্নেহ করে তাঁকে বেশ কিছু ভালো ভালো 'চিজ' দিয়েছিলেন।

সে সময়ে ঢাকায় ঠুংরি গানের প্রিয়তম গায়ক ছিলেন 'পচা' নামে এক ডাকে পরিচিত, তাঁর পোষাকী নাম 'পূর্ণচন্দ্র নন্দী, খুব কম শ্রোতারই জানা ছিল। বালক বয়সে তিনি যাত্রা দলে গান গেয়ে বেশ নাম করেছিলেন। লেখাপড়া শেখার সুযোগ তাঁর জীবনে হয়নি। কোনো গুণী ওস্তাদ বা সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে বিধিবদ্ধভাবে তালিম পাওয়ার সৌভাগ্যও তাঁর হয়নি। গ্রামোফোন রেকর্ডে ভালো ভালো গান শুনে শুনে তিনি নিজের গলায় সেই সব তুলে নিয়েছিলেন। খেয়াল গানের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না, তাঁর সঙ্গীত সাধনা ছিল ঠুংরি গানকে কেন্দ্র করে। রাগ রাগিনীর তত্ত্ব বা ব্যাকরণে তাঁর দখল ছিলনা, আগ্রহও ছিল না, কিন্তু ঠুংরি গান পরিবেশনে এক আশ্চর্য অভিনব মনমাতানো ঢং তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, যার ফলে গান ধরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের মন ভিজিয়ে আসর মাত করে দিতেন। গান গাইতেন উদাত্ত কণ্ঠে, চড়া স্কেলে (এফ শার্পে) অনায়াস ভঙ্গীতে। ঢাকায় কি এক উপলক্ষে (১৯৩০) বিখ্যাত জীবন বাবুর বাড়িতে গানের আসরে 'পচা' নন্দীকে নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে শুনেছিলাম খাম্বাজ রাগের বিখ্যাত ঠুংরি গান ঃ

"না মানুঙ্গী, না মানুঙ্গী, ন মানুঙ্গী।"

এগান খানা আফতাব-এ-মৌসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠেও শুনেছি, বলা বাহুল্য শুনে ভালোও লেগেছে। তবু মনে হয়, ঢাকায় ওস্তাদী তালিম না পাওয়া গায়ক 'পচা নন্দীর কণ্ঠে ঐ গানটি শুনলে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব খুশী হয়ে তাঁর তারিফ করতেন।

সঙ্গীত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ঢাকা শহরে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ এসেছিলেন ১৯৩২ সালে নাগাদ। আগেই বলেছি তিনি এসেছিলেন ধ্রুপদী শিবসেবক মিশ্র এবং পশুপতি সেবক মিশ্রের সঙ্গে। মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয় ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু খাঁ সাহেব ঢাকা ছাড়তে পারেন নি, ঢাকায় সঙ্গীত সমাজের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা তাকে আটকে রেখেছিল। রোমান দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সীজার একটি দেশ

অনায়াসে জয় করে এসে মাত্র তিনটি ক্রিয়াপদে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন ঃ "এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।" ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবও তেমনি সঙ্গীত রসিক ঢাকাবাসীদের হৃদয়রাজ্য জয়ের কাহিনী তেমনি তিনটি ক্রিয়াপদে লিপিবদ্ধ করতে পারতেন ঃ "এলাম, গাইলাম, জয় করলাম।"

পয়লা বারেই তিনি আসর মাত করে দিয়েছিলেন। উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর যাকে বলে 'বুলন্দ আওয়াজ', তানপুরার তারের ঝংকারের মতো জোয়ারিদার মাধুর্যে ভরা। অপরূপ সুর জমাবার ভঙ্গী, রাগের রূপ ফুটিয়ে তোলার এমন মনোহারী দক্ষতা, এমন আশ্চর্য মীড়ের কাগজ, সারগমের এমন লীলায়িত বিন্যাস, গানের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বরের ওজনের এমন ওঠানামা, লয়ে এমন অনায়াস দখল—এমনটি ঢাকায় আর কখনো দেখা যায়নি, শোনা যায় নি। ঢাকার সঙ্গীত শিল্পী আর সঙ্গীত সমঝদার সবাই চমৎকৃত হয়ে অনুভব করলেন এতদিন তাঁরা ঢাকায় যত রাগ-সঙ্গীতের পরিবেশন শুনে এসেছেন ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের গান তা থেকে স্বতন্ত্র, এর যেন তুলনা নেই।

ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেব ছিলেন আগ্রার 'ডাগর' ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ আহমেদ খানের পুত্র, আগ্রার সেকালের বিখ্যাত গায়িকা জোহরা বাঈর সঙ্গেও তিনি সম্পর্কিত ছিলেন, এবং জোহরা বাঈর গায়নশৈলীর কিছুটা প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছিল, এ কথা তাঁর কাছ থেকে তালিম পাবার সময়ে তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি।

সঙ্গীতে তিনি যে শুধু ওস্তাদ শিল্পী ছিলেন তাই নয়, তাঁর সঙ্গীত চিন্তাও ছিল গভীর এবং ব্যাপক, সঙ্গীতের বিষয়ে তাঁর একাধিক মন্তব্যেই তার পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

"সত্যিকারের ওস্তাদ গাইয়ে তাঁকেই বলব, ওস্তাদী গান যারা বোঝে না সেই আনাড়ী শ্রোতাদেরও যাঁর গানে ভাল লাগবে, যারা বোঝে তাদের ভালো লাগাটা শুধু একটু বেশী গভীর হবে। মেকি ওস্তাদরাই বলে, আমার গান এত উঁচু দরের যে মূর্খ শ্রোতাগুলো তার

কদর বুঝল না, উঠে গেল। করিম ভাইয়ার গান শুনে সমঝদারদের মতোই অবুঝ শ্রোতারাও তন্ময় হয়ে বসে থাকত, উঠে যেতে তাদের মন চাইত না। আমি যদি দেখি আমার গান শ্রোতাদের ভালো লাগছে না, তখন নিজেকেই দোষ দেব, শ্রোতাদের নয়।

"নিজের দুঃখ ভুলতে আর অন্যের দুঃখ ভোলাতে সঙ্গীতের তুলনা নেই। এ আমার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আমাদের জীবনে সঙ্গীত একটা বিলাস বা চিত্ত-বিনোদনের (Pastime বা entertainment) উপায় মাত্র নয়, এর একটা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন আছে, যা গভীর দুঃখের দিনে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

"একজন বলছিলেন যে বেসুরে তারিফ করলেও তা শুনতে ভাল লাগে না, কিন্তু সুরে শালা বলে গালি দিলেও তা ভাল লাগে, সুরের এমনি মহিমা। মানুষকে ভালবেসে আল্লা তাকে সুর দিয়েছেন। এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ দান। শেষ রাতে যখন শুনি দূরের ঐ মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে সুরেলা আজান 'আল্লাহো আকবর, তখন ভাবি তার মতো মধুর, তার মতো পবিত্র ধ্বনি আর কি হতে পারে?"

এই আজানের 'পুকার' ছিল ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের গায়কী কণ্ঠস্বরে, যার আবেদন ছিল অতি গভীর ভাবে মর্মস্পর্শী, এবং তিনি তাঁর প্রিয় সাগরেদদের রিয়াজ (কণ্ঠস্বরের সাধনা) করবার এমন তরিকা জানতেন যাতে তাদের কণ্ঠে এই পুকার আসে।

ওস্তাদজির আরেকটি অসাধারণ গুণ বা বিশেষত্ব ছিল গানের বাণীকে গুরুত্ব আর মর্যাদা দেওয়া, গানের কথার অর্থ বা ভাব ভালভাবে বুঝে আর অনুভব করে সেই ভাবটুকু গায়নভঙ্গীর মাধ্যমে যথাসম্ভব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা। এই গুণকে অসাধারণ বললাম এই কারণে যে অনেক নামী গায়কের মধ্যে এই গুণটির অভাব আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। তাঁদের ধারণা গানের কথা শুধু সুরের বাহনমাত্র এবং এই বাহনগিরি করা ছাড়া তার নিজস্ব কোন মর্যাদা বা সার্থকতা নেই। ওস্তাদজি বলতেন, "তা যদি না

থাকবে, তাহলে কথা রচিত হয়েছে কেন? অর্থযুক্ত কথা আছে, এমন গান না গেয়ে তাহলে অর্থহীন শব্দযুক্ত তরানা (তেলেনা) গাইলেই তো হয়।"

শুধু তাই নয়, গাইবার সময়ে উচ্চারণ অস্পষ্ট বা বিকৃত না করে গানের প্রতিটি শব্দ নিখুঁত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা অত্যাবশ্যক, একথা তিনি বার বার শিষ্যদের শোনাতেন, বলতেন, "গান গাইবার সময়ে গানের বাণী এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবে যেন শ্রোতারা প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার বুঝতে পারেন, তোমার উচ্চারণ যেন বোবার কথা বলবার ব্যর্থ চেষ্টার মতো মনে না হয়।"

তাঁর এই উপদেশটি তিনি তাঁর নিজের গানে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তাঁর গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন গানের বাণী তাঁর মুখে কি মধুর আর স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতো এবং গানের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে তাঁর গানে তিনি কি মনোরম ভাবে ফুটিয়ে তুলতেন।

ঢাকায় তাঁর বিশিষ্টতম শিষ্য ছিলেন ঢাকার জনপ্রিয়তম গায়ক এবং সঙ্গীত শিক্ষক নিত্যগোপাল বর্মণ। এঁরই মাধ্যমে আমি ওস্তাদজির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর কাছে নাড়া বেঁধে শিষ্য হয়েছিলাম। নিত্যবাবুর পরেই নাম করতে হয় খগেশ চক্রবর্তীর, ওস্তাদজি তাঁকেও বিশেষ স্নেহ করতেন। খগেশ বাবু ছিলেন খ্যাতিমান অভিনেতা, পরে কলকাতা বেতারে অভিনেতারূপে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ওস্তাদজির পরম ভক্ত আরেকজন বিশিষ্ট শিষ্য আমার প্রিয় বন্ধু এবং সহপাঠী (ঢাকায় জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে, ১৯২৯—৩১) সুকুমার রায়। সুকুমার বাবু ঢাকা বেতারে এবং কলকাতা বেতারে ওস্তাদজির তালিমের কিছু কিছু খেয়াল এবং ঠুংরি গান গেয়েছেন, সঙ্গীত সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করে খ্যাতিলাভ করেছেন, এবং সঙ্গীত সম্পর্কিত তাঁর রচিত গ্রন্থ রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

ঢাকায় ওস্তাদজির সঙ্গীতের ধারা বজায় রাখবার জন্য রইলেন তার পুত্র ওস্তাদ হইয়াছিল খাঁ। ওস্তাদজির শিষ্যাদের মধ্যে প্রথমেই

মনে পড়ছে ঢাকার বিশিষ্টা গায়িকা লায়লা আজুমন্দ বানুর কথা।

তাঁর আদর্শ গায়ক ছিলেন বিখ্যাত 'কিরানা' ঘরানার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ওস্তাদ আবদুল করিম্ খাঁ সাহেব যাঁর প্রধান জিনিস ছিল মর্মস্পর্শী ভাবের প্রশান্তিময় গভীরতা। দরবারী দাপট বা কালোয়াতির কশরৎ নয়। রেকর্ডে করিম খাঁ সাহেবের গান শুনতে শুনতে তিনি বলতেন, "আহা করিম ভাইয়ার গলায় খুদা কি দরদ দিয়েছেন।"

ঢাকায় যখন ছিলাম, তখন এক সন্ধ্যায় পায়চারিরত ওস্তাদজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুড়িগঙ্গার তীরে। আমাকে বলেছিলেন বড় ভালো লাগে এই নদীর ধারে বেড়াতে।

সেটি ছিল ১৯৪০ সালের একটি সন্ধ্যা কিন্তু তার স্মৃতি আজও মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়লেই লোকান্তরিত ওস্তাদজির জন্য চিত্ত হাহাকার করে ওঠে, আর মনে প্রশ্ন জাগে: আমাদের সঙ্গীত জগতে ওস্তাদ আর সাগরেদ অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে মধুর গভীর সম্পর্ক পাশ্চাত্য সঙ্গীত জগতে তার তুলনা মেলে কি?

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাঁধানো পায়ে চলার পথ, 'বাকল্যাণ্ড বাঁধ,' নামে পরিচিত। তারই ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম ঢাকার 'নবাব-বাড়ি' (আহসান মঞ্জিল') পর্যন্ত। সেখান থেকে ফেরার পথে সদরঘাটের মুখোমুখি নদীর তীরে বাঁধানো বেদীর ওপর শায়িত পুরানো আমলের বড় মুখওয়ালা কামানটির কাছে আসতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে ওস্তাদজির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। পরম স্নেহে, আমাকে নদী তীরে দেখতে পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমার 'অজিত' নামটি ওস্তাদজির পাঠান উচ্চারণে অনেকটা 'ওয়াজেদ' এর মত শোনাত। তাঁর এই স্নেহমধুর উচ্চারণ আমার বড় ভালো লাগত।

গিয়েছিলাম পাটুয়াটুলি অঞ্চলে একটি কাজে। কাজ সেরে ফিরছিলাম গেণ্ডারিয়া অভিমুখে অর্থাৎ বাড়ির দিকে। শহরের ভেতর

দিয়ে সোজাপথে না ফিরে বুড়িগঙ্গা নদীর হাওয়া খাওয়ার লোভে ফিরছিলাম বাকল্যাণ্ড বাঁধের ওপর দিয়ে। কি ভাগ্য আমার! সোজাপথে ফিরলে সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার স্মৃতি থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হতাম।

বাড়ি ফিরবার জরুরী তাড়া ছিল না বটে, কিন্তু ওস্তাদজির সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলে বাড়িতেই চলে যেতাম, নদীব ধারে পায়চারি করতাম না। ওস্তাদজি ছিলেন কিছুক্ষণ বুড়িগঙ্গার তীরে পায়চারি করার মেজাজে, আমাকে তাঁর পায়চারির সঙ্গী করে নিলেন। অবশ্য তার আগে নিশ্চিত হ'য়ে নিলেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়।

ওস্তাদজি ছিলেন অত্যন্ত নদী প্রিয়। তিনি যে ঢাকা শহরেই বাকী সারা জীবনের জন্য বাসা বেঁধেছিলেন, তাতে বুড়িগঙ্গা নদীর অবদান ছিল অনেকখানি।

নদী বিষয়ক দু'টি গান খুব ভালবেসে গাইতেন ওস্তাদজি। বাগেশ্রী রাগে খেয়াল "গহরী গহরী নদিয়া" আর তিলং রাগে ঠুংরি "নদিয়া ধীরে বহো।" শেষোক্ত গানটি মরহুম ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গাওয়া "সজন তুম কাহে কো নেহ লগাও" ঠুংরি গানটির অনুরূপ। দুটি গানের মধ্যে এই দ্বিতীয় গানটিই (নদীয়া ধীরে বহো) গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের প্রিয়তর ছিল বলে মনে হয়। মনে হয় এই গানটি গাইবার সময়ে তাঁকে একই সঙ্গে প্রভাবাচ্ছন্ন করত বহমানা নদীর এবং কণ্ঠসঙ্গীতের অতুলনীয় যাদুকর আবদুল করিম খাঁ সাহেবের যুগল ধ্যানমূর্তি।

সেই সন্ধ্যায় হয়তো কোনো কারণে ওস্তাদজির মন কিছুটা বিষণ্ণ এবং উদাস ছিল। অথবা হয়তো ওস্তাদজির মনের স্বাভাবিক গঠনেই ছিল কবি বা দার্শনিক সুলভ ঔদাস্যের আমেজ। তাঁর সঙ্গে পায়চারি করতে করতে তাঁর মনের গহন থেকে উৎসারিত কথাগুলি শুনে অনুভব করলাম তাঁর অসামান্য ওস্তাদ সত্তার আড়ালে রয়েছে একটি গভীর অনুভূতিপ্রবণ দার্শনিক কবি সত্তা।

ওস্তাদজি বললেন, "এই নদীর ধারে বেড়াতে আমার বড় ভালো লাগে। সাধারণতঃ একা একাই বেড়াই। আজ তোমাকে পেয়ে গেলাম, এসো কিছুক্ষণ এক সাথে বেড়িয়ে বাতচিত করি। বহুৎ সাল বাদে যখন আমি আর থাকব না তখন আজকের এই সন্ধ্যার কথা তোমার মনে পড়বে।"

ওস্তাদজি আমাকে তাঁর সন্তানতুল্য জ্ঞানে স্নেহ করতেন, আমিও তাঁকে পিতৃতুল্য গুরু বলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবাসতাম। তাঁর মুখের এই উদাস উক্তি শুনে আমার মনটা কান্নায় ভরে উঠল, আমি বললাম, "ওস্তাদজি অমন কথা বলবেন না। আপনি থাকবেন না. এ কল্পনাও আমার কাছে অসহ্য। আপনার যে কোনো ভক্ত বা শিষ্যের পক্ষে অসহ্য।"

বাৎসল্যভরা করুণ মধুর হাসি হেসে ওস্তাদজি আমার অন্তরের বেদনা অন্তর দিয়ে অনুভব করে যেন আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, বললেনঃ "বেটা, ওঅখৎ আনে পর তো জানাহী হোগা। রুকেগা কৌন?" অর্থাৎ "সময় এলে তো চলে যেতেই হবে। যাওয়া বন্ধ করবে কে?"

বুঝলাম মরহুম ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেবের অন্তিম উক্তি স্মরণ করেই ওস্তাদজি আমাকে ও কথা বললেন। আবদুল করিম তাঁর অন্তিম মুহূর্ত আগত জেনে তাঁর সঙ্গী শিষ্যদের বলেছিলেন, "ওঅখ্ৎ আ গিয়া।" অর্থাৎ "সময় এসে গেছে আমার চলে যাবার।" এবং পণ্ডিচেরি অভিমুখী ট্রেন থেকে একটি ছোট ষ্টেশনে শিষ্যবর্গসহ নেমে প্ল্যাটফর্মের ওপর চাদর বিছিয়ে শেষ নমাজ পড়ে শেষ গানে বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাতে জানাতে বেহেস্তে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। কি আশ্চর্য কি মহান কি পবিত্র এই মৃত্যু! ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব আপনাকে হাজার কোটি সেলাম।

ওস্তাদজির দৃষ্টি পড়ল পুরনো আমলের সেই কামানটির দিকে, অতীতে যার মুখ থেকে নির্গত গোলা অনেক মানুষের জীবনে উর্দুতে 'এন্তেকাল' অর্থাৎ বাংলায় 'অন্তকাল' এনে দিয়েছে।

শুনেছিলাম এই কামানটিকে নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার করে সদরঘাটে ঐ জায়গায় বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কামানটি কার এবং নদীগর্ভে কি করে নিমজ্জিত হয়েছিল সে কথা সঠিক জানতে পারি নি।

ওস্তাদজি বললেন, "কামানটিকে বুড়ি গঙ্গা নদীর তীরে এভাবে স্থাপন করাটা ঠিক কাজ হয়নি। বুড়িগঙ্গা প্রশান্তভাবে বয়ে চলেছে মানুষের জীবনের প্রতীক রূপে আর এই কামানটা হচ্ছে মৃত্যুর প্রতীক। এই যন্ত্রটি দিয়ে মানুষ নির্মমভাবে মানুষের বুকে মৃত্যু হেনেছে।

খাঁ সাহেবের মুখে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এ ধরনের কথা শুনে আমি বিস্ময়ে শিহরিত হলাম। ওস্তাদজি পাঠান বংশোদ্ভূত। পাঠানরা সৈনিক রূপে অসাধারণ সুদক্ষ বলে জানতাম। ওস্তাদজি যদি সুর সাধক ওস্তাদ না হয়ে পাঠান সৈনিক হতেন, তাহলে তো মানুষ দ্বারা মানুষ সংহারের অস্ত্র এই একদা অগ্নিবর্ষী কামানটিকে তিনি এই দৃষ্টিতে দেখতেন না। কিন্তু তিনি বিধাতার বিধানে অন্যান্য অনেক পাঠানের মতো সৈনিক না হয়ে হয়েছেন সঙ্গীত-সাধক, তাই তাঁর যে হাত মারণাস্ত্র ব্যবহারে ব্যবহৃত হতে পারত সেই হাত তিনি ব্যবহার করছেন তানপুরার তারের সুর মিলিয়ে তাতে ঝংকার তুলতে।

স্মৃতিকথা লিখতে বসে আজ বড় জীবন্তভাবে মনে পড়ছে ওস্তাদজির সঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আমার সেই সান্ধ্য পায়চারির কথা। মনে পড়ছে তাঁর সেই সন্ধ্যায় উচ্চারিত মর্মস্পর্শী ভবিষ্যদ্‌বাণী :

"বহুৎ সাল বাদে যখন আমি থাকব না, তখন আজকের এই সন্ধ্যার কথা তোমার মনে পড়বে।"

গভীরভাবে সত্য হয়েছে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী।

সেই সন্ধ্যায় বুড়িগঙ্গার তীরে পায়চারি করতে করতে ওস্তাদজির মুখে যেসব কথা শুনেছিলাম তা থেকে কিছু কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করে রাখছি, সংক্ষেপে।

ওস্তাদজি বললেন, "খোদার মর্জির অর্থ তিনিই বোঝেন, তা বুঝবার চেষ্টা হয়তো আমার পক্ষে গুনাহ বা বে-আদবি হবে, তবু মনে

প্রশ্ন জাগে মানুষকে যিনি সংগীত দিয়েছেন তা শুনিয়ে মানুষকে মর্ত্যে স্বর্গের আভাস দিতে, তিনিই মানুষকে মানুষ সংহারের প্রবৃত্তিও দিয়েছেন কেন?"

ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে এত কল্যাণ এবং মাধুর্যের সঙ্গে সঙ্গে এত অকল্যাণ আর এত বীভৎসতা কেন, এই প্রশ্ন আমাকেও পীড়িত করেছে। আমরা সীমিত বুদ্ধি মানুষ আমাদের সাধ্য কি তাঁর লীলার মর্ম বুঝতে পারি? নিজেকে এই প্রশ্ন করেই স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছি, তাই পরে আমার 'পাগ্‌লাগারদের কবিতা' সিরিজের অন্তর্গত একটি কবিতায় সেই অসীম শক্তিমান রহস্যময়ের উদ্দেশ্যে লিখেছিলাম:

ধন্য তুমি হে, বুদ্ধির নাহি পার;
আলোকের সাথে দিয়েছ অন্ধকার।
দিয়েছ মিষ্টি, তেতো টক ঝাল,
দিয়েছ ক্ষুদ্র, দিয়েছ বিশাল,
মাটি ও আকাশ, মরুভূমি পারাবার।
তোমার ভুবনে কেহ সাধু, কেহ চোর
আছে কত গাঁজা-চণ্ডু-আফিং-খোর।
তোমারি তো দান সুধা ও গরল।
তোমার লীলা যে জটিল-সরল।
তোমার রাত্রি তুমিই করাও ভোর।
ম্যালেরিয়া দিয়ে কুইনিন দাও হাতে,
জনম-মরণ খেলা করে একই সাথে।
আরো যে কাণ্ড কতরকম বা,
লিখিতে গেলেই হইবে লম্বা,
সংক্ষেপে তাই এই বলি বার বার;
ধন্য তুমি হে, বুদ্ধির নাহি পার।"

অর্থাৎ হে অপার-বুদ্ধি ঈশ্বর, তোমার বুদ্ধির অনন্ত সমুদ্রের পার খুঁজে পাওয়া যায় না। তুমি তোমার জগতে যা কিছু দিয়েছো,

তার সঙ্গে তার উল্টোটাও দিয়েছ (হয়তো দেওয়াটাই উচিত বলে) তাই মানুষকে সংগীত দিয়ে সেই সঙ্গে সংহারও দিয়েছ।

এরপর ওস্তাদজি যা বললেন, তা থেকে অনুভব করলাম তিনি কত আন্তরিকভাবে খাঁটি মুসলিম। এতদিন তাঁকে ওস্তাদ বলে শ্রদ্ধা করেছি, এবার তাঁকে একজন খাঁটি মুসলিম রূপে জেনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল বহুগুণ।

ওস্তাদজি বললেন, "খোদা আমাদের জীবনে দুঃখ বিধান করেন বলে এককালে দুঃখ পেতাম কিন্তু এখন ভাবি জীবনে দুঃখের প্রয়োজন আছে বলেই তিনি দুঃখ দেন। ইসলাম ক্রমশঃ আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। ইস্‌লামের মানে হচ্ছে আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ যে আল্লাহ্ আকবর, অর্থাৎ পবিত্র, মহান, বিরাট।"

একটু ভেবে বললেন, "এই জিন্দেগিতে অনেক দুঃখ পেয়েছি। তবু—অথবা হয়তো সেই জন্যেই মনে হয় জীবনে দুঃখের স্বাদ যে পেলো না তার মতো দুঃখী কে ?

"গভীর দুঃখের সঙ্গে যে গভীর আনন্দ জড়ানো থাকতে পারে, তা তুমি বিশ্বাস করো ?"

এখন করি, কিন্তু সেই সুদূর অতীতে, ১৯৪০ সালে ওস্তাদজির এই কথাটি হেঁয়ালির মতো লেগেছিল। ভেবেছিলাম, দুঃখের সঙ্গে আনন্দ জড়ানো এ আবার কেমন কথা ? এবং সেই প্রশ্নই করেছিলাম ওস্তাদজিকে।

ওস্তাদজি বলেছিলেন, "শোনো তবে বলি। আমার মাকে আমি বড় ভাল বাসতাম ; অমন ভক্তি আর কাউকে করিনি। সেই মা যখন বেহেস্তে চলে গেলেন, সেরা সেরা হেকিমের দাওয়াই তাঁকে ধরে রাখতে পারল না, তখন কি ভয়ংকর দুঃখ আমি পেয়েছিলাম তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

সত্যিই আমি তা পারিনি, কারণ তখন আমার মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন, বিষাক্ত সাপ যাকে দংশন করেনি, সে কি করে বুঝবে সাপের বিষে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ?

কবির ভাষায় ঃ

'কি যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী বিষে
দংশেনি যারে ?'

কিন্তু এখন বুঝতে পারি। ১৯১৯ সালে ২রা জুন মা যখন পরলোক চলে গেলেন, তখন বিশ্বভুবন আমার কাছে অন্ধকার হয়ে উঠেছিল, দুঃখ আমার সারা অস্তিত্বকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, যে মনে হয়েছিল জীবন থেকে আনন্দ চিরতরে মুছে গেল। তখন মনে পড়েছিল আমার ওস্তাদজির মাতৃবিয়োগ-বেদনার দুঃসহ তীব্রতার কথা।

মাতৃবিয়োগের পর অনেকদিন অবিমিশ্র দুঃখের শিকার হয়েছিলেন মাতৃভক্ত পুত্র গুলমহম্মদ। একদিন ইচ্ছা হল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন দুঃখময় এই স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে দিতে। কিন্তু পর মুহূর্তে শিউরে উঠে ভাবলেন, "না না, মাকে হারিয়েছি এই দুঃখময় স্মৃতি আমি ভুলতে চাইনা, কারণ এই স্মৃতির দুঃখই তো আমাকে মনে করিয়ে দেয় মা যখন ছিলেন সেই তখনকার দিনগুলোর আনন্দ-ময় স্মৃতি। সেই স্মৃতি যে জীবনের অমূল্য সম্পদ, তাকে কি হারানো চলে !

"আব্বাজানের কাছে গানের তালিম পেয়েছিলাম ; তিনি আমার ওস্তাদ রূপে প্রণম্য।" বলেছিলেন ওস্তাদজি। "আম্মাজানের কাছে তালিম পাইনি, কিন্তু তিনি ছিলেন আমার প্রেরণা। তিনি স্বপ্ন দেখতেন গান শুনিয়ে আমি মানুষের হৃদয় জয় করব, ভালবাসা পাবো, আমার গান অনেক ব্যথিত হৃদয়ের ব্যথা ভুলিয়ে দেবে। আমি তাই গান শুনিয়ে চমক লাগিয়ে বাহবা আদায় করতে চাই না আমি চাই গান শুনিয়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে তাদের ভালোবাসা পেতে।"

আমি ওস্তাদজির মুখে এই কথা শুনে বলেছিলাম, "ওস্তাদজি

আমার মনে হয় আপনি খাঁটি শিল্পীর মনের কথাটি বলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার গান শোনার আগে পর্যন্ত ওস্তাদী গান সম্পর্কে আমার ভীতি আর বিতৃষ্ণা ছিল। আপনার গান শুনে আমার ধারণা বদলে গেল, তাই তো আপনার কাছে তালিম নেবার জন্যে নাড়া বেঁধেছি।"

ওস্তাদজি খুশী হয়ে বললেন, "বহুৎ আচ্ছা কিয়া। মগর রিয়াজ ভি বহুৎ করনা পড়েগা।" অর্থাৎ সঙ্গীতে সিদ্ধিলাভের কোনো সহজ পন্থা নেই। কঠোর পরিশ্রম করতেই হবে, যাকে বলে একাগ্র সাধনা। এ বিষয়ে একটি মজাদার গল্প শোনালেন ওস্তাদজি, তাঁর অফুরন্ত সাঙ্গীতিক গল্পের ভাণ্ডার থেকে তৎক্ষণাৎ বেছে নিয়ে। গল্পটির চুম্বক নিম্নরূপ :

পণ্ডিত মৌলভীরাম মিশ্র (ওরফে 'মিসিরজি') ছিলেন অসাধারণ তবলাবাদক। না-ধিন-ধিন্-না ঠেকায় তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর হাতের আঙুলগুলো চলত যেন মেশিনের মতো, আর বাঁয়াতবলা থেকে গুরু গুরু আওয়াজ তুলে যে যাদুময় পরিবেশ সৃষ্টি করত, তার তুলনা হয় না। শুধু যে সঙ্গৎ ভালো করতেন তাই নয়, একক তবলা-লহরা বাজিয়েও আসর মাত করতেন তিনি।

একবার তিনি তাঁর একক তবলা-বাদন শোনাবার সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন এক নয়া রঈস্ আদমির (অর্থাৎ অভিজাত ধনী ভদ্রলোকের) ভবনে। ইনি সেই অভিজাত ভদ্রলোক যিনি একজন ওস্তাদ গাইয়েকে 'নাকাড়া' রাগিণী গেয়ে শোনাবার ফরমায়েশ করেছিলেন।

এই নয়া ধনী ভদ্রলোকটি বললেন, "মিসিরজি আপনি শুনেছি না—ধিন্—ধিন্—না ঠেকা বাজাতে অদ্বিতীয়। দয়া করে সেই ঠেকা আমাদের বাজিয়ে শোনান। আমরা শুনে ধন্য হই।"

আশ্চর্য বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে সেই নয়া বড়লোক গৃহস্বামী বললেন, "ওস্তাদজি আমি আপনার মতো এই রকম বাজাতে চাই, তালিম দিয়ে তৈরী করে দেবেন আমাকে ?"

মিসিরজি বললেন, "জরুর দেবো যদি আপনি আমার মতো রিয়াজের মেহনত করতে পারেন।"

"কি রকম রিয়াজ (অভ্যাস) করতেন আপনি?" প্রশ্ন করলেন গৃহস্বামী।

মিসিরজি (মৌলভীরাম) বললেন "রোজ খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বাঁয়া-তবলা নিয়ে গিয়ে বসতাম এক মাঠের ধারে এক গাছতলায় নিরালায়। পাশে থাকত একটা গামছা আর একটা ছোট লোটা। বোল বাজাতে বাজাতে গায়ে ঘাম ছুটে যেতো, সেই ঘাম মুছতে মুছতে গামছাটা ঘামে ভিজে যেতো, সেই ভেজা গামছা নিংড়ে ঘাম ফেলতাম ঐ লোটার ভেতর। ঐভাবে গামছাটা নিংড়াতে নিংড়াতে যতক্ষণ না পুরো লোটাটা আমার ঘামে ভরে উঠত ততক্ষণ আমার মেহনতী রিয়াজ চলত। লোটা ভরতি না করে বাড়ি ফিরব না, এই পণ করে রিয়াজ শুরু করতাম। একটি দিনও এই পণ ভাঙিনি।"

গৃহস্বামী দু'চোখ বড় করে শুধালেন "এই রকম রিয়াজ কতদিন করেছিলেন মিসিরজি?" মিসিরজি স্মরণ করবার চেষ্টা করে বললেন, "পাঁচ সাত সাল তো জরুর হোগা।"

বলা বোধহয় বাহুল্য, এই কঠোর রিয়াজের কথা শুনেই উক্ত 'রঈস্ আদমি গৃহস্বামীর তবলা শিখবার শখ মিটে গিয়েছিল।

অসাধারণ তবলা-বাদক পণ্ডিত মৌলভীরাম মিশ্রের অসাধারণ তবলা সাধনা সম্পর্কে ঐরকম একটি কাহিনী প্রচলিত ছিল, তা সত্য। কিন্তু কাহিনীটি যে কিংবদন্তী মাত্র নয়, সত্য ঘটনা ভিত্তিক সে বিষয়ে আমার অন্ততঃ কোনো সন্দেহ নেই, অবশ্য ঘাম দিয়ে লোটা ভরার কাহিনীটা অতিরঞ্জন হলেও সেটা সত্যেরই অতিরঞ্জন। কারণ তবলায় অমন অসাধারণ সিদ্ধিলাভের জন্য মিসিরজিকে অত্যন্ত কঠোর রিয়াজ করে প্রচুর ঘাম নিশ্চয়ই ঝরাতে হয়েছিল, তাতে লোটা ভরুক আর নাই ভরুক।

সঙ্গীত (অথবা যে কোনো) শিল্পের সাধনায় সিদ্ধিলাভে কঠোর

পরিশ্রমের যে কোনো বিকল্প নেই, সেই সত্যটি বোঝাবার জন্য এই গল্পটি শোনাতে ভালবাসতেন ওস্তাদজি।

এই প্রসঙ্গে ভারতের যন্ত্রসঙ্গীত জগতের সর্ববাদিসম্মত সম্রাট স্বর্গতঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পুত্র, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সরোদ বাদক ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের কথা মনে পড়ছে। আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি রূপে ইণ্টারভিউ (সাক্ষাৎকার) করেছিলাম ১৯৬০ সালে। সেই সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ

"রিয়াজের ব্যাপারে বাবা ছিলেন এমন কঠোর, যে তাঁর সেই কঠোরতাকে অনেক সময় আমার নির্মমতা বলে মনে হতো। চিজ বাৎলে রিয়াজের কায়দা দেখিয়ে দিয়ে বাবা আমাকে একটা ঘরের ভেতর সরোদ হাতে বসিয়ে দিয়ে হুকুম দিতেন একটানা কমসে কম দশ ঘণ্টা রিয়াজ করে ঐ কাজ হাতে তুলতে। রিয়াজ থামালেই গোসা করতেন। একটু ভুল হলে অনেক চাঁটিও খেয়েছি বাবার হাতে। অনেক সময় দৈনিক বারো চৌদ্দ ঘণ্টাও রিয়াজ করেছি। রিয়াজ পুরো না করে খাওয়ার হুকুম ছিল না, এমনি কঠোর শাসন অনেক সইতে হয়েছে আমাকে। বাবাকে যেমন ভয় করতাম তেমনি ভক্তিও করতাম, তাই ভিতরে ভিতরে রাগ করলেও কখনো বিদ্রোহ করতাম না। এখন ভাবি বাবা ঐ রকম কঠোর হাতে রিয়াজ না করালে কি যা হয়েছি তা হতে পারতাম ?"

ঐ সালেই (১৯৬০) সাক্ষাৎকার করেছিলাম ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বিশ্ববিখ্যাত শিষ্য এবং জামাতা, সেতার যাদুকর পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গেও। তিনি বলেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী দাদা উদয়শংকর তাঁকে ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকেও নিজের মতো নৃত্যশিল্পী বানাবেন বলে। নৃত্য শিখিয়েও ছিলেন কিছু কিছু। কয়েকটি অনুষ্ঠানে বালক নৃত্যশিল্পী রবিশংকরের নৃত্য বিশেষভাবে প্রশংসিতও হয়েছিল। ছবিও তিনি ভাল আঁকতেন। তাঁর আঁকা কিছু ছবি পারী (প্যারিস) শহরের একটি প্রদর্শনীতে

স্থান পেয়ে তাঁকে উদীয়মান শিল্পীর খ্যাতি দিয়েছিল। সেতারেও তাঁর হাত মোটামুটি রকম ভালো ছিল।

সেই অপরিণত-মস্তিষ্ক কাঁচা বয়সে তাঁর মনে হয়েছিল, "আমার নৃত্য, চিত্রশিল্প, যন্ত্রসঙ্গীত, এই তিনটিই আসে। সুতরাং আমি তো ভীষণভাবে অসাধারণ। পাশাপাশি তিনটিরই সাধনা করে দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব ভারস্যাটাইল জিনিয়াস (বহুমুখী প্রতিভা) কাকে বলে।"

উদয়শংকরের নৃত্যদলের সঙ্গে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং সর্বত্র তাঁর সরোদ বাদন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল, ভারতে ফিরে এসে মাইহার রাজ্যের আমন্ত্রণে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব স্থায়ীভাবে মাইহার চলে গেলেন।

যন্ত্রসঙ্গীতের এত বড় ওস্তাদের সঙ্গে দাদার এত খাতির, এ এক দুর্লভ সুযোগ। রবিশংকরের প্রচণ্ড লোভ হলো এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। নাড়া বেঁধে শিষ্য হয়ে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে যন্ত্রসঙ্গীতে তালিম নেবেন। দাদা মারফত আরজি পেশ করলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিনের কাছে, ওস্তাদজি জানালেন তিনি রবিশংকরকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে রাজি আছেন, কিন্তু তার শর্ত হচ্ছে বহুমুখী প্রতিভা হওয়ার মতলব বিলকুল বর্জন করে (অর্থাৎ নাচ আর ছবি আঁকা একেবারে ছেড়ে দিয়ে) একটি সঙ্গীতযন্ত্র (রবিশংকরের ক্ষেত্রে সেতার) নিয়ে লেগে থাকতে হবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে ওস্তাদের বশংবদ থেকে তাঁর হুকুম আর নির্দেশ মাফিক কঠোর মেহনত করে রিয়াজ করতে হবে, রিয়াজে এতটুকু গাফিলতি করা চলবে না।

এ যেন দাসখত লিখে দিয়ে ওস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। অথচ ভীষণ একগুঁয়ে এই মহান ওস্তাদ। তাঁর শর্তে রাজি হয়ে জবান না দিলে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন না। ওস্তাদজি বলেছিলেন, "এই শর্তে রাজি হলে রবি যেন মাইহারে আমার কাছে চলে আসে। আমি তাকে ওস্তাদ বানিয়ে দেবার ভার নেব।"

বহুমুখী প্রতিভার ঝল্‌কানিতে দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পেরেছিলেন রবিশংকর, এত বড় ওস্তাদের শিষ্যত্ব লাভের লোভ সামলাতে না পেরে ওস্তাদের আরোপিত কঠোর শর্ত শিরোধার্য করে মাইহারে চলে গিয়ে শরণ নিয়েছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিনের। দীর্ঘ এবং কঠোর সাধনা করেছিলেন তাঁর কঠোর শাসনাধীনে। এই কঠোর সাধনার কালে রবিশংকরের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতিও হয়েছিল আলি আকবর খাঁরই মতো। ওস্তাদ আলাউদ্দিন নিজে অতি কঠোর সাধনার মধ্য দিয়েই সিদ্ধির শিখরে উঠেছিলেন বলেই কঠোর হস্তে শিষ্যদের কাছ থেকে রিয়াজের (অভ্যাস) মেহনত আদায় করে নিতেন। তিনি যা ছিলেন তাকেই ইংরাজী ভাষায় বলে 'হার্ড টাস্ক মাস্টার' (hard task-master)।

রবিশংকর বলেছিলেন, "তখন বাবাকে (ওস্তাদ আলাউদ্দিন) ভীষণ কঠোর মনে হত। কিন্তু এখন বুঝতে পারি ওঁর ঐ কঠোরতা আর নিখুঁত তালিমের দৌলতেই আমি বিখ্যাত আর জনপ্রিয় হতে পেরেছি। বাবার কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই।"

ওস্তাদ আলি আকবর আমাকে বলেছিলেন, "বাবা ছিলেন যাকে ইংরাজীতে বলে 'পারফেকশনিস্ট'। প্রতিটি টোকা, প্রতিটি মীড়ের কাজ প্রতিটি যে কোন কিছু নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত বাবার খুঁতখুতানি যেত না। খুঁত হয়তো অতি সামান্য, অনেক সতর্ক শ্রোতারও নজরে পড়বার মত নয়, তবু বাবার মনে হত এইটুকু খুঁতই বা থাকবে কেন? বাজাবার সময় সামান্য একটু খুঁত বা ত্রুটির জন্য সাবালক বয়সেও বাবার হাতের চাঁটি অনেক খেয়েছি।"

আমি বলেছিলাম, "সেই জন্যেই তো আপনার বাজনা এত নিখুঁত হয়েছে আলি সাহেব।"

সত্যিই আমার মনে হয় ওস্তাদ আলাউদ্দিন সরোদ জগতে বিরাট পুরুষ হলেও নিছক মাধুর্য সৃষ্টির দিক দিয়ে আলি আকবর তাঁর পিতাকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং স্বয়ং আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তার পরিচয় পেয়ে পরমানন্দে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

আমার সেই সান্ধ্য আসরে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি, যাঁর হয়েছিল এমন একজনের মুখে শুনেছি একবার একটি আসরে সরোদ বাজিয়েছিলেন আলি আকবর। আসরে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পিতৃদেব ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, বাদক রূপে নয়, শ্রোতা রূপে।

সেই আসরে আলি আকবরের সরোদ বাদন এমন অসাধারণ উচ্চস্তরে উঠেছিল যে বাজনার শেষে আবেগ সামলাতে না পেরে বৃদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দিন উঠে এসে পুত্র আলি আকবরকে বুকে জড়িয়ে ধরে পুত্রের কাছে পরাজিত হবার আনন্দে বালকের মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন ঃ

"আলি তুই আমার পোলা (পুত্র) না। তুই আমার বাপ।"

আজকের দুনিয়ার সেরা সরোদ শিল্পী আলি আকবরের জীবনে অনেক গৌরবময় মুহূর্ত এসেছে এবং আসবে, কিন্তু এমন আনন্দময় গৌরবময় পবিত্র মুহূর্ত আর আসবে কি?

কিন্তু কথা প্রসঙ্গে বুড়িগঙ্গার তীর ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এবার ফিরে যাই বুড়িগঙ্গার তীরে যেখানে ১৯৪০ এর সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় পায়চারি করছিলাম আমার সঙ্গীত গুরু ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের সঙ্গে।

বুড়িগঙ্গার তীরে ওস্তাদজির (গুল মহম্মদ খাঁ) সঙ্গে সান্ধ্যপায়চারি করতে করতে কথায় কথায় খেয়াল গায়ক হরেন সেন মহাশয়ের প্রসঙ্গ উঠল। হরেন বাবু মধ্যবয়সী প্রবাসী বাঙালী, উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় ('ক্লাসিক্যাল') কণ্ঠসঙ্গীতের সৌখীন সাধক। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো, নিশ্চিন্ত সঙ্গীত সাধনার পথে কোনো বাধা নেই, কারণ জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন নেই। স্বভাব অমায়িক, মুখে সর্বদা হাসিমাখানো সৌম্যভাব, গায়ের রং চোখজুড়ানো রকমের ফরসা, স্বাস্থ্য এবং চেহারা ভালো। গায়কের চেহারা যে রকম হলে শ্রোতার মন গান শুনবার আগেই খুশী হয়ে ওঠে, হরেনবাবুর চেহারা সেইরকম। চেহারা দেখেই মন বলে ওঠে, "ইনি নিশ্চয়ই ভালো গাইবেন।"

ঢাকায় হরেন বাবু মাত্র দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসে এক বন্ধুর বাড়ি উঠেছেন। কোনো এক বিরাট ঘরানার এক বিরাট ওস্তাদের কাছে খেয়াল গানের পাকা তালিম পেয়েছেন হরেন বাবু, ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীতামোদী মহলে "সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে।"

আমি যে স্কুলে পড়তাম, সেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের তখনো শিক্ষক সুকুমার দত্ত মহাশয় নিজে গাইতে পারতেন না, এবং একটি-মাত্র যে সঙ্গীত যন্ত্র তিনি নিপুণ হাতে পারতেন সেটি ছিল তাঁর 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' গ্রামোফোন যন্ত্র। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরম ভক্ত এবং অতি উৎসাহী রেকর্ড সংগ্রাহক। আমি শুধু স্কুলে তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলাম তাই নয়, আত্মীয়তা সূত্রেও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতের বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাঁর বাড়িতে বসে তাঁর হাতে বাজানো গ্রামোফোনে।

বড় একজন গুণী ঢাকায় পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এমন সুবর্ণ সুযোগ কি হাত ছাড়া করা যায়? সুকুমার বাবুর এবং আরো দু' তিনজন বিশিষ্ট সঙ্গীতরসিকের উদ্যোগে এক সান্ধ্য আসরে হরেন বাবুর একক খেয়াল গানের ব্যবস্থা হল। ঢাকার বিশিষ্ট শ্রোতারা সে আসরে তাঁর গান শুনলেন। অবশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে ছিলাম আমি একজন। ঢাকায় গায়ক বলে যাঁদের নাম ছিল, তাঁরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেব। সেদিন তাঁর তবিয়ৎ বিশেষ ভালো ছিল না, তা সত্ত্বেও বিশিষ্ট ঘরানার তালিম পাওয়া বাঙালী ভদ্রলোক গায়কের খেয়াল গান শুনবার কৌতূহলী আগ্রহে, এবং সেই সঙ্গে ঢাকার সঙ্গীতামোদী সবারও আগ্রহে—কারণ তখন ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ উপস্থিত না থাকলে ঢাকার যে কোনো উচ্চ সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য আসর শিবহীন যজ্ঞের সামিল বলে বিবেচিত হতো—ওস্তাদজি অসুস্থ শরীর নিয়েও আসরে সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে নিবিষ্ট মনে গান শুনেছিলেন, এবং

মাঝে মাঝে সুসংহত অভিব্যক্তির মাধ্যমে গায়ক হরেন বাবুকে বুঝতে দিয়েছিলেন গান তাঁর ভালো লাগছে।

আমি কিন্তু হরেনবাবুর গান শুনে তৃপ্ত হতে পারিনি। (মনোভাবটা যথাসম্ভব মোলায়েম করেই প্রকাশ করলাম)। ভদ্রলোকের গলার আওয়াজটি বা সুরের কাজ মন্দ লাগছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের রসাস্বাদনে বিপুলভাবে বাধা দিচ্ছিল তাঁর—আমার মতে—কয়েকটি প্রচণ্ড মুদ্রাদোষ। গানের সুর যেমন আছে, তেমনি বাণী বলেও তো একটা জিনিস আছে। ভদ্রলোকের নিখুঁত এবং ঝকঝকে স্বাভাবিক দাঁত—সেগুলো বাঁধানো ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি গানের বাণী এমনভাবে উচ্চারণ করছিলেন, যেন তাঁর একটিও দাঁত নেই, এবং সম্পূর্ণ দাঁত হীন চোয়াল দিয়ে তিনি বাণীগুলোকে চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং গানটির রচয়িতা তাঁর রচিত গানে কি বলতে চেয়েছেন, হরেন বাবুর গান শুনে তার সামান্য আভাস পাওয়াও অসম্ভব ছিল। বোবা মরিয়া হয়ে কথা বলবার চেষ্টা করলে তার মুখের কথা যেমন শুনতে লাগে, ভদ্রলোকের খেয়াল গানের উচ্চারণ অনেকটা সেই রকম শোনাচ্ছিল। তা'ছাড়া গানের এক একটি আবর্তের শেষে, দম নেবার স্বল্প অবকাশ শুরু হবার ঠিক আগে তিনি 'আউপ' জাতীয় এমন একটা শ্রুতিকটু আওয়াজ করে মুখ বন্ধ করছিলেন, যে আমার মনে হচ্ছিল এই সুদর্শন গায়কের এমন নয়নাভিরাম সুন্দর চেহারা এই আসরে একেবারে মাঠে মারা গেল।

ভদ্রলোকের গান যখন শেষ হয়ে গেল, তখন শেষ হয়ে গেল বলে আমার কিছুমাত্র দুঃখ বোধ হলো না, বরং ভদ্রলোক থামতে জানেন দেখে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম। গান শেষের পর গান সম্বন্ধে আলোচনায় এবং তিনি যাঁর কাছে তালিম পেয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁর গায়কীর ব্যাখ্যাবহুল প্রশংসায় হরেন বাবু যে সব কথা বললেন, সেগুলো শুনতে আমার তাঁর গানের চাইতে অনেক বেশী ভালো লাগল। লক্ষ্য করলাম কথা বলবার সময়ে তাঁর প্রতিটি শব্দ নিখুঁত

সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত, রীতিমতো শ্রুতিমধুর, এবং কোন বাক্যের শেষেই তিনি অদ্ভুত ভঙ্গীতে 'আউপ' জাতীয় শব্দ করে শ্রোতার কানকে পীড়িত করছেন না। তাঁর যত মুদ্রাদোষ সবই গান গাইবার বেলায়।

ওস্তাদজির সঙ্গে যে সন্ধ্যায় বুড়িগঙ্গার তীরে বেড়াচ্ছিলাম, সেটি ছিল হরেন বাবুর এই গানের আসরের দুদিন বাদে।

এর আগে ওস্তাদজিকে প্রশ্ন করতে কি জানি কেন ভরসা পাইনি। এখন যাদু প্রভাবময়ী বুড়িগঙ্গার তীরে স্নিগ্ধশান্ত মধুর পরিবেশে ওস্তাদজিকে শুধালাম, "ওস্তাদজি সেদিন খেয়াল গায়ক হরেন বাবুর গান আপনার কেমন লেগেছিল ?"

খাঁ সাহেব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মানুষ, আমার প্রশ্নের নেপথ্য তাৎপর্য বুঝে নিতে তাঁর দেরী হলো না। তিনি ঈষৎ হেসে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তোমার ভালো লাগেনি ?"

বললাম, "ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব, ওস্তাদজি ?"

ওস্তাদজি বললেন, "নির্ভয়ে বলো।"

আমি তখন খাঁ সাহেবকে অকপটে খুলে বললাম কি কি কারণে হরেন বাবু মানুষটিকে ভাল লেগেছে, কিন্তু তাঁর গান আমাকে খুশি করতে পারেনি।

ওস্তাদজি হাসতে হাসতে হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি আঁচ করতে পারলাম আমি হরেনবাবুর প্রতি যতখানি বিতৃষ্ণ, তিনি ততটা নন, তবু আমার বিতৃষ্ণাবোধের প্রতি তাঁর যে একেবারেই সহানুভূতি নেই তাও নয়।

তিনি তখন ধীরে ধীরে অতি সুন্দরভাবে গায়ক হরেনবাবুর প্রতি এবং শ্রোতা আমার প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই রকম ঃ

"উনি সেই সন্ধ্যায় যে দুটি রাগে খেয়াল গাইলেন—ইমন আর বসন্ত বাহার, একটা একক রাগ, অন্যটা দুই আলাদা রাগ মিশিয়ে একটি মিশ্ররাগ। দুটিরই রাগরূপ ফুটিয়ে তোলার চাল আমার খুব ভাল

লেগেছিল। হরেন বাবুকে চীজ বাতাতে ওঁর ওস্তাদ একটুও কৃপণতা করেননি, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। সুর লাগাবার কায়দাও ওঁর খুবই ভালো। উনি ভাল গাইয়েই হতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাকে সঙ্গীত শাস্ত্রে দুর্গায়ক লক্ষণ বলে, বড় ওস্তাদের তালিম থেকে পাওয়া ভাল ভাল জিনিসের সঙ্গে সেইরকম কতকগুলো মুদ্রাদোষও তিনি আয়ত্ত করেছেন।

"ওঁর ওস্তাদ মস্ত গুণী। অসাধারণ পণ্ডিতও বটেন। কিন্তু বয়সে তিনি আশি ছাড়িয়ে গেছেন, একটিও দাঁত নেই, দুটি গাল তুবড়ে গেছে। বার্ধক্যভারে জর্জরিত হবার আগে তাঁর উচ্চারণ যেমন ছিল, এখন স্বাভাবিক কারণেই তেমন নেই। এখন তাঁর উচ্চারণ বিকৃত হয়ে গেছে, গানের কলি শেষে 'আউপ' ধরনের যে বিকৃত আওয়াজ, সেটাও তিনি ইচ্ছে করে গানের অলংকরণ হিসেবে করেন না। ওটা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনা থেকেই হয়ে যায়। এসবই তাঁর বার্ধক্যজনিত বাধ্যতামূলক মুদ্রাদোষ। এগুলো অনুকরণীয় নয়, বর্জনীয়। কিন্তু বেচারা হরেনবাবু এই মুদ্রাদোষগুলোকে বর্জন না করে সযত্নে অনুকরণ আর অনুশীলন করে আয়ত্ত করেছেন, কারণ তিনি ভুল করে ভেবে নিয়েছেন এগুলোও তাঁর ওস্তাদের দেওয়া তালিমেরই অঙ্গ। কেউ হরেনবাবুকে তাঁর এই ভুল সম্বন্ধে সচেতন করে দেন নি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "তাঁর ওস্তাদ তো পারতেন তাঁর এই মুদ্রাদোষ শুধরে দিতে?"

ওস্তাদজি করুণ হেসে বললেন, "বার্ধক্যের ভার মানুষকে কি করে দেয় তা কি আমরা বুঝতে পারি, যারা এখনও বার্ধক্যের শিকার হইনি? হরেনবাবুকে তালিম দেবার জন্য তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধ ওস্তাদ যখন নিজে গাইতেন, তখন তাঁর সেই গাওয়া নিজের কানে শুনে তিনি তাঁর নিজের খুঁত বুঝতে পারতেন না। তাঁর সেই খুঁতগুলো সম্বন্ধেও কেউ তাঁকে সচেতন করে দেয়নি। কে হবে এমন হৃদয়হীন, যে বৃদ্ধকে এই নিষ্ঠুর সত্য বুঝিয়ে দেবে?"

ওস্তাদজির চিন্তার গভীরতায় আমি অভিভূত হলাম। মনে হল.

এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি তিনি আমাকে বুঝিয়ে দেবার আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। আমাদের নিজের ত্রুটি, নিজের মুদ্রাদোষ, অন্য কেউ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে আমরা বুঝতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে চাই না।

একটু থেমে ওস্তাদজি আবার বলতে লাগলেন, "বার্ধক্যগ্রস্ত গায়ককে বুঝিয়ে দিয়ে কি লাভ যে, জওয়ানিতে তিনি যেমন গাইতেন, এখন বার্ধক্যে যা গাইছেন তা তার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। খোদা যে অমৃত তাঁর কণ্ঠে দিয়েছিলেন তা ফেরত নিয়েছেন বা নিয়ে নিচ্ছেন। বুঝিয়ে দেওয়া বা মনে করিয়ে দেওয়া মানেই তো তাঁকে অকারণ দুঃখ দেওয়া।"

"অকারণ কেন?"

"কারণ তিনি তো এখন প্রাণপণ চেষ্টা করলেও বার্ধক্য জর্জর কণ্ঠে তাঁর যৌবনের কণ্ঠের যাদু ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। সুতরাং তিনি যা চিরতরে হারিয়েছেন, সে সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে না দিয়ে বরং সে সম্বন্ধে তাঁকে অচেতন থাকতে দেওয়াটাই তো মনুষ্যত্বের কাজ।"

ওস্তাদজির এই উক্তির যথার্থতাও আমি মনে মনে মেনে না নিয়ে পারলাম না।

তবু বললাম, "কিন্তু হরেনবাবুর তো এখনো বার্ধক্য উপস্থিত বা আসন্ন হয়নি। তাই আমি সবিনয়ে আপনাকে নিবেদন করছি গোস্তাকি হলে মাফ করবেন, আমার মনে হচ্ছে ওঁর ত্রুটিগুলো আপনি ওঁকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলে ভালো হতো। উনি হয়তো ত্রুটিগুলো শুধরে নিতে পারতেন।"

ওস্তাদজি বললেন, "ওর গুণগুলোর আমি তারিফ করেছি, ত্রুটি-গুলোর সম্বন্ধে ইচ্ছে করেই কোনো মন্তব্য করিনি। তার কারণ তিনি একজন বাঙালী গায়ক, গাইছেন বাংলা মুলুকে বাঙালী শ্রোতাদের বৈঠকে, যেখানে অনেক বাঙালী গায়ক আর সমঝদার আছেন। আমি ভেবে দেখলাম গাবৈয়ার দেশী ভাইরা যখন তাঁকে ত্রুটি বোঝাবার ধার

দিয়ে যাচ্ছেন না, তখন পরদেশী হয়ে আমার সেটা করতে যাওয়াটা বুদ্ধির কাজ হবে না, অনর্থক একটা ভুল বোঝাবুঝি হবে, ফায়দা কিছু হবে না।"

ওস্তাদজির এ কথাটাও আমার অযৌক্তিক মনে হলো না।

সেই হরেনবাবুর সঙ্গে আর আমার কখনো দেখা হয়নি, সেই আসরের পরদিনই তিনি প্রবাসে ফিরে গিয়েছিলেন। জানিনা পরে তিনি তাঁর মুদ্রাদোষগুলো শুধরে নিয়েছিলেন কিনা। কিন্তু একথা ঠিক যে তাঁকে যে আমার আজও মনে আছে তা তাঁর গানের ঐ ত্রুটি গুলোর জন্যেই, যেগুলো শোধরালে তিনি হয়তো ভালো গাইয়েই হতেন।

নদীর ধারে বেড়ালে সব শিল্পী মানুষের মনেই দার্শনিক ভাবের জোয়ার আসে কিনা জানি না, কিন্তু মনে হ'লো বুড়িগঙ্গার জলের উপর দিয়ে বয়ে আসা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ওস্তাদজি যেন দার্শনিক ভাবের জোয়ারে ভাসবার উপক্রম করছেন। অথবা হয়তো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যাঁরা সার্থক সাধক, দার্শনিক তত্ত্ব বা ভাব তাঁদের মনে স্বভাবতঃই এসে যায় সুর-সাধনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা অনুভূতি থেকে, দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নয়।

কথায় কথায় মশ্‌গুল অবস্থায় বুড়িগঙ্গার তীরে ওস্তাদজির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খেয়াল হলো এসেছি বুড়ি-গঙ্গা তীরবর্তী রেলিং-ঘেরা করোনেশন পার্কের সেই অংশের কাছাকাছি যে অংশে বিদায়-মঞ্চের ওপর বসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি মর্মস্পর্শী বিদায়-ভাষণে ঢাকা শহরের জনসাধারণের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলেন ১৯২৬ সালের এক গোধূলি বেলায়।

আমি সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে স্মৃতির চোখে করোনেশন পার্কের ঠিক ঐ জায়গায় বিদায়-মঞ্চে ভাষণদানরত রবীন্দ্রনাথকে দেখতে দেখতে মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানালাম। হঠাৎ এভাবে থেমে পড়ার কারণ জানতে চাইলেন ওস্তাদজি। বলা বোধহয় বাহুল্য রবীন্দ্র-নাথ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না, থাকবার কথাও নয়। তবু

রবীন্দ্রনাথ কি ছিলেন তার একটুখানি আভাস তাঁকে বোঝানো অসম্ভব হলো না। কারণ সঙ্গীতের মাধ্যমে হাফিজ এবং মির্জা গালিব কবিদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর কিছুটা পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিদায়-ভাষণের সারমর্মটি বললাম ওস্তাদজিকে। সেটি তাঁর মর্মস্পর্শ করল গভীরভাবে। তিনি বললেন, "বিদায় তো আমাদের প্রত্যেকেরই একদিন নিতে হবে, বিদায় নিতে হবে বলেই তো দুনিয়াটাকে এত ভালো লাগে। মৌত আছে বলেই তো জিন্দেগি এমন প্যারা।"

এই স্মৃতিচারণ লিখতে বসে মনে পড়ছে ওস্তাদজির এই উক্তির মূল ভাবটি নিয়েই পরবর্তী জীবনে একটি কবিতা লিখেছিলাম, যার শুরু এইভাবে ঃ

"ভুলে যাওয়া আছে, তাই
মনে থাকা এত ভালো লাগে।
ছেড়ে চলে যেতে হবে
এ পৃথিবী তাইতো সুন্দর।"

"গান গাইতে এত ভালো লাগে কেন জানো?" বলতে লাগলেন ওস্তাদজি। "যখনি গান গাই, সুর যত বেশী জমে ওঠে, ততই বেশী করে মনে হয় একদিন গলায় এ সুর থাকবে না, একদিন গান থেমে যাবে। তাই খোদার মেহেরবানির এই দান গলায় যতদিন থাকবে ততদিন একে পুরো মর্যাদা দেব, ততদিন গান গেয়ে যাবো। কখনো এর অবহেলা করব না।"

ওস্তাদজির উচ্চারিত এই তত্ত্বটিও জীবনের একটি গভীর সত্য। আমরা যা কিছু অথবা যাকেই ভালবাসি না কেন সেই ভালবাসার মূলে আছে তাকে হারাবার ভয়, সে যে চিরদিন আমার থাকবে না, অবচেতন মনে এই সচেতনতা। জীবনকে এত ভালবাসি, তার কারণ জীবনের চলচ্ছবির অন্তরালে মরণের আবহসঙ্গীত বেজে চলেছে অবিরাম।

এরপরই সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠের ওপর বার্ধক্যের প্রভাব সম্বন্ধে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ওস্তাদজি আমাকে একটি মর্মস্পর্শী

করুণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেই কাহিনীর নায়িকা ছিলেন এক কালের অসামান্য জনপ্রিয় বৃদ্ধা গায়িকা। পরবর্তী জীবনে আমি ওস্তাদজির মুখে শোনা কাহিনীটিকে ভিত্তি করেই একটি বাংলা কবিতা লিখেছিলাম। অনেক বাদ দিয়ে অল্প কিছু অংশ উদ্ধৃত করি। আসরে বৃদ্ধা গায়িকা মঞ্জরী বাঈ-র একখানা গান গাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর থেকে ঃ

আজ মঞ্জরী বাঈর দেহে মনে কণ্ঠে বার্ধক্য,
তান দিতে দমে কুলোয় না,
গলা ভেঙে যায় তারা সপ্তকের শুরুতেই।
ভুল হয়ে যায় আস্থায়ী অন্তরার বাণী।
গভীর ব্যথায় মলিন মঞ্জরী বাঈর মুখ।
আজ তাঁকে কেউ অনুরোধ করছে না আবার গাইতে।
তাচ্ছিল্যের এই অপমানে অভিমানে ছল ছল
মঞ্জরী বাঈর দু'নয়ন!
কিন্তু না, অপমানের ব্যথা নিয়ে বিদায় নিতে
আমি তোমায় দেব না, মঞ্জরী বাঈ।
কুর্ণিশ করে ডাকলাম, "বাঈ সাহেবা!"
করুণ মিনতির সুরে বললাম,
"শুনতে চাই আরেকখানি গান,
যদি মেহেরবানি করে শোনান।
তৃপ্তি হলো না একটিমাত্র গানে।"
আমার ওপর ক্ষেপে উঠল শ্রোতারা।
আমার এই অমার্জনীয় ন্যাকামির জন্যে
অশ্রাব্য গান মুখ বুজে শুনতে হবে
নিছক ভদ্রতার খাতিরে।
ছল ছলিয়ে উঠল মঞ্জরী বাঈর চোখ,
আমার খাঁটি দরদের ছোঁয়া কাঁদিয়েছে তাঁর মনকে।
এ আসরে আর সবাই বেদরদী,

আর কেউ শুনতে চায় না তাঁর গান—
আমারই জন্যে আবার তম্বুরা তুলে নিয়ে
গান ধরলেন মঞ্জরী বাঈ, অতি করুণ সুরের একখানা ঠুংরি।
আবার গাইতে বলে
আমি তাঁর মান বাঁচিয়েছি—এবার
আমার মান বাঁচানো তাঁর হাতে।
হৃদয়ের সব কৃতজ্ঞতা কান্না হয়ে ঝরে পড়ল মঞ্জরী বাঈর গানে।
সারা আসর নীরব, নিথর, মন্ত্রমুগ্ধ,
শ্রোতাদের সবার চোখে জল ছল ছলিয়ে উঠল।
ধীরে ধীরে শমে এসে সমাপ্ত হল গান,
অভিবাদন করলেন মঞ্জরী বাঈ।
কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতা।
তারপর চোখ মুছে বললেন ভূতপূর্ব বিরক্ত শেঠজি ঃ
"অ্যায়সা গানা কভী নহী সুনা।"
ধ্বনিত হল বহু ব্যাকুল কণ্ঠের সমবেত মিনতি ঃ
"আরেকখানা গান মেহেরবানি করুন, বাঈ সাহেবা"।

কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম 'মঞ্জরী বাঈ'। অন্তর্নিহিত করুণ সত্যটির জন্যই কবিতাটি প্রকাশিত হয়ে অনেকের মর্মস্পর্শ করেছিল, ইংরেজী এবং হিন্দীতে অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে আমার একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থের (এক নদী, বহু তরঙ্গ) অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল।

মূল বাংলায় এবং অনুবাদে কবিতাটি যাদের ভালো লেগেছিল তারা জানেন না কবিতাটি অনেক বছর পরে লিখলেও এটি রচনার মূল প্রেরণা পেয়েছিলাম ১৯৪০ সালের এক সন্ধ্যায় ঢাকায় বুড়িগঙ্গার তীরে বেড়াতে বেড়াতে আমার পরম শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের মুখ নিঃসৃত একটি সত্য কাহিনী থেকে।

১৯৩৬ সালে ওস্তাদজিকে (গুল মহম্মদ খাঁ সাহেব) প্রণাম করে

ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলাম প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রূপে ইংরাজী সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য। ওস্তাদজিকে বলেছিলাম, "আবার ঢাকায় আসব।"

পরীক্ষা দিয়েছিলাম। শুনেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) বিভাগের ক্লাস না করলে এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে না পারলে এম, এ, পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায় না। এই ঘনিষ্ঠ হওয়ার চালু নাম ছিল 'নাইন্‌থ্‌ পেপার' অর্থাৎ 'নবম পত্র এম. এ. পরীক্ষায় ছিল মোট আটটি 'পেপার' বা পত্র, আটদিনে আটটি পত্রের জবাব লিখে পরীক্ষা দিতে হতো, প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল চার ঘণ্টা, ছাত্র মহলে এই অলিখিত আইনটি মুখে মুখে প্রচারিত ছিল যে এই আটটি পত্রের জন্য প্রস্তুতি যতোই ভালো হোক না কেন, অদৃশ্য 'নবম পত্র'টির অর্থাৎ অধ্যাপক তথা পরীক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ভালোবকম চর্চা না করলে উত্তীর্ণদের তালিকায় উঁচুদিকে স্থান লাভ করা অসম্ভব।

যাই হোক, নবম পত্রটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে (অথবা থাকা সত্ত্বেও) আমার স্থান ছিল উত্তীর্ণদের মধ্যে নবম। এতে আশাতীত আনন্দের এবং স্বস্তির স্বাদ পেয়েছিলাম। কারণ পরীক্ষার আটটি পত্রের আটটি উত্তর-খাতায় যে সব উত্তর লিখেছিলাম, তাতে বিদেশী পণ্ডিত সমালোচকদের মতামতের চাইতে আমি আমার নিজের মতামতকেই অনেকবেশী প্রাধান্য দিয়েছিলাম। দিতে বাধ্য হয়েছিলাম বললেই বোধ হয় বেশী ঠিক হয়। কারণ সাহিত্য অধ্যয়ন এবং তার রস আস্বাদনের ব্যাপারে আমি পরের মুখে ঝাল খাওয়ার চাইতে নিজের মুখে ঝাল খেতেই বেশী ভালবাসতাম। যখন শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের) পরীক্ষা পাসের ব্যাপারে এ ধরনের গোঁয়ার্তুমি আত্মহত্যারই একটি প্রকৃষ্ট পন্থা, তখন ধরেই নিয়ে ছিলাম এ পরীক্ষায় ডাহা ফেল করব। ডাহা ফেল যে আশা করে, নবম স্থান লাভের খবরে খুশী হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি তাই খুশী হয়েছিলাম।

ঢাকায় ওস্তাদজির কাছে আমার তালিমের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল এম. এ পরীক্ষায় বসবার আগে, দ্বিতীয় (এবং শেষ) পর্ব শুরু হয়েছিল এম. এ পাস করবার কিছুকাল পরে, যখন ঢাকায় পৈত্রিক ভবনে ফিরে গিয়েছিলাম। আমি তাঁর কাছে ফিরে আসায়, বিশেষ করে আগেকার চাইতে বেশী বিদ্বান হয়ে ফিরে আসায়, ওস্তাদজি খুবই খুশী হয়েছিলেন। আশা করেছিলেন আরো বেশ কিছুদিন তালিম নিয়ে ভালো তৈরী হবো, কিন্তু ভাগ্য বিধাতার বিধানে ১৯৪০ সালে ওস্তাদজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে (তাঁর সঙ্গে বুড়িগঙ্গার তীরে সেই বিস্মরণীয় সান্ধ্য ভ্রমণের অল্প কিছুদিন বাদেই) ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসার পর আমার আর ঢাকা যাওয়া হয়নি, সুতরাং ওস্তাদজির সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। ঢাকা থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসার অনেক বছর বাদে তাঁর গান সর্বশেষ শুনেছিলাম কলকাতায় বসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একটি প্রোগ্রামে—পুরিয়া রাগে একটি খেয়াল। অতি প্রসিদ্ধ, অতি পুরাতন কিন্তু চিরনতুন আশ্চর্য ত্রিতাল ছন্দের গানটি। আমার কলকাতার ঘরে বেতার গ্রাহক যন্ত্রের পাশে বসে বসে এ গানের মাধ্যমে আমার অতিপ্রিয়, অতি শ্রদ্ধেয় ওস্তাদজির সান্নিধ্য অনুভব করছিলাম নিবিষ্ট মনে দু'চোখ বুজে। একসঙ্গে আনন্দের আর বেদনার অনুভূতি আমার দুটি চোখে অশ্রু এনে দিয়েছিল। করুণ রসে ভরা গম্ভীর এ গান ঢাকায় থাকতে ওস্তাদজির কণ্ঠে একাধিকবার শুনে প্রতিবারই মুগ্ধ হয়েছিলাম। বেতারে দূর থেকে তাঁর সেই গান আবার শুনলাম তাঁর বৃদ্ধ বয়সে, কিন্তু তাতে ছিল না বিন্দুমাত্র বৃদ্ধ সুলভ ত্রুটি বা দুর্বলতা, বরং মনে হলো বার্ধক্য যেন তাঁর গানকে উচ্চতর স্তরে তুলে দিয়েছে, তাঁর মহৎ সঙ্গীতকে করে তুলেছে মহত্তর।

আমার শোনা ওস্তাদজির সেই শেষ গানের কথা লিখতে লিখতে মনে পড়ছে আমি প্রথমে যখন আমার অগ্রজোপম গায়ক নিত্য গোপাল বর্মণ মহাশয়ের সঙ্গে খাঁ সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের তালিম নিতে, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল

কালোয়াতী গানকে ক্যারিকেচারের 'খোঁচা মেরে ব্যঙ্গ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করা', নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখা নয়। অনেকটা কৌতূহল মেটানো বা তামাশার মনোভাব নিয়েই আমি ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম। আসলে তখন পর্যন্ত 'ক্লাসিক্যাল' গান বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমার মোটেই ভালো লাগত না। উদ্ভট বলেই মনে হতো।'

কিন্তু ওস্তাদজির তালিমের যাতুময় প্রভাবে আমি একেবারে বদলে গেলাম। হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলাম। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে নেশা ধরিয়ে দিলেন, সেই নেশায় আজও মেতে আছি, চিরদিন মেতে থাকব। সুরের দীক্ষা দিয়ে তিনি আমার হাতে যেন স্বর্গের চাবিটি তুলে দিয়ে গেছেন, তাই তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কবি গুরুর ভাষায় বলি, আমার জীবন তিনি সুধায় ভরে দিয়ে গেছেন।

আমার সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ ছাড়া আর একমাত্র যে, ওস্তাদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার সুযোগ হয়েছিল, তিনি ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব। এ কথা ঠিক যে, ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের তালিমের যাতুতে আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মশগুল না হলে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ তো দূরের কথা, সম্ভবতঃ আলাপের আগ্রহই হতো না।

তাঁর নামের আগে 'বড়ে' (অর্থাৎ 'বড়') বিশেষণটি কেন? কে বা কারা যেন একবার কলকাতায় (কোথা থেকে জানি না) একজন খেয়াল গায়কের আমদানি করেছিলেন, সেই গায়কটির নামও ছিল গুলাম আলী।

আমাদের কুস্তি জগতে যেমন দু'জন গামা ছিলেন বড় গামা আর ছোট গামা, তেমনি প্রথমে কলকাতার সঙ্গীতের আসরে মনে হয়েছিল

দ্বিতীয় গুলাম আলীর আবির্ভাব ঘটল। প্রথম এবং বয়সে প্রবীণতর গুলাম আলী সম্ভবতঃ নতুন আবির্ভাব থেকে নিজেকে পৃথক করবার জন্যই নিজের নামের আগে 'বড়ে' বিশেষণটি বসাবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কলকাতায় দু' তিনটি আসরে গান (?) শুনিয়েই ছোট গুলাম আলী বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন এবং কলকাতা থেকে সরে পড়েছিলেন। তারপর আর কলকাতায় তাঁকে কখনো দেখা যায়নি, তাঁর নামও শোনা যায়নি।

ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব ছিলেন আমার চাইতে দশ বছরের বড়, কারণ তিনি জন্মেছিলেন ১৯০২ সালে।

আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ১৯৫৫ সালে কলকাতার চেৎলা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত মুরারি মিশ্র স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনে। এটি প্রতি বছর চেৎলা বয়েজ হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হতো। চেৎলার বাসিন্দা বিশিষ্ট প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ মোহিনীমোহন মিশ্রের পুত্র স্বর্গতঃ তরুণ উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী মুরারিমোহন মিশ্রের স্মৃতির সম্মানে। মুরারি-মোহনের অকাল মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ২৫ বছর বয়সে, এই বয়সেই সে খেয়াল, ঠুংরি এবং টপ্পা গানে এমন অসামান্য গায়ক হয়ে উঠেছিল যে সবাই আশা করেছিলেন বেঁচে থাকলে সে সারা ভারতের সঙ্গীত জগতে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করবে। সারা ভারতের সেরা কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পীরা মুরারি মিশ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সস্নেহ সম্মান দেখিয়ে নামমাত্র দক্ষিণা নিয়ে এই সম্মেলনে গান বাজনা শুনিয়ে যেতেন। নিঃসন্দেহে এই সম্মেলনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী। তিনি প্রায় প্রতি বছরই এই সম্মেলনে এসে গান শুনিয়ে যেতেন। একজন অকাল প্রয়াত তরুণ শিল্পীর করুণ স্মৃতি বিজড়িত বলে এই সম্মেলনের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ছিল। তাঁর এই উদার মহত্ত্ব ভুলবার নয়।

আমি ছিলাম এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষের বিশেষ আমন্ত্রণে সম্মেলনের প্রচার বিভাগের সঙ্গে জড়িত। আমার কাজ ছিল শ্রোতা-সমালোচক রূপে সম্মেলনের প্রতিটি বৈঠকে-গান বাজনা

শুনে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করা, যার কারবন কপিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গীত-সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ পত্রিকার জন্য প্রতিবেদন লিখবেন।

বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব তাঁর গাইবার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই চলে এসে শিল্পীদের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘরে তাঁর দল এবং সঙ্গীত যন্ত্রাদিসহ বসে বিশ্রাম করতেন। আমি সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত করে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ ভালোভাবে মুখ চেনা, ভবিষ্যৎ অন্তরঙ্গতার সূচনা, ভূমিকা বা উপক্রমণিকা।

বলা বোধহয় বাহুল্য, কিছুক্ষণ বাদেই খাঁ সাহেবের গাইবার পালা আসবে, তিনি স্টেজে চলে যাবেন, এমন সীমিত সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কোন বিষয়ে 'আলোচনা' করার সুযোগ ছিল না, খাঁ সাহেব আজ কি রাগ গাইবেন বা আজ তবিয়ৎ কেমন আছে, এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা ছাড়া। তাছাড়া সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যেও অনেকে এই সময়ে সঙ্গীত জগতের এই আশ্চর্য মিষ্টি মানুষটির সান্নিধ্যের লোভ সামলাতে পারতেন না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কুমারী নির্মলা মিশ্র: যাঁর স্মৃতির সম্মানে চেৎলা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই 'মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন', সেই মুরারিমোহন মিশ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী। তখনই নির্মলা ছিলেন সুগায়িকা, তার অনেক বছর বাদে এখন তিনি গ্রামাফোন রেকর্ড এবং বেতারের মাধ্যমে সুপরিচিতা। এই সম্মেলনে তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সবরকম ঘোষণার কাজ খুব সুন্দরভাবে এবং উৎসাহের সঙ্গে করতেন।

পর পর কয়েক বছর চেৎলার মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর অনবদ্য খেয়াল এবং ঠুংরি গান শোনার এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ আমার হয়েছিল। এই সঙ্গীত সম্মেলনের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কটির কথা, এবং আমি ঢাকায় অবস্থানকালে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে বেশ কিছুকাল

উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম পেয়েছিলাম, সেই কথা জানার ফলে আমার প্রতি ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেবের মনে বোধহয় কিছুটা স্নেহের ভাব জন্মেছিল, তাই আমার কথা বেশ মন দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন এবং আমার সমস্ত প্রশ্নকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই তাদের জবাব দিতেন, তারি ফলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক মূল্যবান কথা শুনেছি, যে জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী বড় ওস্তাদ হলেও সাধারণ শ্রোতাদের প্রতি উন্নাসিক অবহেলা বা অবজ্ঞার ভাব তাঁর মনে ছিল না। তার একটি কারণ (তিনি এই মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনেই আমাকে বলেছিলেন) সাধারণ শ্রোতারাই সারা ভারতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক শ্রোতাদের মধ্যে বৃহৎভাবে সংখ্যাগুরু।

"পাবলিক (সাধারণ শ্রোতাদের বোঝাতে এই ইংরাজী শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন খাঁ সাহেব) আমার রোটিদেনেওয়ালা 'দেওতা' (দেবতা)। এই দেওতাকে তুষ্ট রাখতে না পারলে তো আমার রোটি বন্ধ হয়ে যাবে, ভুখা মরতে হবে আমাকে। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-মধুর ভঙ্গীতেই আমাকে বলেছিলেন বড়ে গুলাম আলী।

কথাটি বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত হলেও অন্ততঃ কিছুটা সত্যভিত্তিক। অতীতে মহারাজা, রাজা নবাব প্রমুখ অভিজাত সঙ্গীতামোদী পৃষ্ঠপোষকদের আর্থিক আনুকূল্যে সঙ্গীত গুণীরা নিশ্চিন্ত মনে একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের সাধনা করতেন। এবং এই পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ অসামান্য গুণীদের পৃষ্ঠপোষণ করতে পারার সৌভাগ্যে গর্ববোধ করতেন এবং গুণীদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন।

সেই অভিজাত পৃষ্ঠপোষকতার যুগ বিগত। এখন আমরা বাস করছি গণতন্ত্রের যুগে। এখন সঙ্গীত-গুণীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত রাখতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা অর্জন করতে হবে এই জন-নারায়ণকে তুষ্ট করে।

শুনে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করা, যার কারবন কপিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গীত-সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ পত্রিকার জন্য প্রতিবেদন লিখবেন।

বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব তাঁর গাইবার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই চলে এসে শিল্পীদের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘরে তাঁর দল এবং সঙ্গীত যন্ত্রাদিসহ বসে বিশ্রাম করতেন। আমি সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত করে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ ভালোভাবে মুখ চেনা, ভবিষ্যৎ অন্তরঙ্গতার সূচনা, ভূমিকা বা উপক্রমণিকা।

বলা বোধহয় বাহুল্য, কিছুক্ষণ বাদেই খাঁ সাহেবের গাইবার পালা আসবে, তিনি স্টেজে চলে যাবেন, এমন সীমিত সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কোন বিষয়ে 'আলোচনা' করার সুযোগ ছিল না, খাঁ সাহেব আজ কি রাগ গাইবেন বা আজ তবিয়ৎ কেমন আছে, এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা ছাড়া। তাছাড়া সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যেও অনেকে এই সময়ে সঙ্গীত জগতের এই আশ্চর্য মিষ্টি মানুষটির সান্নিধ্যের লোভ সামলাতে পারতেন না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কুমারী নির্মলা মিশ্র; যাঁর স্মৃতির সম্মানে চেৎলা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই 'মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন', সেই মুরারিমোহন মিশ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী। তখনই নির্মলা ছিলেন সুগায়িকা, তার অনেক বছর বাদে এখন তিনি গ্রামাফোন রেকর্ড এবং বেতারের মাধ্যমে সুপরিচিতা। এই সম্মেলনে তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সবরকম ঘোষণার কাজ খুব সুন্দরভাবে এবং উৎসাহের সঙ্গে করতেন।

পর পর কয়েক বছর চেৎলার মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর অনবদ্য খেয়াল এবং ঠুংরি গান শোনার এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ আমার হয়েছিল। এই সঙ্গীত সম্মেলনের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কটির কথা, এবং আমি ঢাকায় অবস্থানকালে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে বেশ কিছুকাল

উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম পেয়েছিলাম, সেই কথা জানার ফলে আমার প্রতি ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেবের মনে বোধহয় কিছুটা স্নেহের ভাব জন্মেছিল, তাই আমার কথা বেশ মন দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন এবং আমার সমস্ত প্রশ্নকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই তাদের জবাব দিতেন, তারি ফলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক মূল্যবান কথা শুনেছি, যে জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী বড় ওস্তাদ হলেও সাধারণ শ্রোতাদের প্রতি উন্নাসিক অবহেলা বা অবজ্ঞার ভাব তাঁর মনে ছিল না। তার একটি কারণ (তিনি এই মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনেই আমাকে বলেছিলেন) সাধারণ শ্রোতারাই সারা ভারতে তাঁর পৃষ্ঠ-পোষক শ্রোতাদের মধ্যে বৃহৎভাবে সংখ্যাগুরু।

"পাবলিক (সাধারণ শ্রোতাদের বোঝাতে এই ইংরাজী শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন খাঁ সাহেব) আমার রোটিদেনেওয়ালা 'দেওতা' (দেবতা)। এই দেওতাকে তুষ্ট রাখতে না পারলে তো আমার রোটি বন্ধ হয়ে যাবে, ভুখা মরতে হবে আমাকে। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-মধুর ভঙ্গীতেই আমাকে বলেছিলেন বড়ে গুলাম আলী।

কথাটি বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত হলেও অন্ততঃ কিছুটা সত্য-ভিত্তিক। অতীতে মহারাজা, রাজা নবাব প্রমুখ অভিজাত সঙ্গীতা-মোদী পৃষ্ঠপোষকদের আর্থিক আনুকূল্যে সঙ্গীত গুণীরা নিশ্চিন্ত মনে একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতের সাধনা করতেন। এবং এই পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ অসামান্য গুণীদের পৃষ্ঠপোষণ করতে পারার সৌভাগ্যে গর্ববোধ করতেন এবং গুণীদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন।

সেই অভিজাত পৃষ্ঠপোষকতার যুগ বিগত। এখন আমরা বাস করছি গণতন্ত্রের যুগে। এখন সঙ্গীত-গুণীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত রাখতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা অর্জন করতে হবে এই জন-নারায়ণকে তুষ্ট করে।

বড়ে গুলাম আলীর একটি ঠুংরি গান অসামান্য জনপ্রিয়ঃ "ক্যা করুঁ সজনি, আয়ে না বালম।" অর্থাৎ "হায় সজনি, আমার প্রিয়তম আসছে না। আমি এখন কি করবো"। যে কোন সম্মেলনে তিনি যে খেয়াল গানই শোনান না কেন শ্রোতাদের সমবেত সোচ্চার আগ্রহের দাবীতে "আয়ে না বালম।" তাঁকে গাইতেই হতো।

এক বছর মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলনের বিশ্রাম ঘরে যখন তাঁর বাঁয়া-তবলা-তানপুরা সুরে বাঁধা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে, যেন একটু পরেই স্টেজে গিয়ে গান শুরু করবার আগে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চূড়ান্তভাবে সুর নির্ভুল করে মিলিয়ে নিতে পারেন শ্রোতাদের বিরক্ত না করে, তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং সসংকোচে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীকে নিবেদন করেছিলাম, "খাঁ সাহেব, আপনার "আয়ে না বালম" ঠুংরি গানটি অনবদ্য। কিন্তু এই গানটি আপনি বিভিন্ন সম্মেলনে বহুবার গেয়েছেন। তাছাড়া গ্রামাফোন রেকর্ডেও আপনার এই গানটি আছে, যা থেকে আমরা শুনতে পারি। তাই, আমার বিনীত প্রার্থনা, আজ আপনি ঐ গানটির বদলে বরং একটি নতুন খেয়াল বা নতুন ঠুংরি শোনান যা আমরা আগে শুনি নি।"

সাধারণতঃ সঙ্গীত সম্মেলনে (যেখানে থাকতো নানারকম বহু শ্রোতার বিচিত্র মিশ্রণ, বিশিষ্ট ঘরোয়া বৈঠকের মতো সীমিত-সংখ্যা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের বোদ্ধা সমঝদার শ্রোতামণ্ডলী নয়।) বড়ে গুলাম আলী হাত ঘড়ি দেখে সময়ের হিসাব রেখে নির্দিষ্ট সময় গান গাইতেন—বিশেষ করে যখন তারপর প্রোগ্রামে অন্য কোন শিল্পীর নাম থাকতো। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কখনো কখনো ঘটতো—নিয়মিতভাবে নয়—যখন তিনিই থাকতেন প্রোগ্রামের সর্বশেষ শিল্পী, অর্থাৎ তাঁর গান কখন শেষ হবে সে জন্য তাঁর পরবর্তী শিল্পীকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হতো না।

প্রত্যেক সম্মেলনে তিনি সাধারণতঃ প্রথমে একটি খেয়াল এবং তারপর একটি ঠুংরি গেয়ে তাঁর পরিবেশন শেষ করতেন। খাঁটি

শিল্পীর মতো ছিল তাঁর পরিমিতিবোধ অনেক গায়কের, অনেক ওস্তাদেরও যা থাকে না। তাই অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যখন একজন নামজাদা গায়কের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, "শরৎবাবু চলুন ওঁর গান শুনে আসি। উনি বড় ভাল গান" তখন শরৎবাবু প্রশ্ন করেছিলেন "ভাল গান তা-তো বুঝলাম। কিন্তু থামতে জানেন তো?"

এই থামতে জানা অর্থাৎ পরিমিতিবোধ, সঙ্গীত শিল্পীর একটি গুণ এবং এর অভাব একটি দোষ। গুণটি ছিল ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর, দোষটি ছিল না।

কেউ যদি ভাবেন হাত-ঘড়িতে সময় দেখে সময়ের হিসেব করে গান গাওয়াটা তাঁর সংকীর্ণ ব্যবসা-বুদ্ধির লক্ষণ, তাহলে তিনি ভুল বুঝবেন। "দক্ষিণা যা পাবার তা যদি আধ ঘণ্টা গাইলেই পাওয়া যায়, তাহলে তার বেশী এক মিনিটই বা গাইব কেন?" এরকম মনোভাব তাঁর ছিল না। কারণ জন-নারায়ণকে গান শোনাতে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, ঠিক যেমনটি আমার ওস্তাদজির মুখেও শুনেছিলাম, আকণ্ঠ ভুরিভোজনে পেট বোঝাই করার চাইতে বেশী তৃপ্তি হয় ঠিক এমন জায়গায় খাওয়া শেষ করলে, যখন "আর নয়" ভাবের বদলে মনের ভাবটি হয় "আরেকটু হলে মন্দ হতো না।" তৃপ্তির মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তা পরিণত হয় অতৃপ্তিতে, সুতরাং সেই মাত্রা ছাড়াবার ঠিক আগেই পরিবেশন সমাপ্ত করার আর্টটি জানতেন ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী। এর মূলে—আবার বলছি—ছিল তাঁর উঁচুদরের শিল্পীসুলভ সূক্ষ্ম গভীর রসবোধ, সংকীর্ণ ব্যবসা-বুদ্ধি নয়।

কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে এসেছি। যে কথা বলছিলাম সেখানে ফিরে যাই—মুরারি মিশ্র স্মৃতি সম্মেলনে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর ষ্টেজে গাইতে যাবার পূর্বক্ষণে। তিনি আমার অনুরোধ শুনে বললেন, "আচ্ছা আজ একটি নতুন গান শোনাবো। কিন্তু হলের শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া আপনি লক্ষ্য করবেন।"

সে রাতে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর পরবর্তী শিল্পী ছিলেন

সেতার-যাদুকর ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। বিলায়েতের সেতার বাদনও অনবদ্য হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হতে রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা থাক।

খাঁ সাহেব স্টেজে গিয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে গায়কের আসনে বসতেই হল শুদ্ধ দর্শক আনন্দে হাততালি দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। দেহে একটি বড় রকমের অস্ত্রোপচারের ফলে গত বছর খাঁ সাহেব (সম্মেলনের যজ্ঞে যিনি ছিলেন শিব) আসতে পারেননি; অস্ত্রোপচারের পর সুস্থতর দেহ নিয়ে সম্মেলনে এই তাঁর প্রথম যোগদান। ভক্ত শ্রোতাদের তাই এই সমবেত উল্লাস।

প্রথমে মালকোষ রাগে অনবদ্য খেয়াল গেয়ে আমাদের সবার মন আনন্দে ভরিয়ে দিলেন বড়ে গুলাম আলী। গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ অস্ত্রোপচারের পর খাঁ সাহেব সুস্থ হয়ে ফিরবেন কি-না, এবং ফিরলেও আগেকার মতো গাইতে পারবেন কি-না, এ বিষয়ে অনেকের মনে উদ্বেগ-আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখা গেল আগে তাঁর দৈহিক যে অসুবিধা ছিল সেটি অস্ত্রোপচারের ফলে দূর হওয়ায় তিনি আগেকার চাইতে বেশী স্বচ্ছলভাবে এবং বেশী ভালো গাইতে পারছেন।

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে তাঁর মনে মনে নির্দিষ্ট করা সময়ে অতি সুন্দর ভঙ্গীতে এসে মালকোষ খেয়ালটি শেষ করলেন বড়ে গুলাম আলী। মনে হলো, "আহা, আরো কিছুক্ষণ চললে ভাল হতো!"

আমি শ্রোতাদের প্রথম সারিতে বসে তন্ময়ভাবে লক্ষ্য করছিলাম ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীকে। কারণ আমার কাজ তো শুধু শোনা আর উপভোগ করা নয়, পুরো অধিবেশনের রিপোর্ট অর্থাৎ বিবরণও তো বিষদভাবে লিখতে হবে আমাকে, আমার বিশ্লেষণী মন্তব্যসহ।

খেয়াল গাওয়া হলো। এবার যথারীতি একটি ঠুংরি গেয়ে খাঁ সাহেবের পরিবেশন শেষ করবার কথা। আজ নতুন কিছু শোনাবার জন্য যে আবেদনটি তাঁর কাছে পেশ করেছিলাম, সেটি স্মরণ করে তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন তাঁর অনবদ্য বাচন-ভঙ্গীতে ঃ

"অব আপলোগোকো এক নয়া খেয়াল সুনাউঁ। ঠুংরি নেহি গাউঁ।" অনেকটা যেন ছেলেমানুষী আবদারের ভঙ্গীতে নিবেদনটি জানালেন তিনি। অর্থাৎ, "অন্যান্যবার যেমন একটি খেয়ালের পর একটি ঠুংরি গেয়ে আমার সঙ্গীত পরিবেশন শেষ করি। এবারে তার একটু পরিবর্তন ঘটাব। ঠুংরির বদলে একটি নতুন খেয়াল আপনাদের শোনাবো।" তাঁর এই নিবেদনের তাৎক্ষণিক ফল হলো অদ্ভুত—আমার পক্ষে কিছুটা অপ্রত্যাশিতও বটে। সারাটা প্রেক্ষাগৃহ যেন একসঙ্গে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল, বহু কণ্ঠ থেকে এক সঙ্গে জোরালো আওয়াজ উঠলো : "ঠুংরি। ঠুংরি।" এবং ঠিক তার পরেই সমবেত ফরমায়েশ শোনা গেল :

"আয়ে না বালম।" স্টেজ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী, যেন বলছেন—

"দেখলেন তো?"

মনে মনে বললাম, "হ্যাঁ খাঁ সাহেব। দেখলাম। বুঝলাম শ্রোতা সাধারণের নাড়ির খবর আপনি আমার চাইতে অনেক বেশী ভাল রাখেন।"

"আয়ে না বালম" ঠুংরি গানটি গাইলেন বড়ে গুলাম আলী। বলা বাহুল্য অসামান্য ভাল লাগলো। বড়ে গুলাম আলীর কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত এ গান ভাল না লাগা অসম্ভব।

(কিন্তু পরম দুঃখের বিষয়—অন্ততঃ আমার পক্ষে—একাধিক বাজারচালু কিন্তু অপটু কণ্ঠ গায়ক এই গানটি গাইবার ধৃষ্টতা করে এর অমর্যাদা করছেন। অবশ্য অসাধারণ গায়ক এবং সুর শিল্পী সুধীর লাল চক্রবর্তী খাঁ সাহেবের এই গানটির সশ্রদ্ধ অনুকরণে যে বাংলা গানটি রেকর্ড করেছিলেন—'মধুবনে বাঁধা আছে মিলন ঝুলনা'—সেটির জন্য আমাদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। তিনি অতি সুকণ্ঠ এবং সুদক্ষ গায়ক হয়েও খাঁ সাহেবের মূল ঠুংরিটি কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে গাইবার ধৃষ্টতা করেন নি।)

অন্যান্যবার 'আয়ে না বালম' গানটি যতক্ষণ গাইতে শুনেছিলাম

বড়ে গুলাম আলীকে এবার লক্ষ্য করলাম তার চাইতে কিছু কম সময়ে গেয়ে গানটি শেষ করলেন তিনি। কিন্তু কেন? খাঁ সাহেবের মতো সময় সচেতন গায়কের তো সময়ের হিসেবে ভুল হবার কথা নয়।

কারণটা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল। খাঁ সাহেব বললেন, "আজ একটি নতুন গান আপনাদের শোনাব ঠিক করেছি। আপনারা যখন ঠুংরিই শুনতে চান, তখন একটি নতুন ঠুংরিই আপনাদের শোনাচ্ছি।"

শোনালেন। তাঁর স্বরচিত একটি অনবদ্য ঠুংরি ঃ

'সুনো সুনো রে পপৈয়া,

না বোলো পিয়াকে নাম।

এক বিরহী প্রেমিকের অন্তর বেদনা ফুটে উঠেছে এই গানে। সে বলছে, "ওরে পাপিয়া, তুই পিয়া নামটি উচ্চারণ করিস না। তোর মুখে পিয়া নাম শুনে দূরবর্তিনী পিয়ার কথা মনে করে তার বিরহ বেদনা আমার মনে তীব্র হয়ে উঠছে।"

"সুনো রে পপৈয়া, না বোলো পিয়াকে নাম।" বিরহ বেদনাবিধুর এই অনবদ্য ঠুংরি গানটি ওস্তাদ বড়ে গুলাম খাঁ সাহেবের কণ্ঠে কলকাতায় সঙ্গীত সম্মেলনে শুনে সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির পাখায় উড়ে চলে গেলাম প্রায় বিশ বছর আগে ঢাকা শহরে নবাবপুর রোডের ধারে মুকুল থিয়েটার ছবিঘর সংলগ্ন একতলা ঘরটিতে যে ঘরে ওস্তাদ গুল-মহম্মদ খাঁ সাহেব আমাকে এবং অন্য কয়েকজন শিষ্যকে তালিম দিতেন।

ওস্তাদজির নিয়মিত বাসস্থান ছিল শহরের অন্যত্র, এই ঘরটি তিনি বিশেষ ভাবে ভাড়া নিয়েছিলেন শিষ্যদের তালিম দেবার জন্যই, অবশ্য খেয়ালী মানুষ তিনি, কোনো কোনো দিন এ ঘরেই থাকতেন, রিয়াজ করতেন। ঘরের মেঝের পুরোটা নয়, বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে বিছানো থাকতো একটি ফরাস আর ঘরের একপাশে তানপুরা, হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, হাতুড়ি আর সুরভিত ধোঁয়া সৃষ্টির সরঞ্জাম আর মাল-মশলা। মাল-মশলা মানে প্রধানতঃ 'লোভান',

অর্থাৎ ধূপ জাতীয় একটি জিনিস, যা মৃদু জ্বলন্ত টীকার বা নারকেল ছোবড়ার ওপর রেখে পোড়ালে তা থেকে সুরভি ধোঁয়ার গন্ধ নির্গত হতো। এই লোভানের ধোঁয়ার গন্ধ বড় প্রিয় ছিল ওস্তাদজির। আমাকে এই ঘরে যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করে-ছিলেন সেদিন অনেক লোভান পুড়িয়েছিলেন তিনি, সেই ধোঁয়ার সুরভি আজও ভুলতে পারিনি। তার অনেক পরে ঐ ঘরেই খাম্বাজ রাগে বিরহ-বেদনাভিত্তিক একটি অবিস্মরণীয় ঠুংরি গান শুনেছিলাম ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের মুখে, এবং গানটির শুধু আস্থায়ী অংশের তালিমও পেয়েছিলাম, সেকথা আগেই বলেছি। এই আস্থায়ী অংশটুকু আবার বলি ঃ

"কাটত রৈন পিয়া বিন
তরপ সারি।
পিয়া মিলবেকো
যতন বাতা প্যারি।"

ওস্তাদজি চিরদিনের জন্য চলে গেছেন (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯), চিরদিনের জন্য তাঁর গান, তাঁর অমৃত সমান স্মৃতি রেখে গেছেন আমার অন্তরে। আমার জীবন তিনি সুরের সুধায় ভরে দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

১৯৪০ সালে যখন তাঁর কাছ থেকে দ্বিতীয়বার বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে আসি ওস্তাদজি তখন সস্নেহে আমার শুভ কামনা করে প্রশ্ন করেছিলেন, "ফের কব্ আওগে বেটা?" তাঁর সেই স্নেহ-ভরা প্রশ্ন আজও আমার কানে লেগে আছে। তিনি আন্তরিকভাবেই কামনা করেছিলেন আবার যেন আমি ঢাকায় ফিরে আসি। আবার যেন তিনি আমাকে দেখতে পান। কিন্তু তারপর আর ঢাকায় যাই নি। ওস্তাদজির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ১৯৪০ সালে তাঁর কাছ থেকে সেই বিদায়ই, আমার তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায়।

সেই সঙ্গে আরেকটি মানুষের কাছ থেকেও বিদায় নিয়ে এসেছিলাম; তাঁর কথা না বললে আমার ওস্তাদজির কাহিনী বলা

অসম্পূর্ণ থাকবে, মানুষটির নাম আবতুল, আবতুল ছিল একজন সাধারণ নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত গরীব মানুষ, তার পেশা কি ছিল অথবা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু তার যে সঙ্গীতপ্রীতি ছিল এবং ওস্তাদজিকে সে যে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করত সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই আবতুল নানাভাবে ওস্তাদজির সেবা করত, পরম অনুগত চেলা যেভাবে তার গুরুর সেবা করে। আলবোলায় অম্বুরী তামাকের ধূমপান করতে ভালবাসতেন ওস্তাদজি। আবতুল পরম যত্নে তার ব্যবস্থা করে দিত। ওস্তাদজির সবরকম কেনাকাটার কাজ করে দিত আবতুল। ঘরটিরও তদারক করত সে। আমরা 'বাবু'—শ্রেণীর শিষ্যরা যখন ফরাসের ওপর বসে ওস্তাদজির কাছে তালিম নিতাম, তখন সে পরম বিনয়ে ফরাসের বাইরে সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে ফাঁকা মেঝের ওপর বসে বসে সেই তালিম শুনত, আমি লক্ষ্য করতাম সে নিস্ক্রিয় ভাবে শুনছে না। ওস্তাদজি যে তালিম আমাদের দিচ্ছেন, তা শুনে শুনে মগজে গেঁথে নেবার চেষ্টা করছে। তার মনেও শখ গাইয়ে হবার, তাই তার ঐকান্তিক চেষ্টা ক্রীতদাসের মতো সেবা দিয়ে ওস্তাদজির মেহেরবানি লাভ করা। আবতুলের প্রতি আমার গুরু ভ্রাতাদের (অর্থাৎ ওস্তাদজির অন্যান্য শিষ্যদের) কিঞ্চিৎ বিরূপ মনোভাব ছিল; আবতুলের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা আছে, এই বদনাম শুনে, আবতুলকে ওস্তাদজি যে স্নেহ প্রদর্শন করতেন, তা এদের পছন্দ ছিল না। কিন্তু খোলাখুলি সেকথা ওস্তাদজিকে বলতে তাঁরা ভরসা পাননি।

এই তুচ্ছ নগণ্য লোকটিকে ওস্তাদজি বড় বেশী লাই দিচ্ছেন, এই ছিল তাদের অসন্তোষের কারণ। আবতুলের গাইয়ে হবার বাসনাকে তাঁরা বিদ্রূপের নজরে দেখতেন। তাঁদের বিবেচনায় আবতুলের এই তুরাশা ছিল কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার অথবা বামনের চাঁদ ধরবার আশার সমতুল্য।

আমি প্রথম দফায় (১৯৩৫-১৯৩৬) যখন ওস্তাদজির কাছে তালিম নিয়েছিলাম, তখন একদিন লক্ষ্য করেছিলাম আমাদের

তালিম নেয়া শেষ হয়ে গেলে আবত্নল ঐ ঘরের কোণে বসে হারমোনিয়াম যন্ত্রটি আনাড়ী হাতে আনাড়ীভাবে বাজিয়ে আনাড়ী কণ্ঠে সা রে গা মা সাধছে, তার কণ্ঠের ক্রুটি আমার কানকে পীড়িত করেছিল, কিন্তু তার সাধনার ঐকান্তিকতাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি না জানিয়ে পারিনি।

সত্যি কথা বলতে কি, লোকটিকে আমি তুচ্ছ বলে ভাবতে পারি নি। দেখলাম ওস্তাদজিও তাকে স্নেহের চোখে দেখছেন। আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে ঐ ঘরে ওস্তাদজি আমার হাতে যেদিন 'নাড়া বা গাণ্ডা (লাল স্থতোর তৈরী রাখী) বেঁধে দিলেন। সেদিন ওস্তাদজির নির্দেশমতো ধুনুচিতে লোভান জ্বালিয়ে স্থগন্ধ ধোঁয়ার স্বষ্টি করেছিল এই আবত্নল। বোধ হয় বিশেষ করে সেই কারণেও আমার মন এই অশিক্ষিত সঙ্গীতভক্ত মানুষটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

এ ছাড়া আরেকটি বড় কারণ ছিল এই যে, তখনকার বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকা সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতা এবং গল্প (কখনো বা নাটিকা এবং প্রবন্ধ) ১৯৩২ সাল থেকেই প্রায় নিয়মিতভাবে লিখে লিখে আমি তখন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে কায়েমীভাবে স্থান করে নিয়েছি এবং আমার নামের সংক্ষিপ্ত 'অ-কৃ-ব' রূপটি পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে স্থপরিচিত হয়ে গেছে। কথা-সাহিত্য রচনার জন্য বাস্তব জীবন থেকে খোরাক সংগ্রহে আমার আগ্রহ তখন অপরিসীম, বিভিন্ন ধরনের চরিত্র পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যয়ন —ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'ক্যারেক্টার স্টাডি' আমার গভীর নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। আমি আমার আবত্নলকে একটি মূল্যবান চরিত্ররূপে দেখলাম। সাহিত্য স্রষ্টার আসল কাজই তো তথাকথিত বা আপাত তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছতার জাল ভেদ করে সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে আবিষ্কার করা, স্কুল-কলেজে শিক্ষা পেয়ে 'সংস্কৃত' (ইংরাজী ভাষায় যাকে বলি 'কালচার') লাভ করার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তাদের পক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আকৃষ্ট হওয়া কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। কিন্তু আবত্নল নিতান্ত নিরক্ষর নীচু শ্রেণীর মানুষ হয়েও

খাঁ সাহেবের উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনে সঙ্গীত রসে মজেছে, সেটা একটা মস্ত অসাধারণ ব্যাপার বৈ-কি ?

আবতুল সম্বন্ধে ওস্তাদজির মনোভাবও দেখলাম আমারই অনুরূপ। তিনি আমাকে জানালেন একাধিক বদ-খেয়াল ছিল আবতুলের, স্বয়ং খুদা মেহেরবানি করে তাকে সুরের নেশায় মাতিয়ে দিয়েছেন। তাই তার চরিত্র অনেক ভালো হয়ে গেছে, ওস্তাদজির কথা শুনে বুঝলাম মানুষের চরিত্রের ওপর সঙ্গীতের শুভ প্রভাব তিনি বিশ্বাস করেন, তাই আবতুলকে তাঁর সঙ্গীতের আশ্রয় দিয়েছেন, সঙ্গীত সাধনা তাকে অপরাধ সাধনের পথ থেকে সরিয়ে রাখবে আশা করে।

প্রথমবার (১৯৩৬) যখন ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে আসি তখন সা রে গা মা সাধনে আবতুলের কণ্ঠ বেশ কিছুটা সুরেলা হয়েছে দেখে সানন্দ বিস্ময় বোধ করেছিলাম।

তারপর ওস্তাদজির কাছে দ্বিতীয় দফায় (১৯৩৯—৪০) তালিম নেবার পর যখন শেষবারের মতো ওস্তাদজির কাছে থেকে (আর সেই সঙ্গে ঢাকা শহর থেকে) বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম, তখন দেখে এলাম হারমোনিয়াম বাদনে আগের চাইতে অনেক বেশী দক্ষ হয়েছে আবতুলের হাতের আঙুল, আর আবতুল যে ইমন রাগের আস্থায়ী গাইছে ঃ

"এরি আলি পিয়া বিন সখি
কাল না পড়ত মোহে······"

তা কানে ঠিক মধুবর্ষণ না করলেও বেসুরো লাগছে না। খেয়ালে আমাকে এই গানটি দিয়েই তালিম শুরু করেছিলেন ওস্তাদজি, বিদায় নিয়ে আসার আগে গুরুভ্রাতা আবতুলের কণ্ঠ-নিঃসৃত এই গান আমার মর্মস্পর্শ করল।

ওস্তাদজির মতোই আবতুলও আমাকে প্রশ্ন করেছিল আবার কবে আমি ঢাকায় আসব, আবার কবে দেখা হবে, ফাঁপা প্রশ্ন নয়, তাতে ছিল নির্ভেজাল আন্তরিকতা, ওস্তাদজির মাধ্যমে এতদিনের সান্নিধ্যে সে সত্যি আমাকে ভালবেসে ফেলে ছিল, কারণ আমাদের দু'জনেরি

লক্ষ্য ছিল ঐকান্তিকভাবে এক ওস্তাদজির তালিমে সুর-সাধনা।

আবদুলের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সে গাইয়ে হতে পেরেছিল কিনা জানি না, কিন্তু ওস্তাদজির তালিম সুরের সাধনা তার যে অসাধারণ পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিল এবং সেই পরিবর্তন ছিল মন্দ থেকে ভালোর দিক, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

ওস্তাদজি (গুল মহম্মদ খাঁ সাহেব) উদাহরণরূপে এই আবদুলের উল্লেখ করেই আমাকে বলেছিলেন সুরের স্বাদ অনুভব ক'রে সুরকে ভালবেসে ফেলবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, সুরের যাদু তার মনের ভেতরটাকে এমন নির্মল এমন সুন্দর করে দেয়, যে সে কোন নোংরা বা অসুন্দর কাজ আর করতে পারে না।

মহাকবি-মহানাট্যকার শেক্সপীয়ার লিখেছিলেন সুর সঙ্গীত যার মধ্যে নেই, সঙ্গীতের মাধুর্য যার মনে সাড়া জাগায় না, তার দ্বারা যে কোন রকম অপকর্ম সাধিত হতে পারে। আর ওস্তাদজি বললেন সুর যার মধ্যে আছে, তার দ্বারা কোন গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হতে পারে না।

তার অনেক বছর বাদে কলকাতায় হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীতের জগতে সর্বশেষ বিরাট পুরুষ (লাস্ট্ অব দি জায়েন্টস্) ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব (১৯০২-১৯১৯) ও একদিন কথা প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন একটি অন্তরঙ্গ ঘরোয়া আলোচনায়। সেই অবিস্মরণীয় বিকেল বেলার কথাই বলি, তার আগে এইটুকু বলে রাখি যে, আমার বন্ধু গ্রামোফোন কোম্পানীর (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) প্রচার বিভাগের কর্মচারী সন্তোষ কুমার দে'র ব্যবস্থাপনায় আমি হিন্দুস্তানী সঙ্গীত জগতের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর সঙ্গে 'সাক্ষাৎকার' করেছিলাম, আমার সাক্ষাৎকৃত শিল্পীদের মধ্যে রবিশংকর, রাইচাঁদ বড়াল, আলী আকবর, তিমিরবরণ, শচীনদেব বর্মন প্রমুখ আরো অনেকে ছিলেন এবং সাক্ষাৎকারগুলি ইংরাজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং যাদের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারগুলি করেছিলাম, তাদের

মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গভাবে প্রভাবিত এবং অভিভূত করেছিলেন ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব।

এক অপরাহ্ন বেলায় বন্ধুবর নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বসে তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। নীলরতন বাবু সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' নামক সঙ্গীত শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, সঙ্গীত বিষয়ক একমাত্র বাংলা মাসিক পত্র 'সুরছন্দা'র সম্পাদক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কিত কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক।

কলকাতা শহরে সে সময়ে ইংরাজী বছরের শেষ দিকে একাধিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হতো, যথা ঃ নিখিল ভারত এবং নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন। সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলন, মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন ভারতের আর কোন শহরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এত বেশী সংখ্যক ভক্ত শ্রোতা নেই। সুতরাং কলকাতা শহরটি সারা ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের প্রিয়তম তীর্থক্ষেত্র এ কথা শুধু ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর মুখেই নয়, বিখ্যাত খেয়ালী এবং তরানী (তেলেনা) বিশারদ গায়ক শিরোমনি পণ্ডিত বিনায়ক নারায়ণ পটবর্ধনজির মুখেও শুনেছিলাম। কথায় কথায় নীলরতনবাবু বললেন, সঙ্গীত সম্মেলনের মৌসুম এ বছরের মতো শেষ হয়ে গেল। শুনেছি ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব পার্ক সার্কাসে কড়ায়া রোডে এক বন্ধুর বাড়ীতে আছেন। যে কোন দিন চলে যেতে পারেন, চলুন না আজই একবার গিয়ে খাঁ সাহেবের সঙ্গে একটু মোলাকাত আর বাতচিত করে আসি। অবশ্য খাঁ সাহেব কলকাতায় এখনো আছেন, না চলে গেছেন তা সঠিক জানি না। গিয়ে দেখা পাবো কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু চলুন একবার 'লাক ট্রাই' (ভাগ্য পরীক্ষা) করে আসা যাক।" ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি হঠাৎ এই মতলবটি নীলরতন বাবুর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন দমকা হাওয়ার ঝাপটার মতো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম,

গিয়ে যদি দেখা না পাই তাহলে যাওয়ার পরিশ্রমটা বৃথা হবে। সেটা এমন ভীষণ মারাত্মক ক্ষতি কিছু নয়। কিন্তু যদি দেখা মেলে তাহলে সে হবে এক দুর্লভ অমূল্য অভিজ্ঞতা। এমন হঠাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপায়ন নীলরতন বাবুর আর আমার জীবনে আর কখনো ঘটেনি।

একটি ট্যাক্সিতে তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম পার্ক সার্কাস অভিমুখে। আমি আমার ক্যামেরাটি সঙ্গে নিয়ে নিলাম দেখা মিললে নিজের হাতে নিজের ক্যামেরায় খাঁ সাহেবের ছবি তুলে আনবো। আমি নিতান্তই আনাড়ী এবং 'অনিশ্চিত' ফোটোগ্রাফার, কাজেই আমি অপটু হাতে খাঁ সাহেবের যেসব ছবি তুলবো, তাদের ভেতর একটিরও কাগজে রূপ পাওয়া সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, আমার আশংকা শুনে নীলরতন বাবু বললেন, "তাহলে মনোমিত্রকেও বলি তার পেশাদারী ক্যামেরা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে"।

মনোমিত্র বয়সে আমাদের চাইতে অনেক কাঁচা হলেও পাকা পেশাদার ফোটোগ্রাফার, সঙ্গীতের এবং নীলরতন বাবুর পরম ভক্ত, খাঁ সাহেব সন্দর্শন সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে তিনি তাঁর সেরা ক্যামেরা-খানা আর সরঞ্জাম নিয়ে ট্যাক্সিতে আমাদের সঙ্গে চললেন।

ঠিকানা জানা ছিল শুধু পার্ক সার্কাস অঞ্চলের কড়ায়া রোড, বাড়ীর নম্বর, অবস্থান বা গৃহস্বামীর নাম জানা ছিল না। আন্দাজে ট্যাক্সি নিয়ে না ঘুরে কড়ায়া রোডের মোড়ে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে পড়লাম, আর জনে জনে প্রশ্ন করতে লাগলাম ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী কোন্ বাড়ীতে অবস্থান করছেন। বয়স্ক কয়েকজন ব্যক্তির অজ্ঞতায় হতাশ হয়ে পড়ছি এমন সময় বছর দশেকের একটি মুসলিম বালককে স্বয়ং বিধাতা যেন দেবদূতের মতো আমাদের সামনে পাঠিয়ে দিলেন। ওকে জিজ্ঞাসা করতে জবাব পেলাম, "হাঁ হাঁ, এক গাবৈয়া হ্যায় উধার এক মকানমে। উনকা গানা সুনা, মগর উনকা নাম মালুম নহী। বহুৎ বঢ়িয়া গানা।"

মনে হলো যেন হাতে স্বর্গ পেলাম, বালকটি বলে দিল নাক বরাবর সোজা এগিয়ে গেলে এই রাস্তার শেষ মাথার কাছাকাছি বাড়ি। ওখানে গেলেই মালুম হয়ে যাবে।

মালুম সহজেই হয়ে গেল। বালকের কথা মতো কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই দেখলাম পথের ধারে একটি বাড়ীর একতলা ঘরের সদর দরজাটি সম্পূর্ণ খোলা, ঘরের মেঝের ওপর পাতা ফরাসের ওপর বসে আছেন আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছ'তিনজন ব্যক্তি এবং ঘরের ভিতর দিকে দেয়ালের ধারে একটি সোফায় বিপুল বপু এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছেন আমাদের পরম পরিচিত কণ্ঠসঙ্গীত যাদুকর ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ।

আমরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঢুকব কি ঢুকবো না ইতস্তত করছি দেখে খাঁ সাহেব সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন ভিতরে আসতে। আমরা ভিতরে গিয়ে ফরাসের উপর বসে সবিনয়ে জানালাম তাঁর গানের মুগ্ধ ভক্ত আমরা এসেছি তাঁর মুখের কিছু কথা শুনে ধন্য হয়ে যেতে অবশ্য যদি তাতে তাঁর কাজের বা বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটে।

আমাদের দ্বিধা আর সংকোচ দেখে খাঁ সাহেব জানালেন, "আজ আমার রিয়াজের দিন নয়। কণ্ঠ বিশ্রামের দিন। আপনারা যতক্ষণ খুশি থাকতে পারেন, আমি তাতে খুশিই হব। আপনাদের সঙ্গে বাতচিত করতে আমার ভালই লাগবে। কিন্তু এইখানে (অর্থাৎ আরাম কেদারায়) বসে বসে কথা বললে কিছু মনে করবেন না যেন। এই দেহ নিয়ে আমার ওঠা তো সহজ কর্ম নয়, আমাকে তুলতে একটা 'ক্রেন' দরকার হবে।"

নিজের বেসামাল বিপুল বপুর প্রতি কৌতুক কটাক্ষ করে নিজেই যেন শিশুর মতো মজা পেলেন ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী।

সেদিন তাঁর কাছ থেকে সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার যেসব বিবরণ শুনেছিলাম, তার কিছু অংশ সংক্ষেপে বলি :

একবার তিনি হয়েছিলেন আফগানিস্তানের আমীরের সম্মানিত মেহমান। আমীর ছিলেন খাঁ সাহেবের গানের ভক্ত। মধ্যদিনে, মধ্যাহ্ন ভোজের পর তিনি এবং আমীর বিশ্রামকক্ষে আরাম কেদারায় বসে গল্প-সল্প করছেন, আমীরের প্রিয় ময়ূর পাখিটি পেখম গুটিয়ে তার অভ্যাসমতো আমীরের পায়ের কাছে শুয়ে বিশ্রাম করছে এমন সময়ে আমীর খাঁ সাহেবকে কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন পশু-পাখিদের ওপরও সঙ্গীতের প্রভাব কাজ করে, এ কথা সত্য কিনা।

খাঁ সাহেব বলেন, 'আপনার পোষা ময়ূরটির ওপরই পরীক্ষা করে দেখা যাক।" বলে বসন্ত রাগে সুরের আলাপ শুরু করলেন তিনি।

খাঁ সাহেবের স্বর বিস্তার শুরু হতেই ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠল ময়ূরটি। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পেখম ছড়িয়ে ঘরময় খাঁ সাহেবের গানের ছন্দে নেচে বেড়াতে লাগলো। যতক্ষণ তার গান চলল ততক্ষণ ঐভাবে নেচে তারপর খাঁ সাহেব যখন সুরের আলাপের সমাপ্তি ঘটালেন, তখন ময়ূরটিও নাচ বন্ধ করে ফিরে এসে পেখম গুটিয়ে তার আমীর প্রভুর পায়ের কাছে আগেকার মতই শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

পরে বন্ধুদের নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনেছিলাম সেটি এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক রাতে কলকাতায় একজন ধনী সঙ্গীত রসিকের বাড়িতে একটি ছোট ঘরোয়া আসরে খাঁ সাহেব গান গাইছিলেন। সমঝদার শ্রোতা পেয়ে খাঁ সাহেব তার মূল্যবান সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে সেরা সেরা চিজ পরিবেশন করে সবার মন পরমানন্দে ভরিয়ে দিচ্ছিলেন। শেষে অনবদ্য দরবারী কানাড়া গেয়ে যখন থামলেন, তখন মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেছে।

এ রাতের মতো শেষ করে বিদায় নেবেন খাঁ সাহেব, এমন সময় একজন শ্রোতা প্রশ্ন করলেন, "আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে যে বিভিন্ন রাগ গাইবার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, তার কি যুক্তি-সঙ্গত বা বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণ আছে, নাকি শাস্ত্রকাররা

নিজেদের খেয়ালখুশি মাফিক এলোমেলোভাবে ফতোয়া জারি করে গেছেন ?”

ওস্তাদ বড়ে গুলাম বললেন, “একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক। আমি কালেংড়া রাগে আলাপ গাইছি, আপনারা চোখ বুজে নীরবে স্থির ভাবে মন দিয়ে একটু শুনে আমাকে বলুন আমার রাগ-আলাপ শুনে আপনাদের মনে কোন সময়ের অনুভূতি আসছে।”

কালেংড়া রাগটি সঙ্গীত-শাস্ত্র অনুসারে শেষরাতে গাইবার রাগ, যখন রাতের অন্ধকার শেষ হয়ে যাবার উপক্রম করছে মাত্র রাত পোহায়নি, দিনের আলো ফোটে নি, ফুটি ফুটি করছে মাত্র।

ওস্তাদ বড়ে গুলামের কণ্ঠে এই অসময়ে কালেংড়া রাগের সুর বিস্তার শুনতে শুনতে শ্রোতাদের মনে হতে লাগলো যেন শেষরাত্রি শুরু হলো, একটু পরেই প্রভাতের রবির আলো দেখা দেবে। অথচ তখন সবেমাত্র মধ্য-রাত্রি পার হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। যে ঘরে খাঁ সাহেবের গান হচ্ছিল। তার ও পাশেই ছিল গৃহস্বামীর গোয়াল ঘর। সেখানে থাকতো তাঁর মুলতানী গরুটি। রোজ অতি প্রত্যূষে গৃহ-স্বামীর বেতনভুক্ত গোয়ালাটি ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিতভাবে আসত ঐ গরুটির দুগ্ধ দোহন করতে। তার আগমন টের পেয়েই গরুটি হাম্বা রবে ডেকে উঠতো, এটা তার নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খাঁ সাহেবের কণ্ঠনিঃসৃত প্রত্যূষের রাগ কালেংড়ার আলাপ কানে যেতেই মুলতানী গরুটির ঘুম ভেঙে গেল। তার মনে হলো রাত্রি শেষ হয়ে গেছে প্রভাত আসন্ন যে সময়ে গোয়ালাটি আসে তার দুগ্ধ দোহন করতে। সে তখন তার অভ্যাস মত হাম্বা রব কোরে উঠলো। এ কাহিনীর মর্মার্থ এই যে কালেংড়া রাগের আলাপ শুধু মানুষ শ্রোতাদের মনে নয় চতুষ্পদ মুলতানী শ্রোতাটির মনেও দিয়েছিল প্রত্যূষের অনুভূতি যে সময় কালেংড়া রাগ গাইবার নির্দেশ দেয়া আছে সঙ্গীত শাস্ত্রে। এবার কড়ায়া রোডের ধারে একতলা ঘরটিতেই ফিরে আসা যাক। হৃদরোগ-গ্রস্তা এক বৃদ্ধা মহিলার ওপর রাগ

সঙ্গীতের যাদু কিভাবে কাজ করেছিল সে কাহিনী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শোনালেন খাঁ সাহেব। এক শহরে গানের মহফিলে যোগ দিতে গেছেন তিনি তখন এক দিন এক ভদ্রলোক এসে বললেন, "খাঁ সাহেব, আমার এক বৃদ্ধা আত্মীয়া হৃদরোগে শয্যাশায়িনী। উঠে বসতে পারেন না। আপনি এই শহরে এসেছেন জেনে তিনি আপনার গান শুনবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাঁকে বাড়ীর বাইরে কোথাও আপনার গান শুনতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ দক্ষিণা দিয়ে আপনাকে বাড়ীতে গাইতে নিয়ে যাবার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই বিনীত নিবেদন আপনি যদি মেহেরবানি করে একদিন শুধু একদিন কিছুক্ষণ এসে রোগিনীর শয্যার পাশে বসে গান শুনিয়ে যান তাহলে তিনি তৃপ্তি পাবেন আর আমরা আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"

তাঁর গান শুনতে শয্যাশায়িনী বৃদ্ধার ব্যাকুলতার কথা শুনে অভিভূত হয়ে খাঁ সাহেব বললেন, "নিশ্চয় যাবো আমি তাঁকে গান শোনাতে। আর্থিক দক্ষিণার কোন প্রয়োজন নেই, গান শুনিয়ে যদি তৃপ্তি দিতে পারি তাহলে তাইতো হবে আমার সেরা দক্ষিণা। খাঁ সাহেব ঐ বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়ে রোগিনীর অবস্থা বুঝে বিশেষভাবে বিবেচনা করে কয়েকটি রাগের আলাপ শুনিয়েছিলেন। শুধু একদিন নয়, যে কটি দিন ঐ শহরে ছিলেন প্রতিদিন তিনি বৃদ্ধা হৃদরোগিণীর শয্যার পাশে বসে তাঁকে গান শুনিয়ে আসতেন। তারপর খাঁ সাহেবেরই জবানিতে, "শহর ছেড়ে আসার আগে যখন সেই মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম তখন তাঁকে আগেকার চাইতে অনেক বেশী সুস্থ দেখে মনে হল রাগ সঙ্গীতের দাওয়াই তার ওপর কাজ করেছে। তাতে আনন্দলাভ করলাম। গান গেয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করলেও তত আনন্দ মেলে না।

"আমার বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারী কিম্বা হেকিমী দাওয়াই-এর চাইতে রাগ-সঙ্গীতের দাওয়াই বেশী কাজ করে। এবং এ বিষয়ে গবেষণার প্রচুর অবকাশ আছে।"

ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলীর সঙ্গেই আমরা কথা বলছিলাম। তাঁর দিকেই আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ। আমাদের পাশেই ফরাসের ওপর যে দু'জন বসে ছিলেন, তাঁদের দিকে আমরা নজর দিচ্ছিলাম না কারণ তাঁরা আমাদের অপরিচিত, তাঁদের এর আগে আর কখনো দেখিনি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একবার গোলাম আলী সাহেবের খেয়াল হলো তিনি আমাদের মনোযোগের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছেন, ওরা দু জনেই অবহেলিত এটা ঠিক শোভন হচ্ছে না।

আমার বাঁ দিকে বেশ বলিষ্ঠ-দেহ যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তাঁর দিকে দেখিয়ে বড়ে গোলাম বললেন, "ইয়ে হ্যায় বরকৎ আলী, মেরা ভাই। বহুৎ আচ্ছা ঠুংরি গাতা।"

কোনো সঙ্গীত সম্মেলনে বরকৎ আলী খাঁকে দেখিনি। তাঁর গানও শুনিনি। তাই চিনতাম না তাঁকে। মনে হলো নিতান্তই সৌজন্য বা ভদ্রতার খাতিরে বরকৎ আলীকে খুব ভালো ঠুংরি-গায়ক বলে প্রশংসা করছেন বড়ে গুলাম। আমরাও ভদ্রতার খাতিরেই ওস্তাদ বরকৎ আলী খাঁকে টের পেতে দিলাম না তাঁর নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। তাকে সম্মান স্বীকৃতির সালাম জানালাম। তিনিও হাসিমুখে আমাদের প্রতি-সালাম জানালেন। জানি না আমাদের ভদ্রতার ছলনা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিনা।

এর অল্পদিন বাদেই লং-প্লেয়িং হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে এই ওস্তাদ বরকৎ আলী খাঁর ঠুংরি গান শুনে মুগ্ধ, স্তম্ভিত হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম তার সম্বন্ধে ওস্তাদ কিছু মাত্র বাড়িয়ে বলেন নি। বরকৎ আলী খাঁর ঠুংরি গানকে বিনা দ্বিধায় 'অনবদ্য' আখ্যা দেওয়া যায়। ঠুংরি গানের এত বড় শিল্পীর সঙ্গে এতদিন অপরিচিত ছিলাম বলে মনে মনে লজ্জাবোধ করেছিলাম। ওস্তাদ বরকৎ আলী খাঁ সাহেবের পাশে যে যুবকটি বসে ছিলেন, তিনি বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের মতো সগুম্ফ বা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ নন গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো এবং গৌরবর্ণ (অথবা তার কাছাকাছি)। তাঁকে দেখিয়ে গোলাম আলী সাহেব পরিচয় দিলেন এ তাঁর বড় ছেলে, (অর্থাৎ গায়ক

মুনাওয়ারের বড় ভাই। মুনাওয়ার আলীকে চিনতাম, কারণ তিনি প্রত্যেকটি সঙ্গীত সম্মেলনে পিতার সঙ্গে তাঁর সহায়করূপে গাইতেন। মুনাওয়ার তাঁর আব্বাজানের মতো অতটা কৃষ্ণবর্ণ না হলেও গৌরবর্ণ শ্রেণীতে পড়েন না। অর্থাৎ তাঁর গায়ের রং কালো অথবা তার কাছা-কাছি বলা যায়। খাঁ সাহেবের গৌরবর্ণ বড় ছেলে গাইয়ে হননি, হয়েছেন ব্যবসাদার। এই প্রসঙ্গে বড়ে গোলাম বললেন ঃ

"আমাদের বংশে একটা উল্লেখযোগ্য মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের মধ্যে যাদের গায়ের রং 'কালা' তারা গাইয়ে হয়। যাদের গায়ের রং হয় 'গোরা' তারা গাইয়ে হয় না। আমার গায়ের রং 'কালা' আমি গাইয়ে হয়েছি, ভাই বরকৎ ও তাই। আমার এই বড় ছেলে 'গোরা' সে গাইয়ে হয়নি, হয়েছে ব্যবসাদার। গাইয়ে হয়েছে আমার ছোট ছেলে মুনাওয়ার, যার গায়ের রং 'কালা'। মস্ত বড় গাবৈয়া ছিলেন আমার চাচা, গায়ের রং কালা বলেই তিনি ওস্তাদ কালে খাঁ নামে বিখ্যাত।"

ঢাকায় এই 'কালে খাঁ' নামটির সঙ্গে আমি ভীষণভাবে পরিচিত হয়ে ছিলাম ১৯৩৫ সালেই। তাঁর নাম, এবং অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রশংসা শুনেছিলাম আমার সঙ্গীত গুরু ঢাকা প্রবাসী ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের মুখেও। গ্রামোফোন (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) কোম্পানী থেকে কালে খাঁর একখানি মাত্র রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল, তার এক পিঠে ছিল একটি ভৈরবী ঠুংরী। অন্য পিঠে অনবদ্য চালে গাওয়া 'সুন হো বালম মোরা'। গানটি কি রাগে গেয়েছিলেন, তার নাম মনে নাই। এই মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডটি তাঁর ঢাকা সূত্রাপুরের বাড়ীতে বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক সুকুমার দত্ত মহাশয়, স্কুলে যিনি আমাদের বাংলা পড়িয়েছিলেন চমৎকার। তিনি নিজে মোটেও গায়িতে পারতেন না, কিন্তু ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাগল ভক্ত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেক দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডেও অসামান্য সমৃদ্ধ ছিল তাঁর সংগ্রহ এবং নাওয়াখাওয়া ভুলে সমঝদার আগ্রহী শ্রোতাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতে

তাঁর আলস্য বা অনীহা ছিল না।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন এই অসাধারণ গুণী ওস্তাদ কালে খাঁ। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅমিয় নাথ সান্যাল (কৃষ্ণ নগর নদীয়া) তাঁর "স্মৃতির অতলে" নামক অনবদ্য গ্রন্থে ঠুংরির বাদশা মৌজুদ্দীন খাঁ আর সঙ্গীতসূর্য ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে সঙ্গীত সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন ওস্তাদ কালে খাঁকেও। সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকার তো দূরের কথা 'সমসাময়িক' খ্যাতির প্রতিও কিছুমাত্র লোভ ছিল না এই অদ্ভুত খেয়ালী মানুষটির।

ঢাকা শহরেও বেশ কিছুদিন থেকেছিলেন কালে খাঁ। তাকে দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু তাঁর কথা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি অমিয় নাথ সান্যালের "স্মৃতির অতলে" বই পড়ে আর ঢাকার মুড়াপাড়ার জমিদার, সঙ্গীতের বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক এবং ভারত বিখ্যাত তবলাবিশারদ রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে।

ওস্তাদ কালে খাঁর গান আমি গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনেছি শুনে খুশী হয়ে উঠলেন বড়ে গুলাম। তিনি শোনেননি সেই রেকর্ড, শুনতে (এবং সম্ভব হলে সেই রেকর্ড একখানা সংগ্রহ করতে) আগ্রহী হয়ে উঠলেন। গ্রামোফোন (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) কোম্পানীর বন্ধুবর সন্তোষ কুমার দে'কে পরে বলেছিলাম খাঁ সাহেবের আগ্রহের কথা। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

ওস্তাদ বড়ে গোলামের সঙ্গে আমরা কথা-বার্তা বলছি, এমন সময়ে এসে হাজির হলেন কলকাতার খ্যাতনামা খেয়াল আর ঠুংরি গায়ক এ. কানন। তাঁর এই হাজিরার ধরণ দেখে বুঝলাম তিনি খাঁ সাহেবের বিশেষ স্নেহভাজন। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে খাঁ সাহেবের কাছে এসেছেন তাঁর পরামর্শ নিতে। কি পরামর্শ? আগামীকাল আলীপুর জেলের ভিতরে কয়েদীদের শোনাবার জন্যে যে সঙ্গীতের জলসা হবে, তাতে তিনি গান গাইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর গলার যে অবস্থা হয়েছে তা যদি দ্রুত সারিয়ে না ফেলা যায় তাহলে অসুস্থ গলায় গান ভীষণভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে তাঁর সুনামের হানি ঘটাবে।

শুনে খাঁ সাহেব তাঁর নিজের জন্য বিশেষভাবে তৈরী আরক এক গ্লাস পান করিয়ে দিলেন গায়ক এ. কাননকে আর বললেন, "এতেই কাজ হবে ; যদি আজ গলাকে পুরো বিশ্রাম দেওয়া যায়, তাহলে কাল আর কোন অসুবিধা হবে না গান গাইতে। আরকটি বিশেষ ফরমূলায় তৈরী কণ্ঠস্বরের কল্যাণকর উপাদান দিয়ে।"

জেলখানার ভিতরে গানের জলসা প্রসঙ্গে অপরাধীদের মনের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই শুরু হলো। গায়ক কানন বললেন, জেলখানার কয়েদীরাও যে 'মানুষ' তাদের শুধু 'ক্রিমিন্যাল' (অপরাধী) ভেবে নিয়ে তাদের ওপর প্রতিহিংসামূলক শাস্তির ভার চাপানো মানবোচিত কাজ নয়, সহানুভূতির সঙ্গে তাদের বিষয়ে বিবেচনা করে তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করাই রাষ্ট্রশক্তির কর্তব্য। সেই হিসাবে কারাগার কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পনা মানবিকতার দিক থেকে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

তিনি আরো জানালেন কয়েদী শ্রোতাদের চিত্তবিনোদনের জন্য জেলের ভিতরে এই যে সঙ্গীতের জলসা হচ্ছে, তাতে গান গাইবার জন্য তিনি কোন দক্ষিণা নিচ্ছেন না, যোগদানকারী অন্যান্য শিল্পীরাও দক্ষিণা নেবেন না। কারণ শিল্পী হিসাবে তাঁরা মনে করেন কারাগারের হতভাগ্য বন্দীদের প্রতি এটা তাদের সামাজিক এবং মানবিক কর্তব্য।

শুনে খুব খুশী হলেন বড়ে গোলাম। দুর্বুদ্ধির দাস হয়ে যারা ক্ষণিক ভুলের বসে অপরাধ করে ফেলে যারা কারাবাসের দুর্ভোগ সইতে বাধ্য হয় তাদের জন্য গভীর সহানুভূতি অনুভব করলো তাঁর শিল্পী মন।

ঢাকায় অনেক আগে ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের মুখে যে কথা শুনেছিলাম। কারাগারে সঙ্গীত জলসা প্রসঙ্গে তারই পুনরাবৃত্তি বা প্রতিধ্বনি শুনলাম ওস্তাদ বড়ে গেলাম আলী খাঁ সাহেবের মুখে। তিনিও বললেন সঙ্গীতরসে যে ডুবেছে, সে মানুষ 'ক্রিমিন্যাল' (অপরাধী) হতে পারে না।

এই তত্ত্বটি শুনতে ভালো হলেও বাস্তবের ধোপে টেকে কিনা এ বিষয়ে আমার মনে একটু সন্দেহ থাকলেও তাঁরা মনে দুঃখ পাবেন বলে উক্ত দু'জন সুর-সাধকের সঙ্গে তর্ক করিনি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ দু'রকম সত্তা থাকে, কখনো ভাল সত্তাটি প্রবল হয়, কখনো বা মন্দ সত্তাটি। রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের বিখ্যাত কাহিনী 'ডাক্তার জেকিল এবং মিস্টার হাইড' এই সত্যটিকেই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। ডাক্তার জেকিল ছিলেন অতি সুন্দর, প্রশংসনীয় চরিত্রের মহানুভব ভদ্রলোক, যতক্ষণ তাঁর মধ্যে সদগুণগুলি ক্ষমতায় আসীন থাকতো। কিন্তু যখন তাঁর ভিতরের বদ প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হয়ে উঠত, তখনই তিনি পরিণত হতেন বীভৎস চরিত্রে, মিস্টার হাইড-এ এবং এই মিস্টার হাইড দ্বারা জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হতো। ক্রিমিন্যাল মিস্টার হাইডের মৃত্যুর পর জনসাধারণ সভয়ে সবিস্ময়ে জানতে পারলেন সাধুপ্রকৃতি ডাক্তার জেকিল এবং অসাধুপ্রকৃতি মিস্টার হাইড একই দেহে দুই ব্যক্তি অথবা একই ব্যক্তির দুই রূপ।

স্টিভেনসনের অনেক বছর পরবর্তী একজন অল্পখ্যাত আধুনিক লেখকের একটি চমৎকার ছোট গল্প পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তার মূলেও ছিল এই প্রশ্ন সঙ্গীতের গভীরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করেছে তার দ্বারা ক্রাইম (আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ) সংঘটিত হতে পারে কিনা। লেখক এত অল্পখ্যাত যে তাঁর লেখা গল্পটি মনে আছে কিন্তু তাঁর নামটি মনে নেই। গল্পটি (উক্ত গল্পলেখকের জবানিতে) সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

শহরের বস্তি এলাকায় একটি খদ্দের বহুল রেস্তোরাঁ আর সরাই-খানার যুগ্ম সংস্করণ। মালিক ষণ্ডা চেহারার রুক্ষ চরিত্রের বেপরোয়া স্বভাবের একটি লোক। তার ডেরা এই সরাইখানারই একটি অংশ, খদ্দেরের আহার্য আর পানীয় সরবরাহ করার ছোকরাদের তদারক করে মালিকের তরুণী সঙ্গিনী। সে বিবাহিতা স্ত্রী কিনা জানা যায় না, জানবার জন্যে কারো মাথা-ব্যথাও নেই।

'চা বা কফি খেতে ঐ রেস্তোরাঁয় মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন ষণ্ডা মালিকটির ঘরে পিয়ানো বাজনা শুনে মুগ্ধ হলাম। আশ্চর্য বাজানো, আশ্চর্য নতুন ধরনের সুর-সৃষ্টি। আমি পিয়ানো সঙ্গীত প্রচুর শুনেছি, তাই শপ্যাঁ, মোৎসার্ট, বেটোফেন, ভাগনার প্রমুখ বিশিষ্ট সুর-স্রস্টাদের সৃষ্ট সেরা সেরা সুরগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম কিন্তু এই অনবদ্য সুরগুলি তাদের কোনটির সঙ্গে মিললো না। কে কবে এই অসাধারণ সুরের স্রষ্টা ?

'লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে প্রশ্ন করলাম, "পিয়ানো কে বাজাচ্ছিল।" লোকটি বললো, "আমিই বাজাচ্ছিলাম।" প্রশ্ন করলাম, "সুরগুলো তো সম্পূর্ণ নতুন মনে হচ্ছে। এগুলো পেয়েছ কোথায় ?" লোকটি বললো, "পাবো আর কোথায় ? নিজের মাথা থেকেই বার করেছি।" দেখলাম সুরগুলি যে অসাধারণ ভাল, সে বিষয়ে সে একে বারেই সচেতন নয়। লোকটা নিজেই জানে না সে কত বড় জিনিয়াস। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তার এই অসাধারণ সুরগুলো বিক্রী করে সে ভাল পয়সা পেতে পারে। কিন্তু সে তাতে উৎসাহিত হলো না, বললো, পয়সা সে তার এই রেস্তোরাঁ থেকে যা পায় তাই যথেষ্ট। সুর তার নেহাৎই শখের জিনিষ তা বেচে সে পয়সা রোজগার করতে চায় না।

'আমি একবার তার ঘরে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে তার সস্তা দামে কেনা ছোট কটেজ পিয়ানো বাজানো শুনলাম। ঐ চোয়াড়ে ষণ্ডা চেহারার অশিক্ষিত লোকটার হাতে পিয়ানো যে অমন মোহনীয় সুরে বাজতে পারে, তা নিজে প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

'এই অসাধারণ সঙ্গীত-শিল্পী আর সুরস্রষ্টা একদিন তার রেস্তোরাঁতেই এক পুলিশ কর্মচারীকে ছুরিতে ক্ষতবিক্ষত করে খুন করে বসলো। যে তরুণী রূপসীটি রেস্তোরাঁয় তার সঙ্গে থাকতো, তার প্রতি তার নিজের ব্যবহার মোটেও মধুর বা সদয় ছিল না, এমন কি তার গায়ে হাত তুলতেও সে কসুর করত না। তবু, মেয়েটি তার সঙ্গ

ছাড়েনি, কারণ তার সঙ্গীত প্রতিভা মেয়েটিকে মুগ্ধ করেছিল। পুলিশ কর্মচারীটি এক রাত্রে রেস্তোরাঁয় খেতে এসে ঐ মেয়েটিকে কাছে ডেকে তার গায়ে হাত দিয়ে অশোভন ইঙ্গিত আর উক্তি করেছিল, তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে রেস্তোরাঁর ঐ ষণ্ডা মালিক লোকটি তার মুরগি জবাই করবার ছুরি দিয়ে ঐ অশালীন আচরণকারী পুলিশ কর্মচারীটাকে নির্মম বীভৎসভাবে জবাই করেছিল।

'হাতেনাতে ধরা পড়ল সেই নির্মম খুনী। বিচার হলো আদালতে। তারপর একদিন জেলখানায় তার ফাঁসি হয়ে গেল। সেই এক ফাঁসিতে মৃত্যু হলো ছু'জনের—একজন আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্তী এক নৃশংস নরঘাতক, অন্যজন এক অসাধারণ প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত স্রষ্টা, যার মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের হলো অপূরণীয় ক্ষতি।'

অসাধারণ ভাল গল্পটি, যার অসাধারণত্বের অতি সামান্যই আভাস দিতে পারলাম এই চুম্বকে। যদি সেটুকুও পেরে থাকি গল্পটি এত জীবন্ত, যে আমার বিশ্বাস এটি বানানো গল্প নয়, লেখক বাস্তব চরিত্র এবং বাস্তব ঘটনাকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি সার্থক ছোট গল্পে স্থায়ী রূপ দিয়েছেন।

এই গল্পে দেখা যাচ্ছে, যে লোক সুরের গভীরে ডুবেছিল (তা না হলে অনবদ্য সুর সৃষ্টি করলে কি করে ?) সে ও ক্রাইম (আইনতঃ দণ্ডযোগ্য অপরাধ) করতে পেরেছিল। এ যদি সত্য হয় তাহলে এই সত্য ওস্তাদ গুল মহম্মদ এবং ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী, এই ছু'জন অসাধারণ গুণীর বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করছে।

অবশ্য এখানে বলা যায় যে, এই গল্পের নরঘাতী নায়কটি সুর সৃষ্টি করেছিল বটে কিন্তু সুরের ব্যাপারটা ছিল তার জীবনে একটি ফাউ মাত্র, ক্ষণিক, আত্মনিয়োগ সে করেনি। অর্থাৎ সঙ্গীত তার জীবনে প্রধান ছিল না। আবার অন্য দৃষ্টি কোণ থেকে একথাও বলা যায় যে, লোকটার এই হত্যাকর্মটিকে নারীর আত্মমর্যাদাহননকারীকে উচিত শিক্ষাদান বলেও ধরা চলে।

কিন্তু এ কাহিনী দুটি শুনিয়ে খাঁ সাহেবকে তাঁর বিশ্বাস থেকে টলাতে পারি নি। বরং তাঁর জেরায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম, ডাক্তার জেকিলের জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব খুব বেশি ছিল না। খাঁ সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ডাক্তার জেকিল সঙ্গীতে 'মস্ত' হলে কখনো মিষ্টার হাইড হতেন না, হতে পারতেন না। "বাচ্চা বয়স থেকে গানের নেশায় মেতে রয়েছি। জাগ্রত অবস্থায় বেশীর ভাগ সময় কোনো না কোনো রকমে গানের রিয়াজ করেছি। বোধ হয় এমন দিনও অনেক গেছে যেদিন আঠার ঘণ্টা রিয়াজ করেছি। এমন ভাবে গান নিয়ে যে মেতে থাকবে সে শয়তানি করার কথা ভাববে কখন? তারপর সুরে হৃদয় মজে গেলে মনে সুন্দরের প্রতি যে প্রেম জন্মায় সুন্দরের পূজারীর মনে, তার ফলে অপরাধের (ক্রাইম) প্রতি তার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জন্মায়—অপরাধ 'নীতিবিগর্হিত বলে নয়, অসুন্দর' বলে।"

একাধিক শিল্পী দেখেছি যারা শিল্পী হিসাবে যত মধুর, ব্যক্তি হিসাবে প্রায় ততই কাটখোট্টা। কিন্তু খাঁ সাহেব বড়ে গুলাম আলীর দেখলাম শিল্পীসত্তা এবং ব্যক্তি সত্তার ভেতর কোন বৈষম্য নেই, দুয়েতেই অসাধারণ মাধুর্য। আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে খাঁ সাহেব নানারকম তাল, বাট, সারগম, সুরবিস্তার ইত্যাদি করে দেখাচ্ছিলেন। কণ্ঠের দুরূহ অথচ মধু ঝরানো কসরতে অবিশ্বাস্য অনায়াস-দক্ষতা খাঁ সাহেবের। কিন্তু তিনি তবু বললেন, "সঙ্গীতে কসরতের স্থান খুব উঁচুতে নয়, রাগ সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে রাগরূপটিকে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তোলা, রাগের আত্মাটিকে শ্রোতার অন্তরে সঞ্চারিত করে দেওয়া।"

প্রশ্ন করলাম, "তাহলে আর এত পরিশ্রম করে কণ্ঠের কসরত আয়ত্ত করবার প্রয়োজন কি, খাঁ সাহেব?"

খাঁ সাহেব বললেন, "প্রয়োজন আছে বই কি। শিক্ষার্থীকে নানারকম কসরতের সাধনা করে কণ্ঠকে এমনভাবে নিজের বশে আনতে হবে, যেন তাকে দিয়ে যখন যেমন খুশী কাজ করিয়ে নেওয়া

যায়। কণ্ঠ হবে গায়কের আজ্ঞাবহ দাস।”

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে নবীন গায়ক কাশীনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন : কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর।
সাতটি যেন পোষা পাখি ॥

—কণ্ঠ সাধনায় সেইরকম সিদ্ধি লাভ করতে হবে।

“কসরতের সব রকম ক্ষমতা আয়ত্ত করবার সাধনা করতে হবে সঙ্গীত সাধককে” বলতে লাগলেন খাঁ সাহেব, “কিন্তু সেই আয়ত্ত ক্ষমতা শিল্পী কিভাবে প্রয়োগ করবেন, শিল্পীর উৎকর্ষ প্রকাশ পাবে তাই দিয়ে। আগাগোড়া শুধু কসরতী গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নয়, যেখানে সেখানে কসরত প্রয়োগও শিল্পসম্মত (artistic) নয়, কিন্তু ‘যথাস্থানে’ চমক লাগিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কসরতের যথার্থ শিল্পসম্মত সার্থকতা আছে, কারণ তাতে একঘেয়েমির জড়তা দূর হয়ে যায়। একঘেয়েমি জিনিসটা সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গতার লক্ষণ নয়।”

খাঁ সাহেবের এই অতি মূল্যবান কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখবার এবং ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। কারণ, একাধিক খ্যাতিমান ‘উচ্চাঙ্গ’ ওস্তাদ মনে মনে এই ধারণাটাই পোষণ করেন বলে মনে হয়, যে, বিরক্তিকর এক ঘেয়েমিই ওস্তাদির মাপকাঠি। এ ধরনের উচ্চাঙ্গ শ্রোতার ও অভাব নেই, যাঁরা উঁচুদরের ‘সমঝদার’ বলে নাম কিনতে চান অথবা নিজেদের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান, এবং মনে করেন গায়কের বিরক্তিকর একঘেয়েমি যিনি যত বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন তিনি তত বড় সংগীত-বোদ্ধা, একে এক ধরনের ‘স্নবারি’ (snobbery) বলা যেতে পারে।

একজন সংগীত শাস্ত্রকার বলেছেন : “রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ।” রাগের কাজ হচ্ছে রঞ্জন করা। তাই গায়ক যখন একটি রাগ পরিবেশন করতে গিয়ে শ্রোতাদের রঞ্জন করার পরিবর্তে এক ঘেয়েমির বিরক্তি উৎপাদন করেন তখন তিনি রাগের প্রতি সুবিচার করেন না।

বড় বড় জমায়েতে রাগসঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে আলোচনায় দেখলাম খাঁ সাহেব কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ জানেন তাদের ভেতর একটি হচ্ছে পাবলিক (public) আর একটি (conference) কনফারেন্স ; 'পাবলিক' 'সাধারণ শ্রোতা' রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁদের চর্চা, অনুশীলন বা কোনরকম বিশেষ জ্ঞান নেই, অর্থাৎ যাঁরা বোদ্ধা বা সমঝদারের পর্যায়ে পড়েন না।

যথাসম্ভব সবিনয়ে এবং মোলায়েম ভাবে আমার মনোভাব ব্যক্ত করে প্রশ্ন করলাম "খাঁ সাহেব, পাবলিক রাগ সঙ্গীত কতটুকু বোঝে ?" আমার এই প্রশ্নের মধ্যে 'পাবলিক' বা মাস (mass) অর্থাৎ সাধারণ শ্রোতাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিত উন্নাসিকতা ছিল।

খাঁ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। আমার প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন উষ্মায় যেন কৌতুক বোধ করেই তিনি বললেন, 'বোঝা' ব্যাপারটার ওপর আমি বড় বেশি জোর দিচ্ছি, রাগ সঙ্গীতে শ্রোতাদের পক্ষে বোঝাটা তত বড় কথা নয়, যত বড় কথা হচ্ছে রসের অনুভূতি। রাগসঙ্গীতের আসল লক্ষ্য 'দিমাগ' নয়, 'দিল'—মগজ নয়, হৃদয়। যাঁরা সমঝদার শ্রোতা অর্থাৎ রাগ সঙ্গীতের ব্যাকরণাদিতে যাঁদের স্থান আছে, রাগ সঙ্গীতের আবেদন তাঁদের মগজে এবং হৃদয়ে, তাঁরা রাগ সঙ্গীতের পরিবেশন শুনে মগজ দিয়ে বুঝবেন, হৃদয় দিয়ে তার রস অনুভব ও উপভোগ করবেন। তাঁদের মগজ দিয়ে বোঝা অর্থাৎ সমঝদারিতা (যা থেকে 'পাবলিক' অর্থাৎ সাধারণ শ্রোতারা বঞ্চিত) তাঁদের হৃদয়ের রসানুভূতিকে গভীর করে তুলবে।

সমঝদার শ্রোতারা শোনেন কান, মগজ আর হৃদয় দিয়ে, সাধারণ শ্রোতারা শোনেন প্রধানতঃ কান আর হৃদয় দিয়ে।

এরপর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মানে অক্ষুণ্ণ রেখেও তাকে জনপ্রিয় করা যায় কিনা সে বিষয়ে একটু সংশয় প্রকাশ করায় খাঁ সাহেব হয়ত সন্দেহ করেছিলেন আমি ইঙ্গিত করছি যে তিনি জনপ্রিয়তার লোভে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।

জবাবে তিনি বলেছিলেন সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গতা এবং জনপ্রিয়তা

পরস্পর বিরোধী এমন মনে করা অনুচিত এবং সঙ্গীত জগতে জনপ্রিয়তার শ্যাম এবং রাগ বিশুদ্ধতার কূল দুটোই এক সঙ্গে রাখা অসম্ভব নয়। এবং সে গান পরিবেশনও যে কতো শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত হয় তা খাঁ সাহেবের কথায় ফুটে উঠল ঃ

"বড় বড় জমায়েতে যখন পাবলিককে গান শোনাই তখন আমার সঙ্গীত পরিবেশন পদ্ধতি একরকম, যখন ছোট ঘরোয়া আসরে গান শোনাই, যেমন ধরুণ, মন্মথবাবু (মন্মথনাথ ঘোষ) বা জ্ঞানবাবুর (জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ) বাড়িতে, যেখানে শ্রোতারা বেশির ভাগই খানিক পরিমাণে সমঝদার অর্থাৎ রাগসঙ্গীত 'বোঝেন' তখন অন্য রকম। এই সব ছোট আসরে আমি একটা রাগই একটানা দেড় ঘণ্টা দুঘণ্টাও নিশ্চিন্ত মনে গাইতে পারি, কিন্তু সাধারণ বড় জমায়েতে অতটা স্বাধীনতা আমি নিতে পারি না। যে ধরনের শ্রোতামহল যতটুকু নিতে পারেন তার কাছে ঠিক ততটুকু পরিবেশন করাই যথার্থ শিল্পীর উচিত। পরিবেশনের দোষে পাবলিকের মনে যদি রাগ সঙ্গীতের প্রতি প্রেম না জন্মায়, বিরক্তি বা অশ্রদ্ধা আসে, তাহলে সে দোষ পাবলিকের নয় শিল্পীর। রাগ সঙ্গীতকে তার স্বরূপ থেকে ভ্রষ্ট না করেও আমি জনপ্রিয় করে তুলব, আমার পরম-প্রিয় সাধনার জিনিস রাগ সঙ্গীতের প্রতি এই আমার মহান দায়িত্ব আমি অনুভব করি।"

এই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গেই পালন করে গেছেন। বড় 'সাধারণ' আসরে গাইবার সময় মাঝে মাঝে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিতেন সময়সীমা অতিক্রম করে ফেলছেন কিনা। প্রত্যেকটি গান তিনি এমন সময়ে শেষ করতেন, যখন শ্রোতাদের মনে হত, "আহা কি চমৎকার, আর একটু হলে ভাল হত।" তাঁর গান শুনে সাধারণ শ্রোতাদের কখনো মনে হত না, "আর না বাপু, গানটা থামাও লক্ষ্মী।" (সুকুমার রায়ের "আবোল-তাবোল" গ্রন্থে ভীষ্মলোচন শর্মার গান শুনে তার শ্রোতারা যেমন বলেছিলেন)।

যথার্থ শিল্পী-জনোচিত এই পরিমিতি বোধ এবং সংযম বড়ে গুলামের ছিল এবং সেই কারণেই তিনি অতবড় শিল্পী হতে পেরেছিলেন অথবা বলা যায় তিনি অতবড় শিল্পী ছিলেন বলেই অমন মাত্রাজ্ঞান তাঁর ছিল। কোন্ গান কতক্ষণ গাইবেন, এমন কি একটি গানের বিভিন্ন অংশ কত মিনিট গাইবেন, তারও মোটামুটি রকম একটা ছক তাঁর আগে থেকেই ঠিক করা থাকত। সেই ছকের বাঁধা সময়সীমা পাছে নিজের অজ্ঞাতসারে অতিক্রম করে ফেলেন, সেই জন্য মাঝে মাঝে হাতঘড়িতে আড়চোখে সময় দেখে নিতেন তিনি। সম্মেলনে বা জলসায় মিশ্র শ্রোতাদের গান শোনাবার সময় শিল্পী সুলভ রসবোধের সঙ্গে সময় সচেতনতার অমন সুষ্ঠ সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই তিনি উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীতের জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় শিল্পীর সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতে এমন ব্যাপকভাবে জনগণকে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

জনপ্রিয়তায় শুধু মানব নয়, মানবেতর প্রাণীর ওপরেও তার প্রভাব অপরিসীম ছিল, তিনি বললেন সুরের মত সুর লাগাতে পারলে মানবেতর প্রাণীও সঙ্গীতের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বললেন একদিন করাচিতে বেলাভূমিতে একা বসে তিনি সুরের আলাপ করছিলেন একটা ছোট পাখি উড়ে এসে তাঁর কাঁধে বসল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথায়ও বসতে লাগল। তিনি লক্ষ্য করলেন গান থামলেই পাখীটা দেহ থেকে নেমে পড়ে। আর গান ধরলেই ফিরে এসে তাঁর মাথায় বা কাঁধে এসে বসে। পাখিটার এই অদ্ভুত সঙ্গীত-প্রীতি দেখে খাঁ সাহেব বেশ কিছুক্ষণ বসে গান গাইলেন। যতক্ষণ গেয়েছিলেন, ততক্ষণ পাখীটা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। গান থামিয়ে তিনি যখন তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হলেন তখন পাখীটা উড়ে চলে গেল। খাঁ সাহেবের ভাষায়, "পাখিটার সেই আবির্ভাব আর তিরোধান আমার কাছে বেশ একটু রহস্যময় মনে হয়েছিল—যেন কোন সঙ্গীত রসিকের আত্মা গান শুনতে এসেছিল,

গান শুনে চলে গেল।"

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ইংরাজী বই পড়লাম, তাতে একটি পোষা সীলের (seal) আশ্চর্য্য সঙ্গীতানুভূতির বর্ণনা আছে। তাতে লেখিকা লিখেছেন তাঁর একটি বাঁশের বাঁশী ছিল, তিনি এই বাঁশী বাজাতে শুরু করলেই 'লোরা' (ঐ পোষা সীলটির নাম) এসে এসে তাঁর সামনে বসে গভীর ভাবাপন্ন হয়ে সুর শুনত, লেখিকার নিজের ভাষায়—

"It seemed to me that she went that a trance; her eyes had a faraway look and she seemed quite oblivious of every thing except the music. As long as, I continued to play she sat there, still and absorbed, never attempting to sing. And this was the way pipe music always affected her."*

অর্থাৎ "আমার মনে হত তার যেন সমাধি অবস্থা হয়েছে। তার চোখে একটা দূরায়ত দৃষ্টি এসে যেত। দেখে মনে হত শুধু এই সঙ্গীত ছাড়া আর সব কিছু যেন তার চেতনা থেকে মুছে গেছে। আমি যতক্ষণই বাঁশী বাজাতাম সে চুপ চাপ তন্ময় হয়ে বসে থাকত। বাঁশীর সুর সবসময় তার ওপর এই রকম কাজ করত।"

ওস্তাদ বড়ে গুলামের কথা ভাবলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কথা। আমার দেখা খাঁ সাহেবদের মধ্যে এই দুজনই বিরল (ইংরাজী ভাষায় giant) পর্যায়ে পড়েন। ৺আবদুল করিম খাঁ সাহেবের সামনে বসে গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

ফৈয়াজ ছিলেন গৌরবর্ণ দোহারা চেহারার রাশভারি পুরুষ, চলাফেরার হাবভাবে কথাবার্তায় রাজসিক, ইংরাজী ভাষায় 'ম্যাজেস্টিক' (majestic) গুরুগাম্ভীর্য ছিল তাঁর বিশেষত্ব। তিনি যখন গাইতেন, তখন মন্ত্রমুগ্ধ আমাদের মনে হত তিনি যেন ভক্তদের

"*Seal Morning"—By Rowena France
(Unicorn Books : Hut chinson's)

প্রতি প্রসন্ন হয়ে উর্ধ্ব থেকে সঙ্গীতের করুণধারা বর্ষণ করছেন। অনুভব করতাম তিনি বিরাট, তিনি অনন্য, তাঁর এবং আমাদের মাঝখানে রয়েছে একটা অনতিক্রম্য দূরত্বের ব্যবধান।

গুলাম আলী ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায়, দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রস্থে বেয়াড়া রকম বড়, দেহের উর্ধ্ব ভাগের অনুপাতে ছোট তাঁর পা দুটি দেখলে মনে হয় খাঁ সাহেব বসে পড়ে ওপরের চাপ থেকে রেহাই দিলে তারা হাঁপ ছেড়ে বেঁচে খুশি হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই বিপুল দেহভার নিয়ে একবার বসে পড়লে, বিশেষ করে সোফায়, পরের সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াতে তাঁকে বেশ একটু বেগ পেতে হত।

কিন্তু তাঁর গানের আলোকে ঐ রূপহীন দেহভারই অসাধারণ সঙ্গীতের প্রতীকিরূপে আমার চোখে অপরূপ লাগত। তাঁর বিশেষত্ব ছিল রাশভারি রাজসিকতা নয়, অন্তরঙ্গ অমায়িকতা। তিনি গান গাইতেন আমাদেরই একজন হয়ে, আমাদেরই মধ্যে বসে। ফৈয়াজ ছিলেন অ্যারিষ্টোক্র্যাট, গুলাম আলী (democrat) ডেমোক্র্যাট।

কথায় কথায় আবদুল করিম ও ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গ উঠল, দেখলাম এই দুজনকে কোন কোন মহলে গুলাম আলীর চাইতে উচ্চ-তর শ্রেণীর শিল্পী বলা হয়ে থাকে, এ খবর গুলাম আলী সাহেবের অজানা নয়। এ বিষয়ে তিনি যা বললেন তাতে দম্ভের লেশমাত্র ছিল না, তেমনি ছিল না বৈষ্ণবের বিনয়ের বাড়াবাড়ি। চমৎকার লাগল যখন তিনি বললেন, "অবদুল করিম অবদুল করিম, ফৈয়াজ ফৈয়াজ। এঁদের আর দ্বিতীয় হবে না, হতে পারেনা। আমি আমার সাধনায় আপনাদের স্নেহধন্য গুলাম আলী হয়েছি। এই গুলাম আলীও আর দ্বিতীয় হবে না। গুণীদের ভেতর কে বড় কে ছোট এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। প্রত্যেকেই অনন্য।"

মনে পড়ল একটি ছোট্ট ইংরাজি কবিতা—

"I do not want
With the greats to vie,
To enough for me
That I am I."

অর্থাৎ "বিরাট বা মহানদের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে চাই না। আমি যে 'আমি' হতে পেরেছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

রেকর্ডে শোনা আবদুল করিম খাঁ সাহেবের অতুলনীয় দরদভরা কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর যাদু সম্পর্কিত 'যমুনাকে তীর' গানখানা অবিস্মরণীয়। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে "মনমোহন ব্রিজকে রসিয়া" গানখানা শুনে ভুলে যেতাম খাঁ সাহেবের গান শুনছি, ছন্দোময় সুরের লীলায় মনে হত যেন চোখের সামনে ফুটে উঠেছে ব্রজবিহারী রসিক শ্রীকৃষ্ণের লীলাচাপল্য। এঁরা দু'জনই অসাধারণ উঁচু স্তরে উঠে শুধু সঙ্গীত সাধনাই করে গেছেন, জনপ্রিয় হবার জন্য তেমন মাথা ঘামান নি। কিন্তু জনপ্রিয় হবার জন্য সযত্ন সাধনা ছিল বড়ে গুলাম আলীর, এবং সে সাধনায় তিনি অসাধারণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এমন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি আর কেউ।

বাংলার (প্রধানতঃ কলকাতার) বিভিন্ন সম্মেলনে, জলসায়; আসরে যেসব গান গেয়ে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে

"হরি ওঁ তৎসৎ"

এ গানটি খাঁ সাহেবের মুখে অনেকবার শুনেছি, প্রতিবারই মুগ্ধ শিহরিত হয়েছি, প্রতিবারই সমাপ্তিতে মনে হয়েছে বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় আকাশবিহারী স্কাইলার্ক পাখিকে প্রশংসা করেছেন এই বলে, যে, সে হচ্ছে True to the kindred points of heaven and home, অর্থাৎ আকাশ আর পৃথিবী দুয়েরই প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা আনুগত্য সমান। দুয়েরই মর্যাদা সে সমানভাবে রক্ষা করে। "হরি ওঁ তৎসৎ"-এর অতুলনীয় গায়ক বড়ে গুলাম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বর্ণিত স্কাইলার্কধর্মী; এই মর্মস্পর্শী গানটিতে তিনি শিল্প উৎকর্ষের সঙ্গে ব্যবসা বুদ্ধির চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। পেশাদারী সঙ্গীত জীবনের জন্য তিনি যে ভৌগলিক ক্ষেত্রটিকে নিশ্চিত এবং সর্বাপেক্ষা লাভজনক তাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

'সেথা একদিন বিরাম বিহীন
মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি'

দুনিয়াদারিতে পরিপক্কবুদ্ধিশিল্পী গুলাম আলী বুঝে নিয়েছিলেন ওঙ্কারের সুরেলা ঝঙ্কার, বিশেষ করে তাঁর মতো একজন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে এদেশে শতকরা আটানব্বই জন শ্রোতাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘায়েল করবে। তাই তিনি তাঁর গানের তূণে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন তাঁর অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র ঃ

"হরি ওঁ তৎসৎ"

এ গান তিনি যে আসরেই গেয়েছেন, সে আসরই মাত করেছেন, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে এই গানখানিকে প্রায় নিখুঁতভাবেই আপনার করে নিয়েছিলেন শিল্পী গুলাম আলী। তাঁর মুখে ওই আশ্চর্য্য গানখানা শুনবার সময়ে মনেই থাকত না তিনি খাঁ সাহেব ; মনে হত তিনি ওঁকার মন্ত্রে দীক্ষিত।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের অসামান্য সঙ্গীত দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডিত্যও ছিল। তাঁর সেই পাণ্ডিত্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতির অমূল্য ক্রমিক পুস্তকমালিকা রচনায় এবং সংকলনে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে প্রচুর সাহায্য করেছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্য ছিল না বড়ে গুলামের। রাগ রাগিণীর ব্যাকরণ বা তত্ত্ব নিয়ে বুদ্ধিপ্রধান (intellectual) আলোচনার মানসিকতা তাঁর ছিল না, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একান্তভাবে এবং ঐকান্তিকভাবেই প্রয়োগশিল্পী।

সঙ্গীতে প্রয়োগই (demonstration) প্রধান কথা, ব্যাকরণ বা তত্ত্ব গৌণমাত্র, পণ্ডিত হয়েও এই মতই পোষণ করতেন অসামান্য প্রয়োগ শিল্পী ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। তিনি 'প্রেমপিয়া' ছদ্মনামে গান রচনা করতেন এবং তাঁর তৈরি উপমাগুলি থেকে তাঁর প্রত্যুৎপন্ন কবিত্বরস আস্বাদন করা যায়। ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেবের ও যে কবি মন ছিল তার প্রমাণ রয়ে গেছে 'তাঁর সবরঙ্গ'

ছদ্মনামে রচিত এবং সুর সংযোজিত বহু গানে।

কথা প্রসঙ্গে নীলরতনবাবু আর একজন গুলাম আলীর কথা তুললেন, কিছুদিন আগে যিনি কলকাতার কয়েকটি আসরে গেয়ে ছিলেন 'ছোটে গুলাম আলী' নামে। তাঁর গান ছিল এত নীচু স্তরের, যে তিনি একটি বিখ্যাত নামের সুযোগ নিয়েও সুবিধা করতে পারেন নি। শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

শুনে খাঁ সাহেব বললেন, "সঙ্গীতের জগতে ফাঁকি বা চালাকি দিয়ে কিছু হবার উপায় নেই। খাঁটি এবং প্রচুর সাধনা চাই। সেই সঙ্গে খোদার মেহেরবানিও চাই, তবে সাধনার ঐকান্তিকতা থাকলে খোদার মেহেরবানিতে কার্পণ্য হয় না।" তারপর সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে বললেন যে যদি তিনি সত্যিকারের সাধনা করে যান তবে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তিনি সাফল্য লাভ করবেন। সাধনা সাচ্চা হলে খোদা নিরাশ করেন না।

কব্জির দিকে তাকিয়ে দেখলাম খাঁ সাহেবের সঙ্গে নানা আলোচনায় দেড় ঘণ্টার বেশী সময় অতিবাহিত করেছি, এবার বিদায় নেবার উদ্যোগ না করাটা অনুচিত হবে। বিদায় অনিচ্ছুক হৃদয়ে তাই বললাম, খাঁ সাহেব বিদায় নেবার আগে আপনার ছবি তুলব। আপনি যদি দয়া করে এই ফরাসে এসে বসেন।"

খাঁ সাহেব কৌতুকভরা কণ্ঠে হেসে বললেন, "এই তো মুশকিল করলেন। আমার এই বপুটি নিয়ে একবার গ্যাঁট হয়ে বসলে যেমন ওঠা মুশকিল, তেমনি একবার উঠলে বসা মুশকিল।"

যাই হোক, আমরা খাঁ সাহেবকে ধরাধরি করে আরাম কেদারা থেকে তুলে নিয়ে জানালার ধারে ফরাসের উপর বসিয়ে দিলেন। শিশুর মত খুঁশ মেজাজ খাঁ সাহেবের পর পর দুটি ছবি তুললাম। ঠিক করলাম তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ছবিটি একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ধরতে হবে। তিনি চশমা পরে একটি চিঠি পড়ার ভঙ্গীতে বসলেন, 'আমি ছবি তুলতে উদ্যত, এমনি সময় হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে গৃহস্বামীর ছোট্ট নাতি আর ছোট্ট নাতনী এসে খাঁ সাহেবের

দু'পাশে বসে পড়ে কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল তিনি এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছেন।

খাঁ সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাদের বললেন, "আরে আরে তোরা শিগগির সরে যা বাছা। দেখছিস না বাবুজি আমার ছবি তুলছেন?"

আমার মনে হল ঈশ্বরই যেন যথাকালে দুটি দেবশিশুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দুই পাশে দুই ক্ষুদে শিশু মাঝখানে বুড়ো শিশু বড়ে গুলাম —চমৎকার ছবি হবে। বললাম, "ওদের থাকতে দিন খাঁ সাহেব।"

বোতাম টিপে দিলাম, ছবি উঠে গেল। এরপর আমাদের বন্ধু পাকা পেশাদারী ফোটোগ্রাফার দুটি ছবি তুললেন, একটি খাঁ সাহেবের একার এবং একটি আমাদের সকলের। খাঁ সাহেবের ডাইনে রইলেন তাঁর ভাই ঠুংরি গায়ক বরকত আলী, বাঁয়ে নীলরতন বাবু আর আমি। আমাদের অনুরোধে পাঞ্জাবীর উপর একটি শাল জড়িয়ে গোঁফ দুটিকে চুমড়ে নিলেন খাঁ সাহেব।

বললাম, "খাঁ সাহেব, আপনার একটি বাণী আমাদের লিখে দিন" সঙ্গে কাগজ আর ফাউন্টেন পেন নিয়ে আসা হয়েছিল, দিলাম তাঁর হাতে।

এবার যেন আরো বিপদে পড়লেন খাঁ সাহেব। বললেন, "ক্যা লিখুঁ, ভাই সাহাব? মুঝে তো পড়না লিখনা নহী আতা।"

তারপর বললেন, 'আপনাদের যে একটি কথা আছে 'গানাৎ পরতরং নহি', এটা শুধু কথার কথা নয়, বড় সত্যি কথা।"

যাঁর কণ্ঠে অনবদ্য "হরি ওঁ তৎসৎ" গান শুনে বহুবার রোমাঞ্চিত এবং ভক্তি রসে আপ্লুত হয়েছি, তাঁর মুখে "গানাৎ পরতরং নহি" শুনে বিস্মিত হলাম না।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, স্থির হয়ে ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। পরিস্কার বুঝতে পারলাম আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ বাণী প্রার্থনা তাঁর শিল্পী হৃদয়কে অভিভূত করেছে। তিনি তাঁর সমগ্র সঙ্গীত জীবনের অভিজ্ঞতায় লব্ধ সত্যটি বাণী রূপে উচ্চারণ করলেন:

"সুরমে খুদা হ্যায়।"

অর্থাৎ "সুরে ঈশ্বর আছেন।" ঈশ্বর আমাদের যত দান দিয়েছেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে গান, কারণ গানের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে সবচেয়ে কাছে পাই, ঈশ্বর যে কত দয়ালু, গানই তার প্রমাণ।"

খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র উর্দু হরফে বাণীটি লিখে দিলেন আমাদের কাগজে, তার তলায় সই করে দিলেন ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী। সই শেষ হবার আগেই আর একবার ক্লিক করলেন ফোটোগ্রাফার মনো মিত্র। তাঁর তোলা সেই ছবিটি এবং আমার তোলা ছুই পাশে ছুই শিশুসহ শিশু প্রেমিক খাঁ সাহেবের ছবিটি আমাদের স্মৃতির অ্যালবামে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে রয়েছে।

তারপর তাকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমরা।

এরপর বছর ছুই বাদে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘতর সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল কলকাতার বেকবাগান অঞ্চলে এক মুসলিম ধনী ভবনের তেতলায়। সেবার গিয়েছিলাম নিছক ব্যক্তিগত -ভাবে নয়, একটি ইংরাজি দৈনিক পত্রের হরফ থেকে, সঙ্গে ছিলেন 'হিজ মাস্টার্স ভয়েসে'র প্রচার সচিব বন্ধুবর সন্তোষ কুমার দে। সন্ধ্যা থেকে রাত নটা পর্যন্ত খাঁ সাহেবের সঙ্গে নানা রকম আলাপ চলছিল। এবার তিনি ছিলেন নানা ভক্ত পরিবৃত, প্রথম বারের মত একান্তে পাইনি তাঁকে তাহলে ও আড্ডাটা ভালোই জমেছিল। কারণ কথোপকথন চলেছিল খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমাদের ছুজনের, বাকিরা সবাই ছিলেন নীরব শ্রোতা। রাগ সঙ্গীতের তত্ত্ব এবং দর্শন সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করেছিলাম প্রথমবার সাক্ষাৎকারে, এবার আর সেদিকে না গিয়ে খাঁ সাহেবের মুখ থেকে শুনতে চাইলাম তাঁর জীবনের নানা বিচিত্র স্মরণীয় ঘটনা, অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির কথা।

খাঁ সাহেবের প্রথম জবাব শুনে ভীষণ দমে গেলাম, কারণ তিনি বললেন, "ভাই সাহেব, আমার জীবনে বৈচিত্র্য নেই। বাচ্চা উমর থেকে গান শুরু করেছি, এখনো গানেই 'মস্ত' রয়েছি। এই বাকী জীবনটাও গান গেয়ে যাব। গান বই আমার জীবনে আর

কিছু নেই। আমার জীবনের যা কিছু উল্লেখযোগ্য বা স্মরণীয় সবই গান সম্পর্কিত।”

বললাম, “আপনার সঙ্গীত জীবনেরই স্মৃতিকথা কিছু শোনান, খাঁ সাহেব।”

কিছু কিছু আপনা থেকে, কিছু কিছু আমাদের প্রশ্নের জবাবে খাঁ সাহেব তাঁর সঙ্গীত জীবনের এমন অনেক বিচিত্র কথা আমাদের শোনালেন যা মনে রাখবার মতো, লোককে শোনাবার মতো, লিখে রাখবার মতো। মানুষ গুলাম আলীকে সেদিন যেন আরও গভীর-ভাবে, অন্তরঙ্গভাবে পেলাম, অনুভব করলাম বড়ে গুলাম আলী শুধু একজন আশ্চর্য গায়ক নন, তিনি একজন আশ্চর্য মানুষ। যাঁরা শুধু গায়ক বড়ে গুলামের পরিচয় পেয়েছেন, মানুষ বড়ে গুলামের পরিচয় পাননি। তাঁরা জানেন না কি সম্পদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত।

চলে আসবার আগে বললাম, খাঁ সাহেব আপনার কণ্ঠ ঈশ্বরদত্ত। এর তুলনা নেই।

শুনে খাঁ সাহেব আমার ভুল শুধরে দিয়ে বলেছিলেন “শুধু কণ্ঠ কেন, সবকিছুই তো খুদার দান এবং তিনি যা দিয়েছেন তা ফিরিয়েও নিতে পারেন।” তাঁর উক্তির শেষ অংশটুকু যে তাঁর জীবনের শেষ ভাগে নিদারুণ ভাবে সত্য হবে তা তখন কল্পনাও করতে পারিনি। কিছুদিন পক্ষাঘাতে শয্যাশয়ান অবস্থায় কাটিয়ে ১৯১৯ সালে ৬৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। তার চাইতে বড়ো মর্মান্তিক দুঃখের বিষয়, পক্ষাঘাত এই সুরসম্রাটের কণ্ঠ থেকে চির-দিনের জন্য সুর ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তিনি কোনরকমে জড়ানো উচ্চারণে আধ আধ কথা বলতে পারতেন মাত্র। তাঁর অনুরোধে তাঁর নিজের গানের রেকর্ড তাঁকে বাজিয়ে শোনানো হত। নিজের অতীতে গাওয়া গান শুনতে শুনতে তাঁর দুচোখ বেয়ে নামত অশ্রু-ধারা তিনি বলতেন, “খুদা কি অমূল্য ধন তুমি আমার কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ।”

খবরের কাগজের পাতায় তাঁর শেষ দিনগুলির এই খবর পড়ে

ঈশ্বরকে বলতে পারিনি "এই করেছো ভালো নিঠুর হে, এই করেছো ভালো।" তাঁকে বলেছি, "হে ঈশ্বর, এই অমর সুর সাধককে তাঁর শেষকটা দিন সুরহারা করে কেন দুঃখ দিলে ?"

গুলাম আলী এসেছিলেন, গুলাম আলী চলে গেছেন, তাঁকে আব কখনো ফিরে পাব না।

বিরাটের যুগ বিগত, এখন চলছে মাঝারির যুগ, গানের জগতে আমরা বড় গুণী হয়ত পাব, কিন্তু খাঁ সাহেবের মত বিরাট পুরুষকে পাব বলে মনে হয় না। যদিও বা পাই, তাঁর মধ্যে গুলাম আলীকে পাব না। প্রত্যেক সার্থক গুণীই অনন্য ইংরাজীতে যাকে বলে 'ইউনিক' (unique) তাঁর কোন বিকল্প নেই। এক গুণীর অভাব অন্যগুণীকে দিয়ে মেটে না।

ওস্তাদ ভীষ্মদেব রহস্য

ভারতে হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের জগতে বিশিষ্ট মুস্‌লিম শিল্পী এবং গুরুরাই 'ওস্তাদ' নামে অভিহিত হন; হিন্দু সঙ্গীতাচার্যেরা ওস্তাদ নামে অভিহিত হন না, শিষ্যরা তাঁদের বলেন 'গুরুজি'।

এ ব্যাপারে সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯—১৯১৭) ছিলেন অনন্য ব্যতিক্রম। তাঁর শিষ্য এবং শিষ্যারা 'ওস্তাদ' বলেই সম্বোধন করতেন তাঁকে। কিন্তু কেন তাঁকে সম্বোধনের বেলায় এদেশী 'গুরুজি' শব্দের পরিবর্তে পরদেশী শব্দ 'ওস্তাদ ?'

আমার মনে হয় এর কারণ ভীষ্মদেবের সঙ্গীত ছিল ভারতের অন্য সব হিন্দু সঙ্গীতাচার্যদের সঙ্গীতের চাইতে একেবারে আলাদা জাতের, তাঁর অনন্য গায়ন-শৈলীতে ছিল পরদেশী আমেজের এমন কএটি যাদু, যা অন্য কোনো হিন্দু সঙ্গীতাচার্যদের গায়ন-শৈলীতে ছিল না।

আমার এই ধারণার কিছুটা আভাস আছে বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের উক্তিতে ঃ

"ভীষ্মদেবের গাইবার ধরণ ছিল আলাদা। তাতে বাংলার নিজস্ব ঢং তেমন ছিল না। তেমন কেন, আদৌ ছিল না বলাই ভাল। তাঁর তান বিস্তার এক দুর্বার গতিতে চলত, প্রতি পদক্ষেপেই চমক সৃষ্টি, —কোথায় যে তিনি কোন্ স্বর লাগাবেন কেউ জানেন না। অতি অনায়াসেই তিনি নানা দুরূহ পথ অতিক্রম করে আবার তাঁর গানের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতেন।···তাঁর সরগমও ছিল একটা আর্ট—শুনবার বস্তু। দুরূহ কর্তবগুলি তিনি অনায়াসে সম্পাদন করে যেতেন যেন এটা তাঁর একটা সাঙ্গীতিক খেলা মাত্র। কন্‌জার্ভেটিভ (রক্ষণশীল) সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে যে একমত হতেন তা নয়।"

ভীষ্মদেবের অনন্যতার সার্থক বিশ্লেষণ করে রাজ্যেশ্বর বাবু আরো বলেছেন, "তিনি ওস্তাদ বদল খাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর ধারা কি রকম

ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। তবে এটুকু বুঝতুম যে বাংলায় এই ধরনের গায়কী নতুন। এত স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা নিয়ে খেয়াল গান বাংলায় আর কেউ করতে সমর্থ হয় নি। এমন প্রতিভাও ছিল দুর্লভ। ভীষ্মদেব যে ঠুংরি গাইতেন, তাতেও ছিল অসামান্য স্বকীয় সৌন্দর্য। প্রকৃতপক্ষে ভীষ্মদেব এই বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের জন্যই এত খ্যাতি লাভ করেছিলেন।"

ভীষ্মদেবের সঙ্গীত-শৈলীতে এই যে পরদেশী আমেজ (ইংরাজী ভাষায় বলা যেতে পারে exotic quality), যা তাঁর অনন্যতার একটি প্রধান উপাদান (element), তার প্রধান উৎস ছিল তাঁর প্রধান সঙ্গীত-গুরু খলিফা বদল খাঁ (১৮৩৪-১৯৩৭) সাহেবের তালিম।

ওস্তাদ বদল খাঁ ছিলেন বহু ওস্তাদের গুরু বা গুরুস্থানীয়, তাই তিনি 'খলিফা' নামে অভিহিত হতেন।

তিনি পানিপথের বিখ্যাত গায়ক ছাঙ্গে খাঁর পৌত্র। ওস্তাদ ছাঙ্গে খাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হলেন তাঁর পুত্র হায়দার খাঁ। কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের ঘরানায় সারেঙ্গীর সাধনা চালু করেন। তাঁর কণ্ঠ-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অসামান্য সারেঙ্গী বাদনের খ্যাতিও এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ তাঁকে সসম্মানে বাদশাহী দরবারে আহ্বান করে এনেছিলেন এবং তাঁর অসামান্য গুণের মর্যাদা উপলব্ধি করে তাঁকে 'খলিফা' উপাধি দিয়েছিলেন। ওস্তাদ হায়দার খাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সঙ্গীত-শিষ্য বদল খাঁ। চাচা হায়দরের সঙ্গে বদল খাঁ নিয়মিত ভাবেই দরবারে যেতেন এবং চাচা ও অন্যান্য বড় বড় ওস্তাদের গান শুনে এবং তাঁদের সঙ্গে সারেঙ্গী বাজিয়ে তাঁদের সেরা সেরা গানগুলি আয়ত্ত করে নিতেন। এই ভাবে বেড়েই চলল বদল খাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডারে মূল্যবান সংগ্রহ।

কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ চরম বিপদ টেনে আনল তাঁর জীবনে। বিদ্রোহীদের বন্ধু বলে ইংরাজ রাজপুরুষেরা বৃদ্ধ

বাহাত্বর শাহকে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন শহরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর দুই পুত্রকে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করলেন। নির্মম কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁরা বহু নিরীহ মানুষকেও হত্যা করলেন। ওস্তাদ হায়দার খাঁ এবং বদল খাঁ-ও ইংরাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। তাঁদের ফাঁসির হুকুমও হয়ে গেল। তাঁদের সঙ্গীতের ভক্ত একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন ইংরাজদের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। তিনি বড়লাট সাহেবকে বোঝাতে পারলেন হায়দার খাঁ এবং বদল খাঁ দরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শুধুমাত্র সঙ্গীতশিল্পী রূপে—এরা সঙ্গীত সাধক, বিদ্রোহের সঙ্গে এঁদের কিছুমাত্র যোগ নেই।

ফাঁসির আদেশ মকুব হলো, মুক্তি পেলেন ওস্তাদ হায়দার খাঁ এবং বদল খাঁ। গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া ছিলেন ইংরাজদের বিশ্বাসভাজন মিত্র, সিপাহীদের বিদ্রোহে তিনি মদৎ দেন নি। দরবারের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ খাঁ তখন লোকান্তরিত, দরবারের আসর জমিয়ে রয়েছেন তাঁর তিন সুযোগ্য শিষ্য তিন ভাই হদ্দূ খাঁ হস্সু খাঁ এবং নাথু খাঁ। দক্ষ সারেঙ্গী বাদক বদল খাঁ এই অসাধারণ তিনজন গায়কের সঙ্গেও নিয়মিত সারেঙ্গী সঙ্গতের পরম সুযোগ পেলেন। ফলে গোয়ালিয়র ঘরানার এই তিন বিরাট গায়কের সঙ্গীত-ঐশ্বর্য সংগৃহীত হলো বদল খাঁর সঙ্গীত ভাণ্ডারে।

গোয়ালিয়র থেকে হায়দর খাঁ এবং বদল খাঁ গেলেন রামপুরে। সেখানে নবাবের দরবার উজ্জ্বল করে রয়েছেন তানসেনের কন্যা-বংশীয় বীণকার আমীর খাঁ। নবাব সাহেব ওস্তাদ হায়দার খাঁ এবং তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র-শিষ্য বদল খাঁকেও সাদরে দরবারে গ্রহণ করলেন।

রামপুর থেকে আগ্রায় গিয়ে হায়দার খাঁ সেখানেই দেহ ত্যাগ করেন। বদল খাঁ আগ্রাতেই থাকেন ১৮৯৯ পর্যন্ত। তারপর কলকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী ধনকুবের দুলিচাঁদ বাবুর প্রচেষ্টার ফলে তিনি কলকাতায় আসেন এবং দমদমে দুলিচাঁদ বাবুর বাগান

বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। ছুলিবাবুরই প্রচেষ্টায় তিনি কলকাতায় সঙ্গীত সমাজে সুপরিচিত হলেন এবং অনেক সঙ্গীত-সাধক সুযোগ পেলেন তাঁর কাছে তালিম পাবার। খলিফা বদল খাঁর পত্নী বিয়োগ ঘটেছিল তিনি কলকাতায় আসবার আগেই। কলকাতায় এসে তিনি অতি সাধারণ অনাড়ম্বর ভাবে একক জীবন যাপন করতেন। তাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডার যেমন ছিল অফুরন্ত, তেমনি 'চিজ' দিতে তিনি কিছুমাত্র কার্পণ্য করতেন না। ১৯৩৭ সালে দিন কয়েকের জন্য আগ্রায় গিয়ে সেখানেই তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম: গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), অমিয়নাথ সান্যাল, শচীন দাস মতিলাল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। আমার মনে হয় খলিফা বদল খাঁ সাহেবের তালিমের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯—১৯৭৭)।

ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৮ই নভেম্বর ১৯০৯ তারিখে হুগলী জেলার ইতিহাসখ্যাত পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী সরাই গ্রামে। পিতা আশুতোষ ছিলেন কলকাতার র‍্যালি ব্রাদার্সের কর্মী। অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি ঠাকুর ঘরে পূজা পাঠে নিরত থাকতেন। মাতা প্রভাবতী সাংসারিক কাজের অবসরে দৈনিক এক লক্ষ নাম জপ করতেন। এ হেন পিতামাতার সন্তান আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আশুতোষবাবু তাঁর এই দ্বিতীয় পুত্রটির জন্মকালে মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব পড়ছিলেন, তাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন ভীষ্মদেব। এই নামকরণে ছিল অসামান্য সার্থকতা, কারণ মহাভারতের ভীষ্মদেবের মতোই মহান আদর্শ-চরিত্র পুরুষ হয়েছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ভীষ্মদেব 'সীতাহরণ' যাত্রা গান শুনে এসে যাত্রার গানগুলির হুবহু অনুকরণ করে বাড়ির সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। এরপর বাড়িতে যখন গ্রামোফোন (তখন যাকে বলা হতো 'কলের গান') এলো, শিশু প্রতিভা ভীষ্মদেব রেকর্ডের গানগুলি

অনায়াসে গলায় তুলে নিয়ে গাইতে লাগলেন। এই পরিবারের একজন বন্ধু ভীষ্মদেবকে নিয়ে গেলেন তাঁর আত্মীয় এবং খলিফা বদল খাঁর শিষ্য তখনকার বিখ্যাত গায়ক এবং সঙ্গীত-শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে। বালক ভীষ্মদেবের অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়ে তাঁকে বেশ যত্ন করেই তালিম দিয়ে তৈরি করতে লাগলেন নগেনবাবু।

এগারো বছর বয়সে ভীষ্মদেবের উপনয়ন হলো, উপবীতের সঙ্গে তিনি গৈরিক বেশ ধারণ করে ব্রহ্মচারী হন। দীর্ঘ এগারো বছর ধরে তিনি গৈরিক বসন পরতেন এবং ঐ বেশেই বিভিন্ন আসরে গান গাইতে যেতেন।

ভীষ্মদেবের বয়স যখন বারো, তখন তাঁর কাকা তাঁকে নিয়ে গেলেন বেলেঘাটায় গ্রামোফোন কোম্পানির (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) তখনকার স্টুডিওতে। এখনকার মতো উন্নত মানের রেকর্ডিং ব্যবস্থা তখন ছিল না, রেকর্ডিং-এর জন্য গায়কদের একটি চোঙের সাম্‌নে মুখ রেখে গাইতে হতো। সে এক অস্বাস্তিকর অভিজ্ঞতা।

বালক ভীষ্মদেবের গান শুনে রেকর্ডিং বিভাগের অধিকর্তা ভগবতী ভট্টাচার্য বললেন, "এখনই ওর গান রেকর্ড করব। রিহার্শালের দরকার নেই।"

অনায়াসে চোঙের সাম্‌নে মুখ রেখে বালক ভীষ্মদেব পর পর গেয়ে দিলেন নিধুবাবুর দুটি টপ্পা গান: (১) সখি কি করে লোকেরি কথায়? (২) এত কি চাতুরি সহে প্রাণ?

এটিই ভীষ্মদেবের গানের সর্ব প্রথম রেকর্ড।

ভাবতে বিস্ময় লাগে তাঁর গানের সর্বশেষ রেকর্ডেও—১৯১৯ সালে "মেগাফোন" রেকর্ডে—ভীষ্মদেব নিধুবাবুর এই দুটি টপ্পা গানই গেয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের গানের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা ভেবে গ্রামোফোন কোম্পানির শ্রীবিমান ঘোষ, বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক, গায়ক, সুরশিল্পী এবং গীতিকার শ্রীহীরেন্দ্র বসু এবং ভীষ্মদেবের প্রিয় শিষ্য, মাসিক 'সুরছন্দা'-সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু চেষ্টা করেছিলেন ওস্তাদের আরো কিছু গান রেকর্ড করবার জন্য। কিন্তু কি এক রহস্যময় কারণে ভীষ্মদেব রেকর্ডে আর গান দিতে রাজি হন নি। আমার মনে হয় এ তাঁর প্রচার-নিস্পৃহ বৈরাগী মনের পরিচয়।

বদল খাঁ সাহেবের তালিমে কি করে এলেন ভীষ্মদেব, সেই কাহিনী বলি। একদিন গুরু নগেন্দ্র নাথ দত্তের ঘরে বসে ভীষ্মদেব হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছেন নগেন বাবুরই তালিম দেওয়া একখানা গান। নগেনবাবু তখন বাড়িতে নেই, ভীষ্মদেবের পাশে বসে গান শুনছেন নগেনবাবুর আত্মীয় শরৎবাবু, যিনি নগেনবাবুর কাছে ভীষ্মদেবের তালিম পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ভীষ্মদেব গান গাইছেন, এমন সময় বদল খাঁ সাহেব এসে হাজির, নগেনবাবুকে তালিম দিতে। ভীষ্মদেবের কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটল না এই অপরিচিত আগন্তুকের আগমনে। তিনি যেমন গাইছিলেন তেমনি গেয়েই চললেন আপন মনে। বৃদ্ধ ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব বসে বসে মশগুল হয়ে শুনতে লাগলেন এই অত্যাশ্চর্য বালক-শিল্পীর গান। বালক ভীষ্মদেবের গানখানা শেষ হতেই খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, "গাও বেটা, গাও। গানা বন্ধ্ কাহেঁ কিয়া ?"

শরৎবাবু বুঝতে পারলেন খাঁ সাহেবকে মুগ্ধ করেছে ভীষ্মদেবের গান। তাই মওকা বুঝে খাঁ সাহেবকে বললেন। "ওস্তাদ, আপনি একে তালিম দেবেন ?"

বদল খাঁ সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "হাঁ হাঁ, কেঁও নহী ?"

পিতা আশুতোষের একটু আপত্তি ছিল এই ভাবে এক ওস্তাদের কাছে নিয়মিত তালিমের ব্যবস্থায়, কারণ তাঁর ভয় ছিল এতে ছেলের লেখাপড়া গোল্লায় যাবে। নগেন দত্ত মশাইর কাছে অনিয়মিত ভাবে মাঝে মাঝে একটু আধটু শেখার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল না। অবশেষে ভীষ্ম-জননী প্রভাবতীর আগ্রহে তিনি মত দিলেন।

প্রথম গুরু নগেন দত্তের অনুমতি বা ছাড়পত্র না নিয়ে তাঁর

শিষ্যকে নিজের তালিমে আনা অশোভন হবে মনে করে খাঁ সাহেব নিজেই একদিন এসে নগেনবাবুর কাছ থেকে কালোকে চেয়ে নিলেন। ভীষ্মদেবের ডাক নাম কালো, এবং তাঁর বয়স তখন চৌদ্দ বছর।

খাঁ সাহেব নিয়মিত আসেন, তালিম দিয়ে চলে যান। শিষ্য তালিম চট্‌পট্‌ বুঝে নেন, কিন্তু তারপর সেই তালিমের 'রিয়াজ' বা অনুশীলনের দিকে শিষ্যের তেমন মনোযোগ দেখা যায় না দেখে ভীষ্মদেবের দাদা (সাত বছরের বড়) তারাপ্রসন্নবাবু খাঁ সাহেবকে নালিশ জানিয়ে বললেন শিষ্যকে একটু ধম্‌কে দিতে। খলিফা বদল খাঁ উত্তরে যা বললেন তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বললেন, "বাবুজি, ওকে কিছু বলবেন না। ওর রিয়াজ হয়ে গেছে। এখন দরকার শুধু ওকে চিজ বাত্‌লানো।"

অর্থাৎ রিয়াজ বা কণ্ঠ-সাধনা গত জন্মে সে প্রচুর করে এসেছে, এখন আমি শুধু তাকে আমার সঙ্গীত সংগ্রহ থেকে সেরা সেরা জিনিস বাত্‌লে দেবো, সে তা অনায়াসেই কণ্ঠে তুলে নেবে।"

আমি বদল খাঁ সাহেবের অন্যতম শিষ্য অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়কে ভীষ্মদেবের অসাধারণ দ্রুত তালিম গ্রহণ প্রতিভা সম্বন্ধে সপ্রশংস মন্তব্য করতে শুনেছি—স্বয়ং বদল খাঁ সাহেব বলেছিলেন, "অনেক জটিল দুরূহ চিজ কালো (ভীষ্মদেব) যত তাড়াতাড়ি বুঝে নিয়ে গেয়ে দেখিয়ে দেয়, তেমনটি আর কেউ পারে না।" এই কারণে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন কালোকে, এবং বজ্জাত যুযুৎসু প্রকৃতির তবল্‌চিকে জব্দ করার জন্য বেশ কিছু জটিল লয়ের বন্দিশ তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

সেণী ঘরানার বিখ্যাত সেতারী মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব একবার মত প্রকাশ করেছিলেন, "ভীষ্মের মতো musical brain (সঙ্গীতের মগজ) আমি আর দেখি নি।"

বাংলা সঙ্গীত আর কবিতা জগতের অসাধারণ পুরুষ কাজী নজরুল ইস্‌লাম ছিলেন ভীষ্মদেবের অসামান্য প্রতিভার অসাধারণ

সমঝদার ভক্ত—ভীষ্মদেবের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন একজন kindred soul, আত্মার আত্মীয়। ভীষ্মদেবকে তিনি সার্থক উপাধি দিয়েছিলেন 'সুর-সব্যসাচী'।

ভীষ্মদেবের সঙ্গীতে যে 'পরদেশী আমেজ'-এর কথা বলেছি, কাজী নজরুলও তার অতি সার্থক আমদানি করেছিলেন বাংলা গানের কথায় ও সুরে। প্রতিভার অনন্যতার দিক দিয়ে দুজনের মধ্যে কিছুটা মিল ছিল।

গীতিকার, সুরকার এবং রেকর্ড শিল্পীদের প্রশিক্ষক রূপে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কাজী নজরুল। তিনিই ১৯৩৩ সালে ভীষ্মদেবকে মেগাফোন কোম্পানিতে নিয়ে যান। ভীষ্মদেব ১৯৩৪ সালে বিবাহ করেন এবং ঐ সাল থেকেই তাঁর বিরাট সঙ্গীত প্রতিভার খ্যাতি বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে ছড়াতে থাকে। এই বছরই মেগাফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম দুটি হিন্দী রেকর্ড সঙ্গীত: 'মুখ মোর মোর মুসকাত যাত' (মালকোষ) এবং 'আজ আওরি আনন্দ করকে' (আশা)। এই রেকর্ডখানা বাংলার বাইরে ভীষ্মদেবের খ্যাতি বিস্তারে অসাধারণ সহায়তা করে। এই দুটি রেকর্ডের অসামান্য জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে মেগাফোন অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেকগুলি রেকর্ড ভারতের সঙ্গীত রসিকদের সামনে পেশ করেন: বহার আই রে (বাহার), ফুলবনকী গেঁদন ম্যায়কা (দেশী তোড়ী), পিউ পিউ রটত পপৈয়া (ললিত), অবহু লালন ম্যায়কা (বেহাগ), দুখবা ম্যায় কাসে কহুঁ (তিলক কামোদ), মতি মালনিয়া (কামোদ), বামন দেবতা (শংকরা), সেইয়াঁ তু এক বারি আজা (পিলু), পীর ন জানি রে (মালকোষ), ভলা মোরা (কাফী ভৈরবী), আঙ্গৈরী রুত বসন্ত (বসন্ত), রসিলি তোরী অখিয়াঁ (ভৈরবী), বরসে মেহরবা (গৌড়মল্লার), রুত বসন্ত (রাগেশ্রী-বাহার) ইত্যাদি।

রাগ-ভিত্তিক সুরে গাওয়া বাংলা গান কত উচ্চ মানের হতে পারে বোঝা যায় মেগাফোন রেকর্ডে ভীষ্মদেবের গাওয়া এই কয়েকটি গানে:

জাগো আলোক লগনে (রামকেলী), যদি মনে পড়ে (কাফী-ভৈরবী), নবারুণ রাগে (ভৈরবী), তব লাগি ব্যথা (দেশী তোড়ী), ফুলের দিন (জয় জয়ন্তী)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ভীষ্মদেবের 'তব লাগি ব্যথা' ও 'নবারুণ রাগে' এই দুটি বাংলা এবং 'মতি মালনিয়া' ও 'দুখবা ম্যায় কাসে' এই দুটি হিন্দী গানের রেকর্ড জাতি সংঘের সংস্কৃতি বিভাগের সংগ্রহে (UNESCO) আছে।

'মেগাফোন' কোম্পানির সঙ্গে শিল্পী এবং সঙ্গীত উপদেষ্টা রূপে যুক্ত থাকা কালে ভীষ্মদেব খনা, শকুন্তলা, শ্রীরামচন্দ্র, সিন্ধুবধ, মহানিশা, নল-দময়ন্তী, ফুল্লরা প্রভৃতি কয়েকটি পালা রেকর্ডে যে অপরূপ সুর-সংযোগ এবং সঙ্গীত পরিচালনা করে গেছেন, তাতে রয়েছে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার বহুমুখিতার (versatility) নির্ভুল স্বাক্ষর। রেকর্ডে পালা গানের বেশির ভাগ শ্রোতাই উচ্চাঙ্গ রাগ-সঙ্গীতে অনভ্যস্ত, কেউই উচ্চাঙ্গ গানের সমঝদার শ্রোতা নন। সুতরাং তাঁদের মন ভেজাতে চাই সহজ সরল অথচ এমন মাদকতাময় মধুর সুর, যা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করবে সরাসরি। বিরাট ওস্তাদের কাছে দীর্ঘকাল সযত্ন তালিম পাওয়া অনন্য ওস্তাদ ভীষ্মদেব তাঁর ওস্তাদী তালিমের উর্ধ্ব গগন থেকে সাধারণ সঙ্গীত শ্রোতাদের স্তরে নেমে এসে যে অনবদ্য সুর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তা তাঁদের সহজেই তৃপ্ত করবার মতো সহজ সরল এবং মুগ্ধ করার মতো বৈচিত্র্য-পূর্ণ, অথচ শস্তা বা খেলো নয়।

চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে ভীষ্মদেবের অসাধারণ কৃতিত্ব সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ছবিঘরে যে সব দর্শক ভিড় করেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই উচ্চাঙ্গ রাগ-সঙ্গীত সম্বন্ধে আনাড়ি, তাঁদের জন্য ছবিতে অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত রস পরিবেশন করতে গেলে 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্'—এর মতোই ট্র্যাজিডি ঘটার প্রচুর সম্ভাবনা।

ভীষ্মদেব ১৯৩৭ সালের বিখ্যাত চলচ্চিত্র—নির্মাতা প্রতিষ্ঠান

ফিল্‌ম্‌ করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার আমন্ত্রণে সেখানে সঙ্গীত-পরিচালক রূপে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স ২৮ বছর।

এই সম্পর্কে আরেক অসাধারণ প্রতিভাবান বাঙালীর প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ছে, তিনি স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক, গায়ক, গীতিকার, সঙ্গীত-পরিচালক, সঙ্গীত-তাত্ত্বিক এবং সুলেখক শ্রীহীরেন্দ্র কুমার বসু, এবং সম্ভবতঃ সিনেমায় প্লেব্যাক পদ্ধতির তিনিই উদ্ভাবক। আকাশবাণীর ইতিহাসে ও তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। কর্ম-জীবনের বেশীর ভাগ তিনি বোম্বাইতে কাটাবার ফলে বঙ্গ দেশে যে অসামান্য খ্যাতি তাঁর প্রাপ্য ছিল, তার এক দশমাংশ ও তিনি পান নি। জন্মসূত্রে নয়, অন্যসূত্রে বাল্যকাল থেকেই তিনি আমার হীরেন মামা (দিদিমাকে তিনি মা বলে ডাকতেন, এবং মায়ের মতোই ভক্তি করতেন)। ভীষ্মদেব সম্বন্ধে অনেক কথা হীরেন মামার মুখে শুনেছি। হীরেন মামা বয়সে ভীষ্মদেবের চাইতে কিছু বড় ছিলেন, এবং নগেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে তালিম পাবার সূত্রে ভীষ্মদেবের গুরু-ভ্রাতা ছিলেন।

ফিল্‌ম্‌ করপোরেশনে ভীষ্মদেবের যোগদান সম্বন্ধে হীরেন মামা লিখেছেন ঃ

"আমি ভীষ্মদেবের গুরুভাই হয়ে পড়লাম।···আজ ও ভাবি ভীষ্মদেবের কাছে আমি মাত্র গোষ্পদ···এরপর প্রায় বিশটা বছর কেটে গেছে। আমার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে তখন আমি ফিল্‌ম্‌ লাইনের পথিক, অবশ্য সঙ্গীত-পরিচালক ও পরিচালক রূপে। ইতিমধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেষ করে আমি কমার্শিয়্যাল সঙ্গীতের তখন নাম করাই একজন—রেডিও, গ্রামোফোন, সিনেমার একজন প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ।...

"ফিল্‌ম্‌ করপোরেশনের প্রারম্ভে—মিঃ শর্মা ও মিঃ কাত্রা (ফিল্‌ম্‌ করপোরেশনের উদ্যোক্তাদ্বয়) আমার সঙ্গে পরিচিত হন বোম্বাইতে। আমি তখন বোম্বাইতে নাম করা পরিচালক—চিত্র এবং সঙ্গীতে। তাঁদের ফিল্‌ম করপোরেশনের পরিকল্পনার মূলে আমিও কিছুটা

জড়িয়ে ছিলাম পরামর্শদাতা বন্ধু হিসাবে। মিঃ শর্মা একদিন বলেছিলেন, 'বাংলা দেশে প্রকৃত গুণী সঙ্গীতবিদ কাকে আপনি মনে করেন?' আমি বলেছিলাম, 'কমার্শিয়্যালে কে উঠেছেন জানি না, তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ঠিক গুণী বলতে গেলে আমি প্রথমেই ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম করব।" কলকাতায় ফিল্‌ম্ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করে মিঃ শর্মা আমায় আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন, 'আপনার কথামতো আমরা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কেই বহু মিনতি করে আমাদের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে পেয়েছি।'······

মিঃ শর্মার চিঠিতে ব্যবহৃত, 'বহু মিনতি করে' শব্দ তিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব যেমন 'ফিল্‌মি গানা'-র ওপর ভীষণ চটা ছিলেন, ওস্তাদ ভীষ্মদেবও তেমনি ফিল্‌ম্-লক্ষ্মীর সেবায় সঙ্গীত-সরস্বতীর আহ্বানে পৌরোহিত্য করতে নিজেকে রাজি করতে পারছিলেন না। অবশেষে—পরে ৺হীরেন মামার মুখে যেমন শুনেছিলাম, হুবহু তেমনি লিখ্‌ছি—মিঃ শর্মা তাঁকে বলেছিলেন :

"আমরা ব্যবসাদার হলেও ষোলো আনা ব্যবসাদারী মন নিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ি নি। আমরা কিছুটা আদর্শবাদী, এবং প্রমাণ করে দেখাতে চাই যে আদর্শবাদে এবং ব্যবসায়িক সাফল্যে পারস্পরিক বিরোধ অনিবার্য নয়। ফিল্‌মী সঙ্গীতের মান ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে। আমরা এই অবনতির প্রবণতাকে রুখে দিতে চাই ফিল্‌মে শাস্ত্রীয় রাগ সঙ্গীতের এমন সুষ্ঠু সুপরিকল্পিত প্রয়োগ করে, যাতে ফিল্‌ম্-সঙ্গীত শ্রোতাদের রুচির উন্নতি হয়। ফিল্‌মে তারা ক্রমশঃ ভালো গান উপভোগ করতে শেখে। ফিল্‌মী হিট্ গান তৈরিতে পাকা কোনো কমার্শিয়াল সঙ্গীত-পরিচালকের কাছে না গিয়ে তাই তো আমরা আপনার মতো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন সেরা গুণীর কাছে এসেছি।"

শুনে আপত্তির ভাবটা দূর হয়ে গেল ওস্তাদ ভীষ্মদেবের মন থেকে। এই কঠিন দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ এসেছে একটি চ্যালেঞ্জের মতো। সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন ভীষ্মদেব। ফিল্‌ম্ করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ায় সঙ্গীত পরিচালক রূপে যোগ দিলেন

তিনি। সাল ১৯৩৭, বয়স ২৮। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় প্রথম দুটি হিন্দী ছবি 'হরি-কীর্তন' ও 'আশা'। তাঁর সঙ্গীত-পরিচালনা-সমৃদ্ধ প্রথম বাংলা ছবি 'রিক্তা'য় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত এবং সেকালের স্বনামধন্যা গায়িকা-অভিনেত্রী শ্রীমতী রমলা দ্বারা গীত অত্যন্ত আধুনিক ধরনের একটি গানে ("আরো একটু সরে বসতে পারো, আরো একটু কাছে") সঙ্গীত-যাদুকর ওস্তাদ ভীষ্মদেব একটুও খেলো নয় অথচ অত্যন্ত আধুনিক ধরণের সুর প্রয়োগে যে চমক লাগিয়েছিলেন তা অসাধারণ।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সালে ফিল্‌ম্‌ করপোরেশনের কাজ সম্পূর্ণ করে শেষ বিদায় নিয়ে পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দ আশ্রমে চলে যাবার আগে যে দশখানা ছবিতে তিনি সঙ্গীত-পরিচালনা করে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি ছাড়া ছিল হিন্দী 'কয়েদী' 'হিন্দুস্থান হমারা', 'দিল্‌ হী তো হ্যায়', 'রাইজ' এবং বাংলা 'তটিনীর বিচার', 'প্রথম প্রভাত' এবং হীরেন্দ্র কুমার বসুর অসামান্য কাহিনী-ভিত্তিক এবং তাঁর দ্বারাই পরিচালিত "অমরগীতি"। এই কাহিনীটিই হিন্দী-ভাষী ছবি রূপে 'মহাগীতি' নামে বোম্বাইতে সাগর মুভীটোনে নির্মিত হয়েছিল ; হীরেন্দ্র কুমার বসুই ছিলেন তার পরিচালক এবং সঙ্গীত পরিচালক।

'অমর গীতি'ই ফিল্‌ম্‌ করপোরেশনের ভীষ্মদেবের সঙ্গীত পরিচালনা-সমৃদ্ধ শেষ ছবি। হীরেন্দ্রকুমার বসু লিখেছেন :

"ভীষ্মবাবুর সুরগুলি তখনকার দিনে অভিনব হয়েছিল বললে বেশী বলা হয় না, এবং তাঁর গানের অন্যান্য সুরকে তাঁর বৈদিক সঙ্গীত রচনা ও আবহসঙ্গীত পরাভূত করেছিল। আমি নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে ওরকম সুর রচনা আমি আমার জীবনে আর কখনো শুনি নি।"

সারা বাংলার তথা সারা ভারতের হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের জগতে তিনি যখন খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্ব গগনে সমুজ্জ্বল, সেই সময়ে পিতা, মাতা, পত্নী, সন্তান, সমাজ, সংসার সব কিছুর

মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে, ১০ই আগস্ট, ১৯৪০ তারিখে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বছর। কেন? অনেকের কাছে সেটাই পরম রহস্য।

পণ্ডিচেরি থেকে ভীষ্মদেব কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন আট বছর বাদে, ১৯৪৮ সালে। তাঁর হঠাৎ অমন রহস্যজনকভাবে পণ্ডিচেরি চলে যাওয়া সম্পর্কে নানা মহলে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা এবং গুজবের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে তিনি সহজ সরল ভাবেই বলেছিলেন, তিনি গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, আধ্যাত্মিক কারণে—আত্মিক শান্তির সন্ধানে।

শৈশব থেকেই তাঁর মন ছিল নিরাসক্ত বৈরাগীর, খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার লোভ থেকে মুক্ত।

পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে এসে ভীষ্মদেব সহজে গাইতে চাইতেন না। গান কখনো কখনো গেয়েছেন বটে, কিন্তু পণ্ডিচেরি যাবার আগেকার সুর-যাদুকর ভীষ্মদেবকে আমরা আর খুঁজে পাই নি।

সেই খুঁজে না পাওয়াটা সঙ্গীত-পিপাসু আমাদের গভীর বেদনার কারণ হয়েছিল আমাদের স্বার্থ দ্বারা সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের দুঃখের কারণ ছিল ভীষ্মদেব আর আগেকার মতো চমৎকার গান গেয়ে আমাদের আনন্দ দিতে পারছেন না বা দেবার আগ্রহ বোধ করছেন না। কেন, সেটাই আমাদের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয় তখন হয়তো ভীষ্মদেব আধ্যাত্মিক সাধনার এত উচ্চ স্তরে উঠে গিয়েছিলেন যে, অন্যকে গান শুনিয়ে প্রশংসা বা মর্যাদা লাভ তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

ভীষ্মদেব পণ্ডিচেরি থেকে ১৯৪৮-এ ফিরে আসার পর দুবার রাত্রে তাঁর নিকট-সান্নিধ্য অনেকক্ষণ ধরে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—কালীঘাটে তাঁর শিষ্য ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং সঙ্গীত মাসিক 'সুরছন্দা'-সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে এবং পার্ক সার্কাসে তাঁর শিষ্য সঙ্গীত-সাধক এবং সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শান্ত, সমাহিত,

চিন্তামগ্ন ভাব। মুখে কোনো কথা নেই। বসে আছেন তো বসেই আছেন। মনে হচ্ছে যেন অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল ঐ ভাবেই অনায়াসে বসে থাকতে পারেন। দুবারই উপলক্ষ্য ছিল ভীষ্মদেবেরই সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠান। ভীষ্মদেবের পণ্ডিচেরী যাত্রার আগে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র গেরুয়াধারী অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক, এবং সর্বশেষ ফিল্ম্ করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার মহান সঙ্গীত পরিচালক রূপে ভীষ্মদেবকে যেমন দেখেছিলাম, তাতে অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁর সেই অতীত রূপের সঙ্গে তুলনা করে মনে হচ্ছিল তার দুঃখজনক ধ্বংসাবশেষ দেখছি। শিষ্যরাও কেউ যেন অগ্রণী হয়ে তাঁকে কোনো কথা বলতে ভরসা পাচ্ছেন না, ওস্তাদের মুখের পানে উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে আছেন, যদি কোনো কথা ওস্তাদের মুখ থেকে দৈবাৎ বেরিয়ে আসে তা যেন কোনো মতেই শ্রবণ এড়িয়ে না যায়।

আমার আশাভঙ্গের বেদনা অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল যখন প্রিয় ভক্ত শিষ্যদের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের দেওয়া কিছু অতি মনোরম অথচ অতি জটিল এবং দুরূহ 'চিজ' অবলীলাক্রমে গেয়ে শোনাচ্ছিলেন। এমন অবিশ্বাস্য অনায়াস ভঙ্গীতে তিনি অতি কঠিন সাপট তানের নমুনা পরিবেশন করছিলেন, যে মনে হয়েছিল যৌবনের সঙ্গীত-ক্ষমতা পুরো দাপটের সঙ্গে ফিরে এসেছে, আবার তিনি আগেকার মতোই পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, যদি ইচ্ছা করেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল সে সৌভাগ্য আমাদের হবার নয়, কারণ তেমন ইচ্ছা তাঁর আর হবে না, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছেন।

কিছু দুঃখের কথা, লজ্জার কথা বলা বাকি আছে, তাই ফিরে আসি ১৯৩৪ সালে! ঐ সালে ভীষ্মদেব বিবাহ করেন, বাংলা মুলুকের সঙ্গীত জগতে তাঁর যে বিরাট খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা ছিল, তা তাঁর মেগাফোন রেকর্ডে গাওয়া হিন্দী খেয়াল ও ঠুংরি গান, এবং বাংলায় ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনে গায়ক রূপে যোগদানের ফলে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

এত অল্প বয়সে এত বিরাট খ্যাতি, সম্মান আর জনপ্রিয়তা সঙ্গীত-জগতে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের মনে প্রচণ্ড ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল। ভীষ্মদেবের মতো সঙ্গীত-প্রতিভা যেমন বিরল, তেমনি তাঁকে আমাদের সঙ্গীত জগতের কিছু সংখ্যক মানুষের অদ্ভুত ঈর্ষার শিকার হতে হয়েছিল। এই ঈর্ষাকাতরদের মধ্যে কিছু ছিলেন বাঙালী এবং কিছু অবাঙালী।

ভীষ্মদেব যে তবলা বাদনেও অসামান্য দক্ষ ছিলেন এবং তবলাতেও বিশেষ তালিম পেয়েছিলেন তাঁর গুরু খলিফা বদল খাঁ সাহেবের কাছে, এ খবর অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু ভীষ্মদেবের হারমোনিয়াম-বাদন ছিল বিখ্যাত, কারণ তিনি সর্বত্রই খেয়াল ঠুংরি গাইতেন তাঁর নিজের গানের সঙ্গে নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে। বাল্যকাল থেকেই তিনি হারমোনিয়াম-বাদনে অভ্যস্ত। হারমো-নিয়ামে কোনো ওস্তাদের তালিম পান নি ভীষ্মদেব, ভারতখ্যাত হারমোনিয়াম-যাতুকর মণ্টু ব্যানার্জী যেমন পেয়েছিলেন মুনেশ্বর দয়ালের কাছ থেকে। কিন্তু ভীষ্মদেবের হারমোনিয়াম বাদনও ছিল অনন্য মাধুর্য আর চমকে ভরা, প্রায় তাঁর গানেরই মতো মনো-মুগ্ধকর। (একটি 'মেগাফোন' চাক্তি রেকর্ডে কাফি মিশ্র এবং ভৈরবী রাগে ভীষ্মদেবের যে হারমোনিয়াম-বাদন ধরা আছে তা থেকে তাঁর হারমোনিয়াম প্রতিভার প্রমাণ মিলবে।)

ভীষ্মদেবের কণ্ঠে গাওয়া গান আর আপন হাতে বাজানো হারমোনিয়াম, এই দুয়ের সমন্বয় যে কি অনির্বচনীয় সঙ্গীত যাদু সৃষ্টি করত, তা যাঁরা দেখেছেন এবং শুনেছেন তাঁরাই জানেন কণ্ঠ আর যন্ত্রের কি অসাধারণ দুরূহ সমন্বয় কি অসাধারণ দক্ষতা এবং মাধুর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন তিনি, যা তাঁর মতো যাদুকরের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

কিন্তু ঈর্ষাকাতর বিরূপ সমালোচকেরা ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগলেন ভীষ্মদেব গায়ক হিসেবে এখনো তেমন পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারেন নি, এখনো তাঁকে নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে হয়।

অর্থাৎ তিনি নিতান্তই হারমোনিয়াম-নির্ভর গায়ক, আপন হাতে হারমোনিয়ামের সাহায্য না নিয়ে তিনি গাইতে পারেন না। কি অদ্ভুত যুক্তি! সহজেই বোঝা যায় উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীত পরিবেশনে গায়কের পক্ষে নিজে হারমোনিয়াম সঙ্গৎ করতে যাওয়াটাই একটা মস্ত 'হ্যাণ্ডিক্যাপ', অসুবিধাজনক আপদ বিশেষ। নিজে হারমোনিয়াম বাজাবার হাঙ্গামাটা না থাকলেই বরং পুরো মনোযোগটা দেওয়া যায় গাওয়ার দিকে। সাধারণ লজিক (বা যুক্তিবোধ) তো এ কথাই বলে। কিন্তু উন্মাদ আর ঈর্ষা-কাতরদের লজিক আলাদা।

এই শ্রেণীর প্রতিনিধি একজন ভীষ্ম-নিন্দুক বাঙালী গায়ক এবং সঙ্গীত-শিক্ষককে—যাঁর নাম ধাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই—আমি বলেছিলাম, "ওঁর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাওয়া শুনে তো আমরা সবাই মন্ত্র-মুগ্ধ। আপনি একদিন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে একবার আমাদের মন্ত্র-মুগ্ধ করে দেখান না।"

শুনে উনি আমার ওপর খুব রাগ করেছিলেন, আমাকে প্রহার করবার বাসনা ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে মুখে।

এবার ভীষ্মদেবের অবাঙালী ঈর্ষাকারীদের সম্বন্ধে ভারত বিখ্যাত এবং ভারতের প্রত্যেকটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে বিশেষ আকর্ষণ রূপে সমাদৃত অবিস্মরণীয় হারমোনিয়াম-ওস্তাদ ৺মণ্টু ব্যানার্জীর প্রত্যক্ষ-দর্শী উক্তি থেকেই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করি। তিনি বলেছিলেন ঃ

"ভীষ্ম কাশীতে সঙ্গীত সম্মেলনে গাইতে গেছে।···বিরুদ্ধবাদীরা ফন্দী আঁটলেন। রাত্রে গান গাইতে বসার আগে শোনা গেল 'পেটি' (হারমোনিয়াম) বাজিয়ে খেয়াল গাইতে দেওয়া হবে না। ভীষ্ম সে সময়ে নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইত। তাই বিরুদ্ধবাদীরা ভেবেছিলেন ভীষ্ম 'পেটি' ছাড়া গাইতে পারবে না। কিন্তু ভীষ্ম তাঁদের সে চাল ব্যর্থ করেছিল বিনা 'পেটি'তে গান গেয়ে। এই আসরে ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ, পণ্ডিত রতনজংকার, পণ্ডিত কৃষ্ণরাও ভাস্কর, পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত রামকিষেণ মিশ্র প্রমুখ বহু বিরাট গুণী উপস্থিত ছিলেন। ভীষ্মের সাফল্যে সব চেয়ে বেশী খুশী

হয়েছিলেন ননীবাবু (সঙ্গীত-শিল্পী জমিদার ননীগোপাল মতিলাল, উক্ত সঙ্গীত সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা) এবং ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব। পণ্ডিত ওঁকারনাথকে খাঁ সাহেব বলেছিলেনঃ "পণ্ডিতজি, গানা তো আজ ইয়ে বাবুজিনে গায়া।" অর্থাৎ "আজকের আসরের সেরা গান তো এই বাবুজিই গেয়েছেন।..."

কাশীধাম থেকে কলকাতায় ফিরে আসি পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটে অবিভক্ত বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সার্বজনিক (পাবলিক) সম্মেলনের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা সঙ্গীতপ্রেমী জমিদার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে ঘরোয়া গানের আসরে।

বোম্বাই থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর ঘরানার ভারত-বিখ্যাত গায়ক পণ্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাস। মহারাষ্ট্র সঙ্গীত-জগতের গৌরব ব্যাসজি চমৎকার গাইলেন। এবার হারমোনিয়ামের যাদুকর শিল্পী মণ্টু ব্যানার্জীর উক্তি উদ্‌ধৃত করি ঃ

"ব্যাসজির গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরিচিত কয়েকজন ব্যাসজিকে আসর থেকে তুলে নিয়ে যেতে তৎপর হলেন। আমি থাকতে না পেরে ব্যাসজিকে গিয়ে বললাম, 'পণ্ডিতজি, চলে যাচ্ছেন কেন? বাংলাদেশের গানও একটু শুনে যান।' পণ্ডিতজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে গাইবেন?' ভীষ্মের নাম শুনেই ব্যাসজি পরমাগ্রহে পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন। ভীষ্মের গান শুনে ব্যাসজি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেই সঙ্গে আরো যা বললেন, তা শুনে আমার মতো নির্লজ্জেরও লজ্জায় অধোবদন হতে হলো। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেনঃ 'বাবুজি, আমি এতদিন ভীষ্মবাবুর নামই শুনেছি। এখানকার বন্ধুদের কাছে তাঁর গান শোনার আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁরা বলেছিলেনঃ 'আপনি তাঁর গান কি শুনবেন? আপনার কাছে সে কিছুই নয়।' আমি জানতাম না তিনি এই আসরে গাইবেন। তাঁর গান শুনে আমি চমৎকৃত হয়েছি। তিনি যে এত উঁচু দরের কলাকার তা আমার জানা ছিল না।"

হারমোনিয়াম নিজে না বাজিয়ে গেয়েও যখন আসবের পর আসর মাত করা ভীষ্মদেবের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হলো না, তখন তাঁর কিছু বিরূপ সমালোচক—বলা বাহুল্য তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু যশঃলিপ্সু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-শিল্পীও ছিলেন—বলতে শুরু করেছিলেন ভীষ্মদেবের গানে অনেক ব্যাকরণের ভুল হয়, ব্যাকরণ সম্মত শুদ্ধভাবে তিনি গাইতে পারেন না। এঁদের ভীষ্ম-সমালোচনা শুনে হ-য-ব-র-ল কাহিনীর ব্যাকরণ সিং-এর কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। ভীষ্মদেবের ব্যাকরণ-ভ্রান্ত গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেও আরো শুনবার আগ্রহ কমত না, কিন্তু এই ব্যাকরণ-সিংদের একজনের ব্যাকরণসম্মত গান শুরু হবার কিছুক্ষণ বাদেই পরমাগ্রহে আসর থেকে কেটে পড়েছিলাম। এই সঙ্গীত-ব্যাকরণ-বিশারদদের চাইতে সঙ্গীতের ব্যাকরণ ভীষ্মদেব কম জানতেন বলে আমার মনে হয় না। ব্যাকরণ-সিংদের সঙ্গে ভীষ্মদেবের প্রভেদ এই যে ভীষ্মদেব ব্যাকরণ-গায়ক হতে চান নি, তিনি ছিলেন খাঁটি সঙ্গীত শিল্পী, তাঁর আদর্শ ছিল ব্যাকরণ-অনুযায়ী রাগের মূল কাঠামোটিকে নিখুঁতভাবে বজায় রেখে অর্থাৎ রাগভ্রষ্ট না হয়ে শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকরণ-বহির্ভূত বৈচিত্র্যের কিছু কিছু মনোরম সংযোজন। এই সংযোজনের মাধুর্যই তো তাঁর অনন্য প্রতিভার নিদর্শন।

রাগের প্রধান এবং অপরিহার্য গুণ হচ্ছে রঞ্জন। যে রাগ পরিবেশন শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে পারে না, সে নিখুঁতভাবে ব্যাকরণ-সম্মত হলেও ব্যর্থ। মাছিমারা কেরাণীর মতো ব্যাকরণের গোলামি করা খাঁটি সঙ্গীত-শিল্পীর আদর্শ নয়—তিনি জানেন গানের জন্যই ব্যাকরণ, ব্যাকরণের জন্য গান নয়। গানই প্রধান, ব্যাকরণ তার সহায়ক, প্রভু নয়।

এই ব্যাকরণ-সিংদের ঈর্ষাকাতর ভীষ্ম সমালোচনার প্রসঙ্গে একজন শিষ্য ভীষ্মদেবকে বলেছিলেন, "ওরা বলেন আপনি নাকি রাগ গাইতে গিয়ে ভুল করেন।"

ভীষ্মদেব মৃদু হেসে বলেছিলেনঃ "ওঁরা গান বাজনা বোঝেন না।"

দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের ফলে অসুস্থ ভীষ্মদেবকে ২রা অগাস্ট, ১৯১৭ রাত্রে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। ৮ই অগাস্ট, ১৯১৭ তারিখে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতায় ভরা এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন ভারতের সঙ্গীত-জগতের কিংবদন্তীর মহান নায়ক ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

অবিস্মরণীয় কৃষ্ণচন্দ্র দে

আমার প্রথম সঙ্গীতগুরু এবং বাংলার প্রিয়তম সঙ্গীত-সাধক অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের কথা লিখছি। বহুমুখে উচ্চারিত 'কানা কেষ্টো' নামটি এই অসাধারণ সৌম্যদর্শন গৌরবর্ণ অমৃতকণ্ঠ মধুরচরিত্র মানুষটিকে কে দিয়েছিলেন জানি না, আমি তাঁর এই কদর্য হৃদয়হীনতাকে কখনো ক্ষমা করতে পারি নি।

১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীকৃষ্ণের জন্মধন্য জন্মাষ্টমী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; জন্মতিথি অনুসরণেই তাঁর নাম হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র। পিতা শিবচন্দ্র দে মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায়। বিবাহ করে তিনি কলিকাতায় চলে এসে ব্যবসা করেন। তাঁর তিন পুত্র যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র, হেমচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর, তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। এবং তাঁদের তিন ভাইকে মানুষ করে তুলবার দায়িত্ব বর্তায় তাঁর বিধবা মায়ের ওপর।

কৃষ্ণচন্দ্র ফোর্থ ক্লাস অর্থাৎ এখনকার হিসেবে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন কলকাতার শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায়, পরে যার নাম হয়েছে কেশব একাডেমি।

বালক কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত দুরন্ত প্রকৃতির, এবং ঘুঁড়ি ওড়াবার নেশাটি ছিল তাঁর প্রচণ্ড।

৺কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কলকাতা-বেতারের বিশিষ্ট কীর্তন-শিল্পী শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দে আমাকে জানিয়েছেন ঃ

"বারো বছর বয়সে ঘুঁড়ি ওড়ানোর জন্যই অনবরত সূর্যের আলো চোখে লেগে লেগে তাঁর চোখ দুটোই লাল হলো এবং যন্ত্রণাও হতে লাগল। ঠাকুমা মেডিক্যাল কলেজে কাকাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে থাকেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ভগবান বোধ হয়

আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনই সুন্দর কণ্ঠস্বর। বাড়িতে ভিখারী এসে গান গেয়ে ভিক্ষা চাইত, সেই সব গান তাঁর মুখস্থ এবং কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এইখানেই কাকার লেখাপড়া শেষ হলো। ঠাকুমা সে যুগের মানুষ, হয় তো বুঝেছিলেন যখন গানের গলা আছে তখন ওকে অসহায় হয়ে বাঁচতে না দিয়ে যদি গানের মাধ্যমে ওর জীবনে আনন্দ আনা যায়। এই ভেবে তখনকার দিনের নামী গায়ক শ্রীশশীভূষণ দের কাছে নিয়ে গেলেন। শ্রীশশীভূষণ পেশায় ছিলেন উকিল, নেশায় গায়ক। কাকার গলা শুনে তিনি শেখাতে রাজি হয়ে গেলেন।

প্রথম গুরু এই শশীভূষণ দে মহাশয়ের কাছে বেশ কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করার পর আঠারো বছর বয়সে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে গাওয়া তাঁর "ওমা দীন-তারিনী তারা" (রাগ মালকোষ) গানখানা তাঁকে বাঙালীর অন্তরে স্থান করে দেয়। তার পর থেকে ৬৯ বছর বয়স পর্যন্ত রেকর্ড জগতে সম্রাটের আসনেই ছিলেন। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় রেকর্ড করেছেন।"

৺কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীত-শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীপ্রভাস দে আরো জানিয়েছেন ঃ

"খলিফা বদল খাঁ সাহেবের কাছে কাকা তালিম নিতে সুরু করেন ১৯৩১/৩২ সালে, যখন নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস' ছবিটি মুক্তি পায়। চার পাঁচ বছর ধরে আমি দেখেছি, খাঁ সাহেব সকালে তালিম দিতে আসতেন, চার-পাঁচ ঘণ্টা তালিম চল্‌ত। এর আগে পুরুষোত্তম দাসজির কাছে নিয়মিত তবলা তালিম নিতেন। মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেবের কাছে ধ্রুপদে তালিম নেন ১৯৩৫/৩৬ থেকে প্রায় ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন বিখ্যাত 'দানীবাবু' (সতীশ চন্দ্র দত্ত)।" দানীবাবু নিজেও ভালো ধ্রুপদী ছিলেন।

প্রভাস বাবুর পত্র থেকেই জানি ঃ "১৯৩৯ সালে কৃষ্ণচন্দ্র বোম্বাই শহরে যান বাণীচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়ে। সেখানে নিজে কয়েকটি ছবির 'প্রোডিউসার' (প্রযোজক)ও হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে

একটির নাম 'তমন্না'। 'তমন্না' হিন্দি শব্দ, যার অর্থ অনুরোধ বা প্রার্থনা। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় এসে তিনি নিজে ছবি তৈরি করার কথা ভাবেন, যার ফলে ১৯৪৮ সালে 'পুরবী' ছবিটি মুক্তি পায়। ছবিটি তৎকালীন কালী ফিল্‌ম্‌স্ স্টুডিওতে তোলা হয়। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন চিত্ত বসু। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, এবং সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁর সহকারী ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রণব দে, (গায়ক মান্না দের অগ্রজ)।"

কাকা ৺কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন শিক্ষা সম্বন্ধে প্রভাস দে লিখেছেন ঃ

"বোম্বাই যাওয়ার আগে ১৯৩৬/৩৭ সালে তিনি (কৃষ্ণচন্দ্র দে) শ্রীরাধারমণ দাস মহান্তি মহাশয়ের কাছে কীর্তন শিখতে শুরু করেন। তাঁর (কৃষ্ণচন্দ্রের) নিজস্ব ধারণা, যা তাঁকে বলতে শুনেছি, যে, সব রকম গান গাওয়া হলো কন্‌ফারেন্‌স্, থিয়েটার, ফিল্‌ম, মজলিস, জল্‌সা সব জায়গায়, কিন্তু কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। তখন শুরু হলো কীর্তন শেখা। ধ্রুপদ এবং কীর্তন তাঁর শেষ জীবনের সঙ্গী হলো।"

৺কৃষ্ণচন্দ্রের মঞ্চ-সঙ্গীত সম্পর্কে প্রভাস দে বলেছেন ঃ

"শিশির ভাদুড়ি যখন 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন তখন কাকাকে ডাকেন বৈতালিকের ভূমিকায় অভিনয় ও গান করার জন্য এবং সঙ্গীত-পরিচালনার জন্য। দুটি গান ছিল ঃ (১) 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' এবং (২) 'জয় সীতাপতি সুন্দরতনু প্রজারঞ্জনকারী'।"

সর্বশেষ প্রভাস বাবু জানিয়েছেন ঃ "আমার দাদা মান্না বাবুর প্রথম তালিম কাকার কাছেই। বোম্বাই গিয়ে উনি ওস্তাদ গোলাম মোস্তাফা খাঁর কাছে খেয়ালে তালিম নেন। আমি বরাবর কাকার কাছেই শিখেছি। প্রথমে খেয়াল ও ঠুংরি, পরে ধ্রুপদ এবং কীর্তন। কাকা আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখার ব্যাপারে এবং আমি রবীন্দ্র সঙ্গীত চার বছর শিখেছি শ্রীসুবিনয় রায় মহাশয়ের কাছে। কাকার কাছে বিশেষ করে আমি প্রেরণা পেয়েছি

গানে সুর করার ব্যাপারে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে সুরের ব্যাপারে অনেক মূল্যবান উপদেশ এবং তার সাথে রাগের মিশ্রণ কিভাবে করা যায় কথার ভাবকে ব্যাহত না করে, সে সবই কাকার দান।"

আমার সঙ্গে বাংলার ক্ষণজন্মা পুরুষ অবিস্মরণীয় কণ্ঠসঙ্গীত-সাধক ৺কৃষ্ণচন্দ্রের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হয়েছিল ১৯২০ সালে, যখন আমার বয়স আট বছর এবং তাঁর বয়স সাতাশ। এবং তাঁর সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ—অথবা আরো ঠিকভাবে 'সাক্ষাৎকার'—হয়েছিল ১৯৫৯ সালে, যখন আমার বয়স সাতচল্লিশ এবং তাঁর ছেষট্টি। একটিরও সঠিক তারিখ আমার মনে নেই। কিন্তু দুটি অভিজ্ঞতাই আমার স্মৃতিতে সমান উজ্জ্বল হয়ে আছে—একটি গভীর আনন্দময়, অন্যটি গভীর বেদনাময়।

প্রথমে প্রথম অভিজ্ঞতাটির কথা বলি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। আমি তখন মার সঙ্গে কিছুদিনের জন্য ঢাকা শহরের সীমান্তবর্তী পৈতৃক বাসভবন থেকে কলকাতায় এসেছি মাতামহ কুঞ্জলাল নাগের ১০ নং সিমলা লেন (বর্তমানে হরিপদ দত্ত লেন) ভবনে। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার বারদী গ্রামের বিখ্যাত প্রজাবৎসল জমিদার এবং কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক। ক্লাসে তাঁর শেক্‌স্‌পীয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটক পড়ানো শুনে বিখ্যাত স্যাড্‌লার কমিশনের অধিনায়ক স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন এত উচ্চ মানের শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক পড়ানো শেক্‌স্‌পীয়ারের আপন দেশেও হয় না। তিনি ছিলেন সেই পাড়ার শ্রদ্ধেয়তম পুরুষ। 'ভাইয়া'র (মাতামহ আমাকে ভাইয়া বলতেন, আমিও তাঁকে ভাইয়া বলেই ডাকতাম) বাড়ির দক্ষিণমুখী সদর দুয়ারটি ছিল সিমলা লেনে, আর উত্তরমুখী খিড়্‌কি দুয়ারটি খুলে মদন ঘোষ লেনে নেমে দাঁড়ালেই প্রায় মুখোমুখী পড়ত বাংলার প্রিয়তম গায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের পৈতৃক ভবন। তার একতলায় গলির ধারে বৈঠকখানা ঘরে গানের আসর বস্‌ত সকালে সন্ধ্যায়, যার মধ্যমণি

ছিলেন অমৃতকণ্ঠ সঙ্গীত-যাদুকর কৃষ্ণচন্দ্র। ঘরের দুটি খোলা জানালার বাইরে গলির ধারে রোয়াকের ওপর বসে বসে তন্ময় হয়ে শুনতাম তাঁর গান এবং সেই সঙ্গে তাঁর অসামান্য হারমোনিয়াম বাজানো। যাঁর কণ্ঠ এবং হাত এমন অনবদ্য সুরের সৃষ্টি করতে পারে, আমার শিশুমন তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে দিল।

কি উপলক্ষ্যে মনে নেই, পাড়াব সৌখীন নাট্যামোদীরা এক সন্ধ্যায় শামিয়ানার তলায় মঞ্চস্থ করলেন গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেকালের জনপ্রিয় প্রহসন 'কেলোর কীর্তি'। আমার এক মামা এবং গায়ক ৺কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতারাও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ৺কৃষ্ণচন্দ্র সেই মঞ্চে সংলাপ বলেছিলেন কিনা মনে নেই, কিন্তু অতিশয় জীবন্তভাবে তার প্রায় সাত দশক কাল বাদে এখনও যেন কানে শুনতে পাচ্ছি পথচারী বৈরাগীর ভূমিকায় একতারা বাজিয়ে গাওয়া তাঁর অমৃত ঝরানো স্বর্গীয় কীর্তন গান ঃ

"মধুর মধুর হায় কি মধুর
মধুর হরিনাম।
প্রাণ ভরে ভাই লওরে সবাই
ঐ নাম অবিরাম।"

এই গানখানা শ্রোতাদের সমবেত আগ্রহ প্রকাশের ফলে তাঁকে আবার গাইতে হয়েছিল, পরবর্তী জীবনে শিশির ভাদুড়ি পরিচালিত 'সীতা' নাটকে যেমন "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" গানখানি।

ঢাকা শহরের গেণ্ডারিয়া সীমান্ত অঞ্চলে আমার পৈতৃক বাসভবন ছিল শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমের সান্নিধ্যে। আমার পিতা মাতা, পিতামহ পিতামহী, মাতামহ মাতামহী সবাই সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য শিষ্যা। বাল্যকাল থেকেই আমি এই আশ্রমের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েছি। আশ্রমে কীর্তন এবং অন্যান্য রকমের ভক্তি গান ছিল প্রায় নিত্য-

নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাবা খুব ভালো কীর্তন গাইতেন, ভজন গানও। বাবা আমাকে কখনো তালিম দেন নি, তাই আক্ষরিক অর্থে তাঁকে হয়তো আমার সঙ্গীত-গুরু বলা যাবে না, কিন্তু তাঁর মুখে শুনে শুনে অনেক কীর্তন আর ভজন গান আমি গলায় বেশ ভালভাবেই তুলে নিয়েছিলাম এবং নির্ভুল সুরে আর ভঙ্গীতে অনায়াসেই গাইতে পারতাম। বিশেষ করে হরিনামের মাহাত্ম্য-প্রচারক একাধিক কীর্তন এবং অন্য শ্রেণীর গান আমার জানা ছিল, তাদের একটি ছিল যাত্রা পালার অত্যন্ত জনপ্রিয় ঃ

"বল বল হরি সবে বদন ভরি'
অনায়াসে হবি ভবপার রে !
দূরে যাবে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
পান করিলে নাম সুধা···" ইত্যাদি।

উক্ত নাট্যানুষ্ঠানের কয়েকদিন বাদে এক শুভ সকাল বেলায় আপন মনে মাতামহ ভবনের উত্তর দিকের একতলায় খিড়কি দরজার পাশের ঘরে বসে 'প্রেমসে' কণ্ঠ ছেড়ে গাইছিলাম ঃ

"মধুর মধুর হায় কি মধুর
মধুর হরিনাম···"

গাইতে গাইতে আবেগে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে দুচোখ জলে ভরে উঠেছিল. বার বার চোখের সামনে কল্পনার পর্দায় ফুটে উঠেছিলেন মঞ্চে একতারা হাতে গায়নরত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের মূর্তি।

সেইদিনই তিনি আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর একতলার গানের ঘরে। বললেন, "বাড়ি ফেরাব পথে তোমার গান শুনে আমার ভালো লেগেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম তুমি পাগলের ভাগ্নে।" পাগল মানে আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছোট মামা মুরলী মাধব নাগ।

হারমোনিয়ামটি যথাস্থান থেকে অনায়াসে বার করে তিনি বললেন, "একখানা পুরো গান আমাকে শোনাও। আমি বাজাচ্ছি তোমার গানের সঙ্গে।"

ঐ আশ্চর্য মিষ্টি আওয়াজের যন্ত্রটিকে বাজিয়ে দেখবার লোভ

ছিল প্রচণ্ড। সবিনয়ে বললাম, "আমি বাজাতে জানি।" আমার লোভ বুঝতে পেরে হেসে আমার দিকে হারমোনিয়ামটি এগিয়ে দিলেন তিনি। আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। হরি যে এমন দয়াময় হয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন তা কল্পনাও করিনি। আমি নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাবার গাওয়া শুনে শুনে মাত্র কিছুদিন আগে শেখা কবি-নাট্যকার গিরীশ ঘোষের নাটকের একটি উঁচু পর্দার গান গাইলাম:

"চন্দ্র কিরণ অঙ্গে নমো বামন রূপধারী।"

সচেতন তাল-জ্ঞান আমার ছিল না, কিন্তু সহজাত ছন্দবোধ ছিল, তাই মনে হয় কোথাও তালভঙ্গ হয় নি আমার গানে। তিনি বললেন, "খুব ভাল লাগল তোমার গান।" স্পষ্ট অনুভব করলাম সত্যিই তাঁর ভাল লেগেছে। তাবপর তিনি প্রশ্ন করলেন, "একখানা গান শিখবে আমার কাছে?" আমি বিনা দ্বিধায় বললাম, "শিখব।"

"কি গান শেখাব? কি রকম তোমার পছন্দ?" তাঁর এই সস্নেহ প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম. "হরির কাছে প্রার্থনা।"

সেই আট বছর বয়সে আশ্রমিক পরিবেশে হরিভক্ত প্রহ্লাদ এবং ধ্রুব-র কাহিনী আমার শিশুমনকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল, আমার সঙ্গীত-গুরু হতে ইচ্ছুক অনন্য গায়কের কাছে আমার এই প্রার্থনা তারই স্বাভাবিক ফল।

তিনি আমার প্রার্থনা রাখলেন। ঐ বৈঠকেই তিনি আমাকে শিখিয়ে দিলেন একটি নতুন (অর্থাৎ আমার না জানা না শোনা) কীর্তনাঙ্গ গান:

"হরি হে, বিপদভঞ্জন তব নাম।
বিপদ-সাগরে ভাসি' কাঁদি আমি দিবানিশি
মোরে প্রভু কেন এত বাম?…" ইত্যাদি।

এরপর একদিন শেখালেন জৌনপুরী রাগে একটি গান:

"(আমার) সাধের তরী, হে মুরারি,
ভাসে অকুলে…"

রাগের নামটি অবশ্য তখন আমার জানা ছিল না, কিন্তু বাবাকে ঐ সুরে গাইতে শুনে সুরটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। তাই এক তালিমেই আমার গানখানি শেখা হয়ে গেল।

সম্ভবতঃ পাড়ার ছেলে বলে, এবং আমাব মাতামহ অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগকে তিনি অসাধারণ শ্রদ্ধা করতেন বলেই সঙ্গীত-সাধক কৃষ্ণচন্দ্র আমার ছোট মামার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন আমাকে নিয়মিত তালিম দিয়ে তাঁর সেরা শিষ্য বানাবার। কিন্তু আমার ভাগ্য-বিধাতা জীবন দেবতার এতে সায় ছিল না। তাঁর বিধানে আমাকে ঢাকায় পৈতৃক ভবনে ফিরে যেতে হওয়ায় সেই অমূল্য সুযোগ আমার নেওয়া হলো না। তখন সেই সুযোগের মূল্যও আমি বুঝতে পারি নি। তারপর ১৯৩১ সালে ঢাকা থেকে আই-এ পরীক্ষা পাশ করে যখন কলকাতায় বি-এ পড়তে এসে আবার তাঁর নিকট প্রতিবেশী হলাম (এবার ৺মাতামহ-হীন মাতুলালয়ে সিমলা লেনেই ১৬/এ নম্বর বাড়িতে) তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে অনায়াসেই তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত তালিম পাবার ব্যবস্থা করে নিতে পারতাম, বিশেষ করে যখন তাঁর বড়দার বড় ছেলে আমার বয়সী প্রণব দে-র (নীলু) সঙ্গে বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার মনে সে আগ্রহ জাগে নি। তার অন্যতম প্রধান কারণ সাহিত্য তখন আমার জীবনে প্রধান হয়ে উঠেছে এবং আমি সাহিত্য-রচনায় প্রচণ্ডভাবে নেশাগ্রস্ত এবং কিছু পরিমাণে পেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তাছাড়া আমার অবচেতন মন তখন এই যুক্তিসঙ্গত চিন্তাই করেছিল যে শাস্ত্রীয় রাগ সঙ্গীত (চলতি ভাষায় 'ক্ল্যাসিক্যাল' বা 'ওস্তাদী' গান) শেখার মতো শিখতে গেলে সহজাত প্রতিভা যতই থাক না কেন, সিদ্ধিলাভের আনন্দ-তীর্থে পৌঁছাতে যে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী কণ্ঠ-কশরতের এবং কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গে তবলা-সঙ্গতের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাবার সাধনা অপরিহার্য, তার বিরক্তিকর একঘেয়েমি আমার ধাতে সইবে না; অপর পক্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ যেমন আনন্দময়, সাধনার পথ চলাতেও তেমনি আনন্দ,

অর্থাৎ শিক্ষানবিসির পর্বটা সঙ্গীতে শিক্ষানবিসির পর্বের মতো একঘেয়ে বিরক্তিকর নয়।

সেই সময়ে (১৯৩১ এবং তার পরবর্তী কয়েক বছর) কৃষ্ণচন্দ্র কল্‌কাতার বিশিষ্ট রঙ্গালয় (তদানন্তীন কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার বা হেদুয়ার কিছুদূর উত্তরে) 'রঙমহল'-এর অন্যতম 'ডিরেক্‌টর' ছিলেন। কবি শৈলেন রায় এলেন ১৯৩১ সালের শেষ দিকে কুচবিহার থেকে। তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁর বাল্যবন্ধু এবং গুণমুগ্ধ ভক্ত, সেকালের অসাধারণ জনপ্রিয় পল্লীগীতি-গায়ক, 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' এবং 'টুইন' রেকর্ডের বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মেদ। কৃষ্ণচন্দ্র তখন গ্রামোফোন কোম্পানির প্রিয়তম এবং শ্রদ্ধেয়তম শিল্পী। গ্রামোফোন কোম্পানির শিল্পী এবং শিল্পীদের শিক্ষক (ট্রেইনার) অনেকেই আসতেন, আব্বাসউদ্দিনও এলেন, সবিনয়ে নিবেদন জানালেন, "আমার বন্ধু শৈলেন রায় অসাধারণ ভালো কবি, কিন্তু অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থাগ্রস্ত। আপনি যদি দয়া করে আমার এই যথার্থ গুণী বন্ধুটিকে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন তো ওর বড় উপকার হয়।"

অত্যন্ত দরদী হৃদয় ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের। কবি শৈলেন রায়ের রচিত কিছু কবিতা আব্বাসউদ্দিনের মুখে শুনে তাঁর ভালো লাগল। কবি-মন ছিল তাঁর, কবিতার খাঁটি সমঝদার ছিলেন তিনি। কবির আথিক দুরবস্থায় শীর্ণ দেহ চোখে না দেখলেও হৃদয় দিয়ে অনুভব করে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আপনার দায়িত্ব আমি নিলাম। আপনি আমার রেকর্ডের জন্য আর রঙমহলে অভিনীত নাটকগুলির জন্য গান লিখতে থাকুন। আপনার গান পিছু ভালো দক্ষিণার ব্যবস্থা আমি করব।"

এবং করেছিলেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার রূপে ৺শৈলেন রায় অমর হয়ে আছেন, তার মূলে সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্রের সহানুভূতি এবং সহায়তা।

কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ছিল যেমন উদাত্ত এবং মধুর, সঙ্গীত জগতে

তিনি ছিলেন যেমন অনন্য প্রতিভাবান বিরাট পুরুষ, তাঁর হৃদয়ও যে ছিল তেমনি উদার, মধুর এবং বিরাট, নিকট প্রতিবেশী প্রত্যক্ষদর্শীরূপে তার প্রচুর প্রমাণ পেয়ে আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি, কারণ একই ব্যক্তি 'শিল্পী' হিসেবে যেমন মহান, 'মানুষ' হিসেবেও তেম্নি, এ রকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। দুঃখের সঙ্গে বল্ছি আমি এমন ব্যক্তি দেখেছি যাঁরা 'শিল্পী' হিসেবে যেমন অসাধারণ ভালো, 'মানুষ' হিসেবে তেম্নি অসাধারণ মন্দ।

'রঙ্ মহল'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান উদ্যোক্তা এর পত্তন করেছিলেন অর্থকরী ব্যবসা বুদ্ধি থেকে নয়, নাট্য-শিল্পকে ভালবেসে সেই ভালবাসার উন্মাদ নেশায়। শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত লোকসানের দায়ে যখন রঙ্ মহলের বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন কৃষ্ণচন্দ্র বললেন বাঙালীর এমন একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু ঘটবে, এ কল্পনাও অসহ্য। তিনি অকাতরে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন, বললেন এ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। নিজে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন একাধারে অভিনেতা এবং গায়ক রূপে। মঞ্চ-গায়ক রূপে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। টিকেট-ক্রেতা দর্শকের ভিড়ে প্রেক্ষাগৃহের পূর্ণতা নিশ্চিত করতে রঙ্ মহলে অভিনীত নাটকে যাতে কৃষ্ণচন্দ্রের মঞ্চে আবির্ভাব এবং গান প্রচুর থাকে, তারই ব্যবস্থা করা হলো। তাতে ভালো ফলই দেখা গিয়েছিল। নাটকগুলি তাদের নিজগুণে খুব জোরালো না হলেও মঞ্চে আবির্ভূত কৃষ্ণচন্দ্রের গানের যাদুতে নাটকগুলি উৎরে যেতো। প্রতিটি নাটকের শেষ যবনিকা পতনের পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে দর্শকদের মনে হতো অমৃতকণ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের গানগুলি শুনেই টিকেটের দাম উশুল হয়ে গেছে, নাটকের আনন্দটুকু ফাউ।

কয়েক বছর পিছিয়ে চলে যাই ১৯২৫ সালের এক সন্ধ্যায়। তখনকার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের (বর্তমান বিধান সরণীর) ধারে শিশির ভাদুড়ির নাট্য-মন্দিরের অভ্যন্তরে যার মধ্যে অভিনীত হচ্ছে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির নির্দেশে অভিনেতা নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী বিরচিত

'সীতা' নাটক। প্রেক্ষাগারে অন্যতম দর্শক আমি তেরো বছরের বালক, কয়েকদিনের জন্য ঢাকা থেকে কলকাতায় মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে মামাদের সঙ্গে নাটক দেখতে এসেছি।

একটি দৃশ্যের কথা বলি। অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্রের সীতাহীন দরবার। সীতা তখন বনবাসে; প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামই তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে, এবং সেজন্য তিনি ঐ দৃশ্যে বিষণ্ণ। তাঁর বাঁ দিকের সিংহাসনটি সীতার অভাবে শূন্য। এর আগে এই দরবারের দৃশ্যেই সীতা ছিলেন রামের পাশে। বৈতালিকের ভূমিকায় অনন্য গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র গেয়েছিলেন মন-মাতানো আনন্দ সঙ্গীত ঃ

"জয় সীতাপতি সুন্দরতনু
প্রজারঞ্জনকারী।"

এমন আশ্চর্য মন-মাতানো গান কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠেই সম্ভব। এই সীতাহীন দৃশ্যে বৈতালিকবেশী কৃষ্ণচন্দ্র গাইলেন মন কাঁদানো গান ঃ

"অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে,
লক্ষ্মীহীন এ শূন্যপুরী, মন যে কেমন করে।
কোথায় আলো? কোথায় আলো?
আকাশ ধরা কালোয় কালো,
ফিরব না আর মা হারানো প্রাণ-কাঁদানো ঘরে।
হায় সরযূর সজল সুরে শোকের গীতা গো
ডাকছে যেন করুণ তানে, কোথায় সীতা গো?
কোথায় সীতা? কোথায় সীতা?
জ্বলছে বুকে স্মৃতির চিতা,
কাজলা রাতের বেদনবাঁশী বাজছে করুণ স্বরে।"

তখনও বৈদ্যুতিক ধ্বনি-বর্ধক এবং সম্প্রসারক যন্ত্র চালু হয় নি, কিন্তু তিনি এই বেদনার্ত গানটি গেয়ে প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে যে অশ্রু ঝরানো বৈদ্যুতিক শিহরণ জাগিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়। সে রাত্রে শ্রোতাদের একাধিক 'এনকোর' (আরেকবার গাইবার সমবেত

অনুরোধ) শুনে তাঁকে পুরো গানখানা তিনবার গাইতে হয়েছিল। তার পরবর্তী 'আবার' গাইবার অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন নি, করলে আবার 'এনকোর' শুনতে হবার ভয়েই হয় তো। আমার এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, আমি কিছু মাত্র অতিরঞ্জন করি নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ভিখারীর ভূমিকায় "ঐ মহা-সিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে" গানখানি গেয়ে তিনি সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে যে ভাবের বন্যা বইয়ে দিতেন, তা নিষ্প্রভ করে দিত চাণক্যের ভূমিকায় অসাধারণ নটের অভিনয়।

মঞ্চ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ৺কৃষ্ণচন্দ্রের একটি অনবদ্য সৃষ্টি "নেচেছ প্রলয় নাচে হে নটরাজ!" যার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান "প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ!" শেষোক্ত গানটি কবিগুরুর 'নটরাজ' নৃত্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত। গানটি পঙ্কজ কুমার মল্লিক মহাশয়ের সুকণ্ঠে গীত হয়ে অসামান্য জনপ্রিয় হয়েছিল।

৺কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরম ভক্ত এবং এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করি যে তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত অসাধারণ ভালো গাইতেন, যদিও (এবং আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গতভাবেই) সেরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীদের সম্পর্কে আলোচনায় ৺কৃষ্ণচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয় না। গ্রামোফোন রেকর্ডে কবিগুরুর 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে' এবং 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' গান দুটি ৺কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে যে অনির্বচনীয় যাদুর সৃষ্টি করেছে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মার্কামারা বিশারদদের মধ্যেও কেউ কি তার কাছাকাছিও পৌঁছাতে পেরেছেন বা কখনো পারবেন? আমার মনে হয় এই ক্ষণজন্মা সঙ্গীত-সাধকের অতুলনীয় কণ্ঠে আরো কিছু বাছাই করা রবীন্দ্র-সঙ্গীত—বিশেষ করে ধ্রুপদ এবং টপ্পা অঙ্গের—রেকর্ড করিয়ে রাখা উচিত ছিল। ধ্রুপদ এবং টপ্পা গানে ৺কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ গুণী। (তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বেতারে, মুরারি সঙ্গীত সম্মেলনে এবং আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাঁর অনবদ্য ধ্রুপদ এবং টপ্পা সঙ্গীত পরিবেশনে।)

পঙ্কজ মল্লিকের অতি সুন্দর ভাবে গাওয়া কবিগুরুর 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' গানটি শুনে কৃষ্ণচন্দ্র অভিভূত হলেন, কিন্তু তাঁর মন্তব্য হলো নটরাজের প্রলয় নাচের উল্লেখ থাকলেও এ গানে নটরাজী তাণ্ডব অনুপস্থিত ; এতে প্রলয়ের রুদ্র কল্লোল নেই, আছে মলয়ের মৃদু হিল্লোল ; গানটির লয়ও দুরন্ত নয়, ঝিমন্ত, অশান্ত নয়, প্রশান্ত। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নটরাজ এবং তাঁর প্রলয়-নাচ সম্পর্কিত এমন একটি গান তিনি এমন সুরে আর ছন্দে গাইবেন, যাতে নটরাজের রুদ্র তাণ্ডব রূপটি ফুটে ওঠে। তাঁর এই ইচ্ছারই ফল (কল্‌কাতা বেতারের প্রিয় পরিভাষায় 'ফলশ্রুতি') সুর-ফাঁক তালে গীত 'নেচেছ প্রলয় নাচে' গানটি ঃ

"নেচেছ প্রলয় নাচে
হে নটরাজ তাথৈ তাথৈ।
বাজে গাল ববম্ ববম্,
হাতে কাল ডম্বরু ঐ।
অতীতের হাড়মাল
বিরাটের বুকে দোলে,
নাচনের তালে জটার
সে জটিল বাঁধ খোলে,
আজি এই মুক্তিহারার
মরণ-ভীতি ভেঙেছ কই ?
নয়নের বহ্নি তোমার
সহসা সৃষ্টিনাশী,
ললাটের আশার আলোক
সে শিশু শশীর হাসি
প্রলয়-লীলার মাঝখানে সে
ডাকে মাভৈ, ডাকে মাভৈ।"

কৃষ্ণচন্দ্রের ফরমায়েশে এবং নির্দেশে গানের বাণী রচনা করেছিলেন নাট্যকার-গীতিকার জলধর চট্টোপাধ্যায়, যাঁর 'অসবর্ণা' নাটকের

মঞ্চাভিনয়ে দক্ষ নৃত্যশিল্পী দ্বারা নটরাজের প্রলয় নৃত্যের রূপায়নের সঙ্গে সঙ্গে হাতে তাল দিতে দিতে সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র এই গানটি গেয়ে যে অনির্বচনীয় শিহরণ জাগিয়েছিলেন, গ্রামোফোন রেকর্ড শুনে তা অনুভব করা সম্ভব নয়। জলধর চট্টোপাধ্যায়েরই 'সত্যের সন্ধান' নাটকে কবির ভূমিকায় মঞ্চে সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্রের গাওয়া "স্বপন যদি মধুর এমন, হোক সে মিছে কল্পনা, জাগিও না আমায় জাগিও না" এবং "আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি এই বনে" এই দুটি মঞ্চ সঙ্গীত বাংলা গানের ভাণ্ডারে দুটি অমূল্য সম্পদ। দুটি গানই গ্রামোফোন রেকর্ডে সঙ্গীতাচার্যের অনুকরণে আবার গেয়েছেন যথাক্রমে একালের জনপ্রিয় গায়ক মান্না দে এবং অনুপ ঘোষাল, কিন্তু অনুকরণে মূলের কাঠামোটুকু থাকলেও যাদু অনুপস্থিত। সঙ্গীতাচার্যের "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" গানটিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মান্না দে গ্রামোফোন রেকর্ডে অনুকরণ করেছেন। এই গানটি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

বাংলা এবং হিন্দী ছায়াছবিতে ৺কৃষ্ণচন্দ্র যে গান গেয়ে গেছেন, মর্মস্পর্শিতায় তার তুলনা মেলে না। কয়েকটি উদাহরণ 'চণ্ডীদাস' চিত্রে "ফিরে চল আপন ঘরে" এবং "সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে", 'দেবদাস' চিত্রে "যেতে হবে, যেতে হবে, যেতেই হবে রে" এবং হিন্দী 'পূরণ ভকৎ' চিত্রে "যাও যাও মেরে সাধু, রহো গুরুকে সঙ্গ" ও "ক্যা কারণ হ্যায় অব রোনেকা'। ছবিগুলি যে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তার অনেকখানিই এনে দিয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রের গাওয়া গানগুলি।

এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়েই বলা যায় যে কীর্তন গানে কৃষ্ণচন্দ্রের চাইতে বড় 'পণ্ডিত' বা 'ওস্তাদ' হয় তো অনেক ছিলেন, কিন্তু তাঁর সমকক্ষ 'গায়ক' কেউ ছিলেন না। এবং বঙ্গ দেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে যেমন ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, তেমনি কীর্তন গানকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দিয়েছে কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন গান।

বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি শুধু একজন অসাধারণ শিল্পী নন,

তাঁর ঐতিহাসিক মূল্যও অসামান্য। তিনি বাংলা গানের জগতে যে এক অসাধারণ নবযুগ এনে দিয়েছেন, তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে তাঁর ঠিক আগেকার যুগের বাংলা গানের সঙ্গে তাঁর নিজের এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য বাঙালী গায়কদের গানের তুলনা করলেই।

হিন্দি এবং উর্দু ভাষায় পাকা তালিম নিয়ে তিনি ভাল দখল আয়ত্ত করেছিলেন, এবং দুটি ভাষাতেই তাঁর উচ্চারণ ছিল চমৎকার নিখুঁত, গ্রামোফোন রেকর্ডে এই দুই ভাষায় তাঁর গাওয়া দাদ্‌রা, ভজন, ঠুংরি, গজল, কাওয়ালী, কাজরী প্রভৃতি নানা বিভিন্ন শ্রেণীর গান ছিল অসাধারণ জনপ্রিয়। বাংলার কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার বাইরে কে. সি. দে নামে ছিলেন রেকর্ড জগতের সম্রাট শিল্পী।

বাংলার বাইরে অসামান্য রেকর্ড-সফল উর্দু রেকর্ড থেকে বেশ কিছু গানের ছক নিয়ে সেকালের বিখ্যাত গীতিকার হেমেন্দ্র কুমার রায়কে দিয়ে বাংলা গান লিখিয়ে সেই গানগুলি হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে গেয়ে অসামান্য জনপ্রিয় করে তিনি বাংলা গানে অসাধারণ নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্যের চমক এনে দিয়েছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

(১) 'শুন্‌ছ সখি, শুন্‌ছ সখি
শিখ্‌ছি শুধু চোখের ভাষা।
শিখছি যত বাড়ছে তত
আমার শিশু ভালবাসা।"

(২) "বেলের কুড়ি, ফুটলি সখি কাজ্‌লা রাতে
কেমন করে মিল্‌বি এখন অলির সাথে ?"

(৩) চোখের জলে মন ভিজিয়ে
যায় চলে ঐ কোন্ উদাসী ?"

(৪) "গেঁথেছি এই ফুলের মালা
কিনবে বলে ফুল-পিয়াসী।"

কৃষ্ণচন্দ্রের কলকাতায় প্রযোজিত এবং তাঁর অভিনয় এবং সঙ্গীত পরিচালনায় সমৃদ্ধ 'পুরবী' বাণীচিত্রটির উল্লেখ করেছি এই আলোচনার প্রথম দিকে। ছবিটি তৈরী হয়েছিল একজন উচ্চাঙ্গ

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একনিষ্ঠ বৃদ্ধ সাধকের কাহিনী নিয়ে। এই সাধকের ভূমিকায় অভিনয় করে বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী রাগে কয়েকখানা গান গেয়েছিলেন তিনি, গরীব ঘর থেকে নিয়ে আসা এক সঙ্গীত-প্রতিশ্রুতিপূর্ণা বালিকা শিষ্যাকে রাগ সঙ্গীতে তালিম দেবার ছলে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—পর পর প্রতিটি ঋতুর আগমনে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্তন যেমন দেখেছিলাম রূপোলী পর্দার বুকে, তেমনি সঙ্গীত গুরুর ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে শুনেছিলাম ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন রাগের অনবদ্য রূপায়ণ। জনগণের সঙ্গীত-রুচির মান নেমে যাচ্ছে, এজন্য শুধু শ্রোতারা দায়ী নয়, সঙ্গীত শিল্পীরাও দায়ী। যাঁরা শস্তা জনপ্রিয়তার লোভে সত্যিকারের ভালো গানের সাধনা ছেড়ে খেলো গানের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, তাঁদের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপেই 'পূরবী' ছবিটি নির্মাণ করিয়েছিলেন আদর্শ-বাদী সঙ্গীত সাধক কৃষ্ণচন্দ্র। ছবিটি চল্‌তি ভাষায় 'মার খেয়েছিল'। অর্থাৎ প্রচুর আর্থিক লোক্‌সান হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রের। কিন্তু লোক-সানের জন্য কোনো রকম অনুশোচনা করেন নি আদর্শবাদী কৃষ্ণচন্দ্র।

আমার মনে হয় কৃষ্ণচন্দ্র জন্মান্ধ হলে হয় তো এমন অনন্য গায়ক হতেন না। জীবনের প্রথম দশকে তিনি পৃথিবীর আলো দুচোখ ভরে দেখেছিলেন, কখনো কল্পনা করেন নি একদিন তাঁর দু চোখের আলো চিরতরে নিবে যাবে, সারা বিশ্ব ডুবে যাবে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে অসীম অন্ধকারে।

দৃষ্টি হারাবার সীমাহীন বেদনার হাহাকার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাঁর রেকর্ডে গাওয়া কয়েকটি গানে। প্রথম গানে (ওমা দীন-তারিণী তারা) তিনি বলেছেন :

"পাঠাইলে যদি এ ভব সংসারে
(কেন) চির পরাধীন করিলে আমারে ?
পরাধীনতার সহে না যাতনা
নে মা কোলে তুলে ওগো দুখহরা।"

আরেকটি গান ঃ

আমার নিয়েছ নয়ন তারা !
দিলে শুধু তার দুটি কিনারায়
বাদল বরিষা ধারা ।
আসে দিন, যায়, আসে বিভাবরী,
সকলি আমার সমান, শংকরী,
দেখাইও পথ দিয়ে পদ-তরী
কোরো না গো দীনে পথ হারা ।"

আরেকটি ঃ

"ওমা তারা দুখহরা,
আঁখির দৃষ্টি হরণ করে
করলি আঁধার বসুন্ধরা ।
দুঃখ কোথায় করলি হরণ ?
মুছিয়ে দিলি ধরার বরণ,
দিনের শেষে অভয় চরণ
চাইব যখন দিস্ মা ধরা ।"

এবং আরো একটি ঃ

"কালো মায়ের রূপ-সায়রে
ভাসিয়ে দিলেম জীবন-তরী,
চরণ কমল ফুট্‌বে কখন
সেই আশাতে জীবন ধরি ।"

বালক বয়সে চিরতরে দৃষ্টি হারাবার দুঃসহ ট্র্যাজিডির আঘাতে যে গভীর বেদনা বোধ এই গানগুলির প্রেরণা, কৃষ্ণচন্দ্রের মনের অবচেতন স্তরে চির প্রবাহিত সেই ট্র্যাজিক অনুভূতিই তাঁর কণ্ঠস্বরে দিয়েছিল মর্মস্পর্শিতার অনন্য যাদু ।

সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাতের কথা বলি। ১৯৫৯ সালে এক উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত দ্বিপ্রহরে দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার তরফ থেকে আমি তাঁর সঙ্গে তাঁরই সেই একতলার গানের

ঘরে মুখোমুখী বসে সাক্ষাৎকার করেছিলাম, যে ঘরে ১৯২০ সালে বসে আট বছরের বালক আমাকে আমার প্রথম সঙ্গীত গুরু রূপে তিনি তালিম দিয়েছিলেন দুটি বাংলা গানে।

১৯৫৯ সালের এই সাক্ষাৎকারে আমার সঙ্গে ছিল বন্ধু সন্তোষ কুমার দে। সে তখন গ্রামোফোন কোম্পানির প্রচার বিভাগের ম্যানেজার। এই সাক্ষাৎকার, এবং 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের আরো কয়েকজন বাছাই করা কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা সেই করেছিল।

"ঈশ্বরের কথা আগে কখনো তেমন মনোযোগ দিয়ে ভাবিনি।" বলেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর সেই বজ্রাঘাততুল্য ট্র্যাজিডির কথা স্মরণ করে। "সেই প্রচণ্ড আঘাতে কিছুদিন মনটা অসাড় হয়ে রইল গভীর হতাশায়। তারপর ঈশ্বর এলেন আমার ভাবনায়। কার কাছে দুঃখ জানাব, নালিশ জানাব? কার শরণ নিয়ে মনে সান্ত্বনা পাব? এমন কাউকে তো দরকার? তিনিই হলেন ঈশ্বর। প্রথম মনে হয়েছিল ব্যর্থ হয়ে গেল জীবনটা। তারপর সুরের সাধনায় পেলাম সান্ত্বনা, পেলাম তাঁর করুণাময় পরশ। ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলে মনে করেছিলাম। এখন আর তা মনে করি না। অনুভব করি তিনি পরম দয়াময়। আমার দৃষ্টি তিনি হরণ করে নিয়েছেন বলেই তো আমি এমন একান্তভাবে সুরের সাধনা করতে পেরেছি, অগুণতি শ্রোতাকে আনন্দ দিয়ে তাঁদের ভালবাসা পেয়েছি। এক হাতে তিনি যা হরণ করে নিয়েছেন, অন্য হাতে তিনি আমাকে তার চাইতে অনেক বেশী দিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে আমার আর কোনো নালিশ নেই।"

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নালিশ হয় তো তাঁর আর ছিল না, কিন্তু দৃষ্টি-হীনতার ট্র্যাজিডির জন্য তাঁর অবচেতন মনে গভীর বেদনা বোধ প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই আমার ধারণা, এবং এই বেদনা বোধই তাঁর কণ্ঠ সঙ্গীতকে অমন অসামান্য মর্মস্পর্শী ট্র্যাজিক মাধুর্য দিয়েছিল, যা অন্য কোনো গায়কের কণ্ঠে পাই নি। গভীর দুঃখকে তিনি অতিক্রম

করেছিলেন সুরের যাদুতে আত্মহারা হয়ে। গভীর দুঃখ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল তাঁর অতুলনায় দুঃখজয়ী সঙ্গীত।

বিশিষ্ট সঙ্গীত-তাত্ত্বিক রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে রেকর্ড-জগতে তাঁর ভারত-জোড়া খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার ফলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পান নি।

উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতেও তিনি উচ্চমানের ওস্তাদ ছিলেন, বিশেষ করে ধ্রুপদে এবং টপ্পায়, কিন্তু সঙ্গীত-সব্যসাচী কৃষ্ণচন্দ্র ওস্তাদী গানের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখতে চান নি; চাইলে তা হতো তাঁর বহুমুখী সঙ্গীত প্রতিভার প্রতি অবিচার। তাঁর সাধনা ওস্তাদির সাধনা ছিল না, তিনি সঙ্গীতের যে মহান স্তরে উঠেছিলেন, তা ওস্তাদির অনেক উর্ধে।

কৃষ্ণচন্দ্রের পর ১৯৫৯ সালেই তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বনামধন্য গায়ক কুমার শচীন দেব বর্মনের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার করেছিলাম। তিনিও তাঁর অসীম শ্রদ্ধাভাজন গুরুর সম্বন্ধে অনুরূপ মতই প্রকাশ করেছিলেন। কুমার শচীনদেব পরে প্রথম গুরু কৃষ্ণচন্দ্রের সানন্দ সম্মতি নিয়েই কিছুদিন সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেবের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু গায়করূপে তিনি যে বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তার ভিতটি গড়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, একথা সেদিন বন্ধুবর সন্তোষ-কুমারকে এবং আমাকে বলেছিলেন কুমার শচীন দেব।

শুধু তাই নয়, তিনি বলেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র গায়ক হিসেবে যেমন মধুর এবং মহান ছিলেন, মানুষ হিসেবেও ছিলেন তেমনি মধুর এবং মহান।

কঠোর বাস্তব থেকে দূরে সরে উচ্চ গজদন্ত মিনারে বসে সাধনা করার মতো পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন (ইংরাজী পরিভাষায় 'এস্‌কেপিস্ট') সঙ্গীত সাধক তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজ-সচেতন দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন গায়ক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামীদের খবর তিনি আগ্রহের সঙ্গে রাখতেন, যার সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত সাধনার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। বিশেষ করে

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান" সেই মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় ভরা ছিল তাঁর হৃদয়।

তাঁদের উদ্দেশে একটি গানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যাবার বাসনা তিনি অনুভব করেছিলেন গভীর ভাবে। তাঁর সেই বাসনা রূপ নিয়েছিল একটি উদ্দীপনাময়ী মর্মস্পর্শী গানে, যেটি তাঁর ফরমায়েশ এবং নির্দেশ অনুযায়ী রচনা করে দিয়েছিলেন গীতিকার মোহিনী চৌধুরী এবং সুর সংযোগ করে গভীর শ্রদ্ধায় ভরা আবেগপূর্ণ উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে গেয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র।

গানটি বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ভাণ্ডারে একটি অমূল্য সম্পদ। গানখানির পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলার প্রিয়তম গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে সম্পর্কিত আলোচনাটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ করি :

মুক্তির মন্দির সোপান-তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা
বন্দী শালার ঐ শিকল-ভাঙা
তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে ?

যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি।
এসো স্বদেশ প্রেমে মোরা দীক্ষা লভি
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি'
যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগাল আশা,
মৌন মলিন মুখে যোগালো ভাষা,
আজ রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি
বিজয়-লক্ষ্মী দেবে তাদের গলে ॥

ভারতের রত্ন সঙ্গীতাচার্য—তারাপদ চক্রবর্তী

তারাপদ চক্রবর্তীকে 'সঙ্গীতাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ এবং একটি চিঠিতে* 'ভারতের রত্ন' আখ্যা দিয়েছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, যিনি নিজেই ছিলেন ভারতের রত্ন। তারাপদ বাবু কলকাতা থেকে মাইহারে খাঁ সাহেবকে চিঠি দিয়েছিলেন একবার মাইহারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা প্রকাশ করে। বিনীত-স্বভাব তারাপদ বাবু চিঠিতে তাঁর নিজের একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিলেন, পাছে শুধু নাম থেকে খাঁ সাহেব তাঁকে চিনতে না পারেন। তারাপদ বাবুর চিঠির জবাবে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ যে চিঠি লিখেছিলেন, তার গোড়ার দিকটার কিছু অংশ এই রকম ঃ

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

পরম স্নেহভাজন,

আদাবান্তে নিবেদন এই

শ্রীশ্রীবিজয়ার শতকুটি অভিনন্দন জানিবেন। ঈদ মুবারক। আপনার গুণে আমি মুগ্ধ, এত পরিচয় দেবাব কুন প্রয়োজন করে না। আপনি আমার হৃদয়ে গাথা। আপনি ভারতের রত্ন শুনামধন্য মহাপুরুষ। আপনি দয়া করে আসিবেন জেনে অধিক সন্তুষ্ট হলেম।

---

* মূল চিঠিখানার একটি সম্পূর্ণ প্রতিরূপ এই গ্রন্থের অন্যত্র মুদ্রিত হলো।

যতদূর মনে পড়ছে ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমিতির আমন্ত্রণে গান শোনাতে গিয়েছিলেন তখনকার বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত গায়ক, বিষ্ণুপুরের ৺রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর ঘরানার সেরা প্রতিনিধি জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী (১৯০২-১৯৪৫)। জ্ঞানবাবুর কণ্ঠ মাধুর্য এবং কণ্ঠ চাতুর্য ছিল এমনি অসাধারণ, যে অসমঝদার সাধারণ শ্রোতারাও তাঁর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। বাংলায় শাস্ত্রীয় রাগ সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে তাঁর দান ছিল অসামান্য। গ্রামোফোন রেকর্ডে হিন্দী খেয়াল এবং ভজন গান তিনি যেমন চমৎকার গেয়েছেন, তেমনি তাঁর গাওয়া রাগভিত্তিক বাংলা গান ও গ্রামোফোন রেকর্ডে (হিজ মাস্টার্স ভয়েস, মেগাফোন এবং ওড়িয়ন) বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যেত। কয়েকটি উদাহরণঃ আমায় বোলো না ভুলিতে বোলো না (বেহাগ), একি তন্দ্রা-বিজড়িত আঁখিপাত (মালকোষ), অনিমেষ আঁখি আমার (বাগেশ্রী), সৃজন ছন্দে আনন্দে (তিলক কামোদ), রাধারমন মদন মোহন (দরবারী কানাড়া), দামিনী দমকে যামিনী আঁধার রে (জয় জয়ন্তী), উজল কাজল দুটি নয়ন-তারা (মালগুঞ্জ), ভীষ্মজননী ভাগীরথী (কাফি), দুর্গে দুখহারিণী (দুর্গা), বরষ বরষ থাকি চাহিয়া (গৌড়সারঙ্গ), ঘন পবন শিহরিত বনানী রে (বাহার), শ্মশানে জাগিছে শ্যামা (কৌশী কানাড়া), শূন্য এ বুকে পাখী মোর (ছায়ানট), যা সখি আন তারে (ইমন), বাজিল শ্যামের বাঁশী (ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ) ইত্যাদি।

গোঁসাইজির গানের ব্যবস্থা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে। আগ্রহী শ্রোতায় প্রশস্ত হলটি ভরে গিয়েছিল, আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। উদ্যোক্তা ছাত্রবৃন্দ ছিলেন বাঙালী সুলভ বিলম্ব-বিলাস থেকে বিস্ময়করভাবে মুক্ত। কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে গান শুরু হলো। তানপুরা আর বাঁয়া তবলা আগেই সুরে বেঁধে রাখা হয়েছিল ; অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে পরখ করে সুর নিখুঁত করে নিতে দু'তিন সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগল না। দৃশ্যটি

৫৩ বছর বাদে আজও (১৯৮৮) যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মঞ্চের সামনের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় বসে শূন্যহস্ত অনন্য গায়ক জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী। গৌরবর্ণ, সৌম্যদর্শন, মুখে আনন্দময় হাসি। তাঁর ডানদিকে হারমোনিয়াম বাদক, বাঁ দিকে তাঁর কিছুটা পিছনে তরুণ তানপুরাবাদক। এই শেষোক্ত মানুষটি ছোটখাট, মুখে পরম নির্লিপ্তভাব।

প্রথমে মনে হয়েছিল স্বর বৈচিত্র্য স্রষ্টা সানাই-ওস্তাদের পিছনে এক সুরে যে অবিরাম বৈচিত্র্যহীন পোঁ-ধ্বনি জাগিয়ে রাখে, ঐ তরুণ তানপুরা বাদকটির ভূমিকা বোধ হয় তারই ভূমিকার অনুরূপ। কিন্তু অচিরেই আমাদের ভুল ভেঙেছিল। সেই কথাই বলি।

গোঁসাইজি গান ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আসর মন্ত্রমুগ্ধ। অভিভূত সমঝদারদের কণ্ঠে উচ্চ প্রশংসা ধ্বনিত হয়ে উঠছিল বার বার। গোঁসাইজির গানের সঙ্গে তাঁর হারমোনিয়াম বাদকও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা পাচ্ছিলেন।

কিন্তু কেউ প্রশংসা করে বলছিলেন না তানপুরা-বাদকটি চমৎকার তানপুরা বাজাচ্ছেন। এমন কি তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও হয়তো অনেকেই সচেতন ছিলেন না। অপরিহার্য হয়েও অবহেলিত, অলক্ষিত সেই নির্লিপ্ত-চিত্ত তানপুরা-বাদকটির প্রতি আমার মন সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল।

দৃশ্যটিকে পাল্টে দিলেন উদারমনা গায়ক জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ। সুরবিহারের একটি মনোরম পর্ব আপন কণ্ঠে পরিবেশন করে তিনি নিজের গান থামিয়ে তরুণ তানপুরা-বাদককে ইশারা করলেন।

গোঁসাইজির কণ্ঠ নীরব। সরব হয়ে উঠল তানপুরা-বাদকের কণ্ঠে অসাধারণ সুরবিহার এবং দুরূহ-মধুর তান বৈচিত্র্য। বৈদ্যুতিক বিস্ময়ের শিহরণ ছড়িয়ে গেল সারা কার্জন হলে। আমার কাছাকাছি বসে তন্ময়ভাবে গান শুনছিলেন ঢাকার সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অভিজ্ঞ সমঝদার। বিস্ময়ের ঝোঁক সামলে ওঠার পর তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, "কি

আশ্চর্য ! শিষ্য দেখছি গুরুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।" তাঁদের সবিস্ময় সপ্রশংস আলোচনা শুনে বুঝলাম, আলোচনা না শুনলেও আন্দাজ করা আমার পক্ষে শক্ত হতো না, যে উচ্চমানের তালিম এবং প্রচুর 'রিয়াজ' (সাধনা) ছাড়া এমন অসাধারণ গায়ন-দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

আমার বয়স তখন দুই দশকের কিছু বেশী। সঙ্গীতের ব্যাপারে তখন সুপণ্ডিত না হলেও খুব আনাড়ী ছিলাম না। বাল্যকালে সঙ্গীত শিক্ষায় হাতে খড়ি হয়েছিল সঙ্গীতাচার্য অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের (১৮৯৩-১৯১৯) কাছে কলকাতায় যখন কিছুদিন তাঁর বাড়ির মুখোমুখী মাতামহ অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের ভবনে ছিলাম। তার অনেক পরে, কার্জন হলে সর্বপ্রথম জ্ঞান গোস্বামীর গান শোনার মাস কয়েক আগে ঢাকা-প্রবাসী অসাধারণ গুণী ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতে তালিম নিতে শুরু করেছিলাম। ঢাকা-নিবাসী মুড়াপাড়ার ধনী জমিদার, ভারত-বিখ্যাত তবলা-বিশারদ এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে এবং অন্যত্র বিভিন্ন আসরে শুনে-ছিলাম ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের জয় জয়ন্তী, দরবারী কানাড়া, মেঘ-মল্লার, মিয়া-কী-মল্লার, পুরিয়া, বসন্ত এবং বাহার প্রভৃতি রাগে খেয়াল এবং ভৈরবী, খাম্বাজ, কাফি, পিলু, সিন্ধুড়া, তিলং, দেশ প্রভৃতি রাগে ঠুংরি। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী 'জ্ঞান গোঁসাই' নামেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন। তাঁকে জ্ঞানবাবু না বলে 'গোঁসাইজি'ও বলতেন অনেকে। কার্জন হলে গোঁসাইজির সেই সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি (১৯৩৫) সমাপ্ত হবার পর জানলাম তাঁর সঙ্গে যিনি তানপুরা বাজিয়েছিলেন এবং পরে আপন কণ্ঠের তানে আসর মাতিয়েছিলেন, তাঁর নাম তারাপদ চক্রবর্তী। ভাবলাম গোঁসাইজি তালিম দিয়ে আশ্চর্য শিষ্য তৈরি করেছেন, যিনি গুরুর নাম রাখবেন গুরুকে অতিক্রম করে। তখন জানতাম না তারাপদ বাবু গোঁসাইজির কাছে কখনো তালিম পান নি, অর্থাৎ তারাপদ বাবু গোঁসাইজির

শিষ্য নন। এই সময়ে তারাপদবাবু মুখ্য গায়ক রূপে আসর মাত করার মতো যথেষ্ট শক্তিধর গায়ক হয়েও কেন কলকাতা থেকে ঢাকায় আসতে রাজি হয়েছিলেন গোসাঁইজির গানের সঙ্গে কণ্ঠ-সহায়তা দিতে, যা সাধারণতঃ গুরু গায়কের সঙ্গে শিষ্য গায়কই দিয়ে থাকে?

পরে যা জেনেছিলাম, সেই জ্ঞান থেকে বলি, ক্ষণজন্মা অনন্য গায়ক জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর (১৯০২-১৯৪৫) সঙ্গে অনন্য প্রতিভাধর তারাপদ চক্রবর্তীর (১৯০৯-১৯১৯) সম্পর্ক ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং গভীর স্নেহের। তারাপদ বাবুর প্রকাশ্য সঙ্গীত জীবন শুরু হয়েছিল গায়ক রূপে নয়, তবলাবাদক রূপে। বেতারের আদি যুগে কলকাতায় কোনো এক গানের আসরে প্রখ্যাত তবলাবাদক এবং সুরকার রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে তারাপদ বাবুর পরিচয় হয়। রাইবাবু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে অল্প বেতনে অন্যতম তবলাবাদকের পদে নিযুক্ত করেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে, যার সঙ্গে তিনি নিজে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন সঙ্গীত বিভাগে। তবলা বাদনে অসাধারণ দক্ষতা এবং মাধুর্য ছিল তারাপদবাবুর, তাই বেতারের বিশিষ্ট গাইয়েরা তাঁর তবলা-সঙ্গত খুবই পছন্দ করতেন। বিশেষ করে অনন্য স্বর-সাধক জ্ঞান গোস্বামী, কলকাতা বেতারের অন্যতম সেরা গায়ক। তখন কোনো অনুষ্ঠানই আগে টেপ করে রাখার ব্যবস্থা ছিল না, এবং বেতারের অনুষ্ঠানগুলিও সুযোগ ও সুবিধা মতো যখন তখন স্থির হতো। একদিন গোঁসাইজি তাঁর গান সম্প্রসারণের জন্য পূর্ব নির্ধারিত এবং ঘোষিত সময়ে এসে পৌঁছতে পারলেন না, অথচ তখন বেতারের বহু শ্রোতা উৎকর্ণ হয়ে তাঁদের বেতার যন্ত্রের সামনে বসে আছেন জ্ঞান গোঁসাইর গান শুনবার আশায়। বেতারের সঙ্গীত বিভাগের রাইচাঁদ বড়াল এবং বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট বাদক শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার বেগতিক দেখে তারাপদ বাবুকে বললেন, "নাকু, তুমি তো শুনছি একটু আধটু গানও গেয়ে থাকো। জ্ঞানবাবু তো এলেন না। তুমি তার বদলে গাইতে পারবে?"

তারাপদ বললেন, "পারব।" এবং পারলেন। বেতারে প্রথম গেয়েই বেতার শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন তারাপদ বাবু। বিস্ময় জাগল শ্রোতাদের মনে। জ্ঞানবাবুর মতো দুর্ধর্ষ গায়কের 'প্রক্সি' অমন নিপুণভাবে দিতে পারে যে গায়ক, এতদিন সে কোথায় ছিল ?

এরপর থেকে বেতার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে প্রায়ই বেতারে গাইতে লাগলেন তারাপদবাবু। এইভাবে শুরু হলো তার প্রকাশ্য গায়ক জীবন।

নিজের অনন্যতায় অটল আস্থাবান এবং উদারহৃদয় শিল্পী, বাংলার সঙ্গীত জগতেব অন্যতম বিরাট পুরুষ গোঁসাইজি তারাপদ-বাবুর কৃতিত্বে বিন্দুমাত্র ঈর্ষান্বিত বা শংকিত না হয়ে হলেন পরম আনন্দিত, ভাবলেন এমন প্রতিভাকে উৎসাহিত করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদ থেকে যখন আমন্ত্রণ পেলেন, গোঁসাইজি তারাপদবাবুকে বললেন, "নাকু, তুমি ও ঢাকায় চলো, আমার সঙ্গে গাইবে।" তারাপদবাবু গেলেন। এবং ঢাকার সঙ্গীত রসিকদের হৃদয় জয় করে এলেন। কলকাতা বেতারে গোঁসাইজির গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত অনেক করেছিলেন তারাপদ-বাবু। গোঁসাইজিকে কণ্ঠ সঙ্গত দিয়ে প্রথম সহায়তা করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে (১৯৩৫)।

আমার জীবনের সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার পর কার্জন হল থেকে বাড়ি কিরবার পথে সারাক্ষণ আমার মন আচ্ছন্ন করে রইল তারাপদ চক্রবর্তীর অসাধারণ বিস্ময়কর সঙ্গীত পরিবেশন, যা শুনে কয়েকজন প্রবীন শ্রোতা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, "শিষ্য দেখছি গুরুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম ঢাকায় ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতে প্রাথমিক তালিম পাওয়ার পর কলকাতায় ফিরে যদি রাগ সঙ্গীতের চর্চা চালিয়ে যাওয়া স্থির করি, তাহলে সঙ্গীত জগতের বিরাট পুরুষ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর

কাছে না গিয়ে তাঁর ঐ অসাধারণ তৈরি শিষ্যটির খোঁজ করে তাঁর শরণ নেব, কারণ তিনি এখনও 'বিরাট' হন নি বলেই আমার মতো প্রথম শিক্ষার্থীকে সহানুভূতির সঙ্গে যত্ন নিয়ে শেখাবেন, কিন্তু জ্ঞান গোস্বামীর মতো বিরাট গুণী আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করতে রাজি হবেন না, অথবা রাজি হলেও তাচ্ছিল্যভরেই শেখাবেন, মন দিয়ে শেখাতে আগ্রহ বোধ করবেন না।

ঢাকা শহর, বিশেষ করে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যবান গেণ্ডারিয়া অঞ্চল (যেখানে ছিল আমার তিনপুরুষের বসত বাড়ি) এবং শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বুড়ি গঙ্গা নদী ছিল আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ১৯৩৬ সালে এম. এ. পরীক্ষায় বসার জন্য কলকাতায় চলে এসে আবার ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলাম এবং দ্বিতীয় দফায় ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁর কাছে তালিম নিয়েছিলাম। সম্ভব হলে ঢাকাতেই কায়েম (settled) হতাম, কিন্তু ঢাকায় পছন্দ মতো ভাগ্য খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হয়ে ভাগ্যানুসন্ধানের জন্য কলকাতায় চলে আসতে হলো।

১৯৪০ সালে সর্বশেষ ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে (যার পরে আর ঢাকায় যাইনি) আমি তারাপদ বাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম। ঐ সময়েরই কাছাকাছি তারাপদবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ৺অখিলবন্ধু ঘোষ, যিনি পরে রাগপ্রধান এবং আধুনিক গানে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর তালিম অসাধারণ ফলপ্রসূ হয়েছিল অখিলবন্ধুর কণ্ঠে, কারণ তিনি প্রচুর 'রিয়াজ' করে গুরুদত্ত তালিমের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। গুরুর মতো বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীতে তিনি একনিষ্ঠ হতে না পারলেও অখিলবন্ধুকে আমি সঙ্গীতাচার্যের একজন সার্থক শিষ্য বলেই মনে করি, কারণ তাঁর গানে বাংলা গানের মান অনেকখানি উন্নত হয়েছে, তিনি বিশুদ্ধ রাগ-সঙ্গীতে সঙ্গীতাচার্যের তালিম না পেলে যা হতো না। এই প্রসঙ্গে ৺অখিলবন্ধুর পরবর্তী আধুনিক যুগের গায়ক অনুপ ঘোষালের কথাও অনিবার্যভাবেই মনে আসছে। অনুপের প্রাথমিক

সঙ্গীত শিক্ষা হয়েছিল সর্বশ্রী ৺সন্তোষ সেনগুপ্ত এবং ৺মণি চক্রবর্তীর কাছে। বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতে তার বেশির ভাগ শিক্ষা সঙ্গীতাচার্য ৺গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর শিষ্য আমার প্রিয় বন্ধু ৺সুখেন্দ গোস্বামীর (১৯১১-৭৫) কাছে। ৺সুখেন্দু বাবুরই মাধ্যমে বছর খানেক তারাপদ বাবুর কাছে রাগ-সঙ্গীতে তালিম পাবার সৌভাগ্যও তার হয়েছিল। অর্থাৎ ৺অখিলবন্ধুর মতোই বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতে উচ্চতর সাধনার ভিৎটি তার কণ্ঠে এবং মগজে ভালভাবেই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সেই ভিতের ওপর উচ্চতর সাধনার ইমারত গড়ে তোলার একনিষ্ঠ প্রয়াস, অর্থাৎ সোজা কথায় একনিষ্ঠভাবে 'ক্ল্যাসিক্যাল' গানেই লেগে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ ৺অখিলবন্ধুর মতোই অনুপের ও সাংসারিক দায়িত্ব পালনের জন্য ছিল প্রচুর অর্থ উপার্জনের পরম প্রয়োজন। তাই উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতের উপযোগী কণ্ঠ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সার্থক শিল্পী ৺অখিলবন্ধুর মতোই অনুপ ঘোষাল উচ্চ আদর্শ এবং সাংসারিক প্রয়োজনের মধ্যে একটা সন্তোষজনক আপোস-রফা করে নিয়েছে। চট্-জল্‌দি জনপ্রিয়তা এবং অর্থ লাভের লোভে স্থূল রুচির খোরাক যোগানো গান পরিবেশন না করে সে একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত, সুপরিকল্পিত ভাবে পরিবেশন করছে উচ্চমানের লোক-গীতি, ভক্তি-গীতি, নজরুল গীতি, দ্বিজেন্দ্র গীতি, দেশাত্মবোধক গান, কাব্য-গীতি, নাট্য-গীতি ইত্যাদি যা ব্যাপকভাবে সাধারণ শ্রোতাদের একসঙ্গে মনোরঞ্জন এবং সঙ্গীত-রুচির উন্নতি সাধন করবে।

সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র মানস (জন্মঃ ১৯৪২) আশানুরূপ ভাবেই আদর্শ সঙ্গীত-সাধক পিতার যোগ্য উত্তরসাধক-রূপে বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতের একাগ্র সাধনায় অটল। সঙ্গীতাচার্যের সঙ্গীত-মানসের উত্তরাধিকারের মর্যাদা সে বজায় রেখে চলেছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

তারাপদ চক্রবর্তীর জন্ম হয়েছিল ১৩ই এপ্রিল, ১৯০৯ তারিখে পূর্ব বাংলায় ফরিদপুর জেলার কোটালি পাড়া পরগণার পশ্চিম পাড়া গ্রামে, এক সম্ভ্রান্ত, সাত্ত্বিক, নিষ্ঠাবান, সঙ্গীতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে।

পিতা কুলচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা দুর্গামণি দেবী। শিশুকাল থেকেই তারাপদ ছিলেন সুরের নেশাগ্রস্ত। শিশু তারাপদর দু'হাতে দুটি বালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি হাতের বালা দিয়ে থালা বাটির গায়ে আঘাত করতেন। তাতে যে আওয়াজের সৃষ্টি হতো, নিবিষ্ট মনে তিনি তার সুর শুনতেন। শৈশব থেকেই সুরের প্রেমিক তিনি বাল্যে পদার্পণ করে ভিখারীদের গাওয়া গান এবং যাত্রাভিনয়ের গান শুনে সেই সব গানের হুবহু নকল করে গেয়ে শুনিয়ে বাড়ির সবাইকে বিস্মিত করতেন। এইভাবে বাল্যকালেই বোঝা গিয়েছিল তিনি অসাধারণ 'শ্রুতিধর', যে গান একবার শোনেন, তাই তাঁর মনে গেঁথে যায়। তাছাড়া বালক তারাপদর একটি বিচিত্র অভ্যাস ছিল পুকুরে গলা জলে দাঁড়িয়ে বা জলে ভাসতে ভাসতে গলা ছেড়ে গান গাওয়া। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ যে কণ্ঠের অসাধারণ বলিষ্ঠতা, গাম্ভীর্য, মাধুর্য এবং সাবলীল দক্ষতার অধিকারী হয়েছিলেন, তার ভিত্তি বোধ হয় অনেকটা গড়ে উঠেছিল তাঁর বাল্যকালের ঐরূপ কণ্ঠ সাধনার ফলে। আমার এরকম অনুমানের কারণ আমি ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁর মুখে শুনেছি তিনি কিছুদিন ঐভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে গলা সাধতেন।

চক্রবর্তী বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতিমত চর্চা ছিল। তারাপদ চক্রবর্তীর পিতামহ তারাপ্রসন্ন ছিলেন বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুপুরী ঘরানার তালিম প্রাপ্ত বিশিষ্ট গায়ক। পিতা কুলচন্দ্র চক্রবর্তী এবং জেঠামশাই রামচন্দ্র চক্রবর্তী (ন্যায়রত্ন) দুজনই পেয়েছিলেন খুর্জা ঘরানার বিশিষ্ট গায়ক ওস্তাদ জহুর খাঁ সাহেবের তালিম। তাছাড়া রামচন্দ্র চক্রবর্তী কিছুকাল নাটোরের মহারাজার সভাপণ্ডিত এবং সভা গায়কের পদও অলংকৃত করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ধ্রুপদী এবং পাখোয়াজী। কুলচন্দ্র এবং রামচন্দ্র দুভাই তাঁদের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট সঙ্গীত গুণীর সংস্পর্শে আমার সুযোগ পেয়েছিলেন, ফলে তাঁদের সঙ্গীত-ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল। উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতে তারাপদ চক্রবর্তী পিতা এবং জেঠামশাইর কাছে ভালো তালিম

পেয়েছিলেন তারাপদ। সাত বছর বয়স থেকেই তাঁর তবলা বাজাবার নেশা ছিল, তারাপদ তবলা বাদনেও বেশ পোক্ত হয়ে উঠলেন পিতা ও জেঠামশাইর নির্দেশাধীনে প্রচুর অভ্যাসের ফলে।

বাড়ীতে সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল ; তারাপদ সেই টোলে ন্যায়, তর্কশাস্ত্র এবং ব্যাকরণ শিক্ষা করলেন। পরে তিনি পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণের কাছে কাব্য এবং কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত বলতেন, "তারাপদ অসাধারণ মেধাবী ছাত্র। সে যা একবার শোনে তাই তাঁর মনে গেঁথে যায়, দ্বিতীয় বার বলতে হয় না।"

পিতার ইচ্ছানুসারে তারাপদ ১৬ বছর বয়সে উক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিদ্যাভূষণের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন।

এরপর সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর সুযোগ্য পুত্র এবং উত্তর-সাধক, রাগ সঙ্গীতের অসাধারণ গায়ক মানস চক্রবর্তীর লিখিত নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করি ঃ

"এর পরই তাঁর জীবনাকাশে দুর্যোগের ছায়া ঘনিয়ে এলো। পিতা উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়লেন। উপার্জন না হলে পেট চালানো দুষ্কর, তাই তাঁকে কলকাতা মহানগরীর পথে পা বাড়াতে হলো, বাড়ীতে রইলেন অক্ষম পিতা, মা, স্ত্রী ও ছোট ভাই। সহায় সম্বল-হীন কিশোর জন-সমুদ্রের শহর কলকাতায় উপস্থিত হলেন। খুঁজে পেতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিলেন আশ্রয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খবর পেলেন পিতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, পুত্রের দর্শনের জন্য ব্যস্ত। তাই পিতৃ-সন্দর্শনে পুত্র আবার ঘর পানে ছুটলেন। যখন পৌঁছলেন তখন পিতার জীবনদীপ নির্বাপিত প্রায়, যেন পুত্রকে দেখবার জন্যই বেঁচে ছিলেন। তিনদিন পরে পিতা কুলচন্দ্র পরলোক গমন করলেন, অকূল পাথারে ভাসিয়ে গেলেন এই সংসারটিকে, তার কর্ণধার করে রেখে গেলেন তাঁর পুত্রকে।...

"সদ্য পিতৃহারা পুত্র আবার কলকাতায় ফিরে গেলেন। এবার আশ্রয় নিলেন মাতুলের গৃহে। তিনি এই তরুণের সঙ্গীত-শিক্ষার

ব্যবস্থা করে দিলেন তাঁর পরিচিত তখনকার বিখ্যাত অন্ধ গায়ক সাতকড়ি দাস মালাকারের কাছে।”

তারাপদবাবু আমাকে বলেছিলেন, “অসামান্য গুণী খেয়াল এবং টপ্‌পা গাইয়ে ছিলেন সাতকড়ি বাবু। সুর-বিহারে যেমন পাকা, তেম্‌নি লয়ে। লয়ের ওপর বিশেষ জোর দিতেন তিনি, বলতেন পাকা খেয়াল-গাইয়ে হতে হলে তবলা খুব ভাল করে শেখা দরকার; গায়ক নিজে তবলা-বাদনে পাকা হলে কোনো বদ্‌-মতলবী তবল্‌চি তবলার প্যাঁচে ফেলে তাঁকে লয়ের লড়াইতে হারিয়ে দিয়ে আসরে অপদস্থ করতে পারে না। আমার মনে মনে পণ ছিল লয়ে এমন পোক্ত গায়ক হতে হবে, যেন আসরে কোনো তবল্‌চি আমাকে নাকাল করতে না পারে। তবলাটা তাই খুব পরিশ্রম করে ভালো করেই শিখেছিলাম।”

তাছাড়া লড়াইবাজ তবল্‌চিকে জব্দ করবার জন্য কিছু জটিল, শক্ত লয়ের গানও শিষ্য তারাপদকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন অত্যন্ত পাকা লয়দার-গায়ক সাতকড়ি বাবু, যাদের ব্রহ্মাস্ত্র রূপে প্রয়োগ করে তারাপদ একাধিক বাঘা তবল্‌চিকে জব্দ করেছিলেন। লয়ের লড়াইতে কোনো তবল্‌চিই বাংলার গৌরব সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীকে জব্দ করতে পারেননি।

তারাপদবাবুর মুখে শুনেছি তাঁর সঙ্গীত-গুরু অন্ধগায়ক সাতকড়ি দাস মালাকার ছিলেন সর্বভারতীয় মানের একজন প্রথম সারির অসাধারণ খেয়াল এবং টপ্‌পা গায়ক। ঠুংরিও যে তিনি অসাধারণ ভালো গাইতে পারেন, সেটা প্রমাণ করবার জন্যই একবার গেয়ে শুনিয়ে শ্রোতাদের বিস্মিত করে দিয়ে বলেছিলেন, “দেখলে তো ইচ্ছে করলে ঠুংরিও ভালোই গাইতে পারি?” কিন্তু খেয়াল আর টপ্‌পার চাইতে ঠুংরির মর্যাদা অনেক কম বলে তিনি ঠুংরি গাইতে চাইতেন না। নিজে প্রচুর কষ্ট করে গান শিখেছিলেন সাতকড়িবাবু, তাই শেখাতেন খুব কৃপণতা করে। তাঁর মনের ভাবটা ছিল, “আমি যে সব ভালো চিজ এত কষ্ট করে অনেক দিনের সাধনায়

লাভ করেছি, আমার শিষ্যরা তা সহজে আর তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে কেন?" গুরুর শিক্ষাদানে এই কৃপণতা এবং অতি ধীর গতি শিষ্য তারাপদর অসহ্য মনে হলো। তিনি সঙ্গীত শিক্ষার পথে দ্রুত অগ্রসর হবার উদ্দেশ্যে একটু অসাধু উপায় অবলম্বন করলেন। সাতকড়ি বাবু যখন তাঁর ঘরে একা বসে 'রিয়াজ' (গান অভ্যাস) করতেন, তখন পুরো গানই গাইতেন, গলায় নানা রকমের কাজ তুলতেন, অসামান্য শ্রুতিধর তারাপদবাবু গোপনে বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে তাঁর 'রিয়াজ' শুনে শুনে তাঁর রিয়াজ করা গানগুলি হুবহু মনে মনে তুলে নিয়ে গিয়ে সেগুলি অন্যত্র রিয়াজ করতে লাগলেন। এইভাবে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সাতকড়িবাবুর সংগ্রহের অনেক মূল্যবান রত্ন তারাপদবাবু চুরি করে আত্মসাৎ করে ফেললেন।

সেই সময় সপ্তাহে দুদিন কলকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীত-রসিক অ্যাটর্নী মন্মথ গাঙ্গুলির পুত্র হীরু গাঙ্গুলি (যিনি পরে তবলা বাদনে ভারত-বিখ্যাত হয়ে ছিলেন) সাতকড়িবাবুর গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতেন তবলা-বাদনে হাত পাকাবার জন্য। তারাপদবাবু অন্ধ গুরুকে সপ্তাহে ঐ দুদিন গাঙ্গুলি বাড়িতে নিয়ে যেতেন, আর সঙ্গত শেষ হয়ে গেলে গুরুকে সঙ্গে করে গুরুজীকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিতেন। একদিন মন্মথ গাঙ্গুলি মশাইর কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে সাতকড়িবাবু বললেন ছেলেটি তাঁর কাছে গান শিখছে। মন্মথ-বাবু এবং হীরুবাবু, দুজনেরই ছিল সাতকড়ি বাবুর ওপর অসীম শ্রদ্ধা। তাই তাঁরা ভাবলেন এমন অসাধারণ গুরুর শিষ্য নিশ্চয়ই ভালো গাইবে। তাঁরা গান শুনতে চাইলেন তারাপদবাবুর। সাতকড়িবাবু বললেন, "আরো কিছুদিন শিখুক, তারপর একদিন শুনবেন ওর গান। এখনো আপনাদের শোনাবার মতো তৈরি হয় নি।"

তবু যেটুকু তৈরি হয়েছে সেটুকুই শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন গাঙ্গুলি পিতা-পুত্র। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিলেন সাতকড়িবাবু,

তাঁর ভয় হলো শিষ্য তারাপদ এঁদের কাছে তাঁর মান রাখতে পারবে না।

কিন্তু তারাপদ বাবুর গান শুনে তাঁরা তিনজনই বিস্ময়ে স্তম্ভিত। মন্মথ বাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে সাতকড়ি বাবুর হাত ধরে ঐকান্তিক অনুরোধের সুরে বলেছিলেন, "সাতকড়ি, এই ছেলেটিকে তুমি ভালো করে শেখাও। এ যে অসাধারণ গাইয়ে হবে। তোমার নাম রাখবে।"

বাড়ি ফিরে রাগে ফেটে পড়লেন সাতকড়ি বাবু: "এই দুর্লভ বন্দিশের গান তুমি পেলে কোথায়? আমি তো তোমাকে এ গান শেখাই নি।"

শিষ্য তারাপদ তখন অকপটে স্বীকার করলেন আড়াল থেকে সাতকড়ি বাবুর রিয়াজ শুনে শুনে তাঁর সংগ্রহের এই অসাধারণ বন্দিশের গানটি এবং আরো অনেক দামী দামী 'চিজ' তিনি কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন।

সাতকড়ি বাবু বললেন, "তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি চোর। আমার বহু কষ্টে সংগ্রহ করা দামী চিজ তুমি চুরি করে নিয়েছ। আমি তোমাকে আর শেখাব না।"

শিষ্য তারাপদ বললেন, "গুরুজি। আমি না জেনে যদি অপরাধ করে থাকি, আপনি নিজ গুণে তা ক্ষমা করুন। আমি তো আপনার পুত্রতুল্য।"

রাগের ঝোঁকটা কেটে যাওয়ার পর সাতকড়ি বাবু তাঁর এই অসাধারণ শ্রুতিধর শিষ্যটিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং শিক্ষাদানে আর আগেকার মতো কঞ্জুষপনা করেন নি। কিছুদিন বাদে তিনি তাঁকে অকপটে বলেছিলেন, "আমার আর তোমাকে শেখাবার কিছু নেই। আমার যা পুঁজি ছিল, তা থেকে তোমাকে কিছু আমি তালিম দিয়েছি। আর তার চাইতে অনেক বেশী তুমি আড়ি পেতে চুরি করে নিয়েছ। আমার বহু বছরে সংগৃহীত সম্পদ অল্প দিনেই আত্মসাৎ করে নিয়েছ অসাধারণ শ্রুতিধর স্মৃতিমান তুমি।

ঈশ্বরের কাছে আমি এই আশা প্রকাশ করে যাচ্ছি যে উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতে তুমি সারা ভারতের প্রথম সারির গায়ক হয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে।”

ঈশ্বর যে এই বহির্দৃষ্টিহীন মহান সঙ্গীত-সাধকের আশা সানন্দ উৎসাহের সঙ্গেই পূর্ণ করেছেন তা আমরা দেখেছি।

তারাপদ বাবুর সর্বশেষ সঙ্গীত-গুরু বাঙালীর সঙ্গীত-চর্চার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ভারত বিখ্যাত বিরাট পুরুষ গিরিজাশংকর চক্রবর্তী (১৮৮৮–১৯৪৮)। দুঃখের বিষয় তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। তারাপদ বাবুর মুখে তাঁর বিষয়ে যা শুনেছি তাই সংক্ষেপে বলি। সঙ্গীত-সাধক গিরিজা বাবু ছিলেন বহরমপুরের অবস্থাপন্ন অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি প্রথমে ধ্রুপদ শিখেছিলেন মুর্শিদাবাদের মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর সভাগায়ক বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে; তারপর ধামার, খেয়াল এবং টপ্‌পা শিখেছিলেন রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে। সেকালের ঠুংরি-সম্রাট মৌজুদ্দিন খাঁর কাছে গিরিজাবাবু নিবিড়ভাবে ঠুংরি গানের তালিম পেয়েছিলেন, যে মৌজুদ্দিনের অদ্ভুত খেয়ালী চরিত্রটিকে বাংলার সঙ্গীত-সাহিত্যে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন সঙ্গীত-প্রেমী অমিয় সান্যাল মহাশয় তাঁর ‘স্মৃতির অতলে’ গ্রন্থে। মৌজুদ্দিনের কাছে শেখা ঠুংরি গানগুলি গিরিজাবাবু এত ভালো গাইতেন যে আড়াল থেকে শুনলে মনে হতো স্বয়ং মৌজুদ্দিন গাইছেন। গিরিজা বাবু বেশ কিছু সেরা ঠুংরি গান শিখেছিলেন বিশিষ্ট ঠুংরি বিশারদ ভাইয়া সাহেবের কাছেও। মোটা অঙ্কের মাসিক দক্ষিণা দিয়ে খেয়াল গানের তালিম নিয়েছিলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের চাচা সম্পর্কিত রঙ্গিলা ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ মুজঃফর খাঁ সাহেবের কাছ থেকে। তরানার (অথবা তেলেনা’র) তালিম নিয়েছিলেন ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে। সর্বশেষ তালিমে গিরিজা বাবু রাগ সঙ্গীতের বহু দুর্লভ সম্পদ পেয়েছিলেন ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবের

কাছে, যিনি ওস্তাদদের ওস্তাদ বলে 'খলিফা' নামে অভিহিত হতেন।

তারাপদ চক্রবর্তী যেভাবে গিরিজাশঙ্করের শিষ্য হলেন, সেই ভাবটিও নাটকীয়। এক্ষেত্রে গুরুই অগ্রণী হয়ে শিষ্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তারাপদ বাবু তখন অসাধারণ খেয়াল-গায়ক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কলকাতায় ভারত বিখ্যাত হারমোনিয়াম-বাদক মণ্টু ব্যানার্জীর বাড়িতে একটি ঘরোয়া গান-বাজনার আসরে গান গাইছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী। আসরে উপস্থিত ছিলেন বাংলার (তথা ভারতের) সঙ্গীত জগতের বিরাট পুরুষ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী! বহু বছর ধরে সারা ভারতের সেরা সেরা গায়কের সেরা সেরা গান শুনে শুনে অভ্যস্ত তিনি মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেলেন তারাপদ বাবুর অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত সঙ্গীত পরিবেশন শুনে। তাঁর দুই চোখ ভরে উঠল আনন্দের অশ্রুতে। কোনো একটি আকস্মিক উপলক্ষ্যে গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস-এর উচ্চারিত 'ইউরেকা, ইউরেকা'-র মতোই তাঁর মন বলে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি।"

তারাপদ বাবুর গান শেষ হবার পর গিরিজাবাবু তাঁকে কাছে ডাকিয়ে এনে বললেন, "আমি অনেক বছর ধরে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের নানা ঘরানার বহু অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করেছি, জীবনের সায়াহ্নে এসে ভাবছিলাম এসব দুর্লভ জিনিস কাকে দিয়ে যাব, কে এদের সদ্ব্যবহার করে লাভবান হতে পারবে? আজ তোমার গান শুনে মনে হচ্ছে তুমি নিশ্চয় পারবে, আমি যেন এতদিন তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। কণ্ঠ সাধনায় তুমি অসাধারণ সিদ্ধ হয়েছ, সেদিক দিয়ে তোমাকে আমার শেখাবার কিছু নেই। এখন আমার তোমাকে তালিম দেওয়া মানে আমার এই অমূল্য সংগ্রহের চিজগুলো তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া, যাতে তুমি রিয়াজ করে এদের কণ্ঠায়ত্ত করে নিতে পার। কালই তুমি আমার বাড়িতে চলে এসো। কালই তালিম শুরু হবে।"

এত বড় গুণী নিজেই সাগ্রহে এগিয়ে এসে তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিচ্ছেন, একে অভাবনীয় সৌভাগ্য বলেই শিরোধার্য করে নিলেন তারাপদবাবু। পরদিনই গিরিজাবাবুর বাড়িতে চলে গেলেন ; প্রথম তালিমে পেলেন বারোয়াঁ। রাগে অতি উচ্চ মানের একটি ধ্রুপদ গান। গানটি খুব সহজ চালের নয়, তাই গিরিজা বাবু ভেবেছিলেন শিষ্য তারাপদকে অন্ততঃ আরেকবার তালিম তিনি না দিলে এ গানটি তার পুরোপুরি আয়ত্ত হওয়া অসম্ভব।

শিষ্য কিন্তু পরদিনই এসে বললেন, "গুরুজি, কাল খুব রিয়াজ করে গানটি আয়ত্ত করে ফেলেছি। নতুন গান দিন।"

গিরিজা বাবু বললেন, "আগে পরীক্ষা দাও কেমন তৈরী হলো গানখানা। পরীক্ষা পাশ করলে নতুন গান দেবো।"

পাখোয়াজী কেবল বাবু বাড়িতেই ছিলেন। তিনি পাখোয়াজ নিয়ে বসলেন। তারাপদবাবু বারোয়াঁ রাগের যে ধ্রুপদ গানখানায় গিরিজাবাবুর কাছে গত কাল তালিম পেয়েছিলেন, সেটি হুবহু তালিম মাফিক নিখুঁতভাবে গেয়ে শুনিয়ে দিলেন। বিস্মিত পুলকিত গিরিজাশঙ্কর বললেন, "সত্যিই তুমি অসাধারণ শ্রুতিধর। পার তো রোজ একখানা গান নিয়ে যেয়ো।"

গিরিজাশঙ্করের গুরুভ্রাতা বিশিষ্ট ধ্রুপদী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

"আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা গিরিজাশঙ্কর আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ওহে, তারাপদকে তুমি জান ? আমার জীবন-সায়াহ্নে এমন একটি প্রতিভা-সম্পন্ন শিষ্য পাইলাম, যাহাকে আমার সমগ্র শিক্ষা উজাড় করিয়া দিতে পারিলে আমার শিক্ষার সার্থকতা বজায় থাকে। অনেক ছেলেকে শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু ভিতরে বস্তু না থাকিলে দিব কাহাকে ? জানি না আর কতদিন এ জগতে থাকিয়া এই ছেলেটিকে শিক্ষা দিয়া যাইতে পারিব।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে গুরু গিরিজাশঙ্কর চার বছর শিষ্য তারাপদকে তালিম দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর এই

অসাধারণ শিষ্যটি সম্বন্ধে তিনি শিষ্যের একটি জন্মদিনের উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই মত প্রকাশ করেছিলেন ঃ

"আমি সারা ভারতের বিশিষ্টতম সঙ্গীত-শিল্পীদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু আমার গুরু ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ (রামপুর) ছাড়া এমন সঙ্গীত-প্রতিভা আর দেখি নাই।"

এই প্রসঙ্গে সারা ভারতের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত এবং সম্মানিত তবলা-বিশারদ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রী রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব্বই বছর অতিক্রম করে শেষ বিদায় নেবার আগে মত প্রকাশ করে গেলেন, "আমার দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে এবং ভারতব্যাপী সঙ্গীত অভিজ্ঞতায় তারাপদর মতো অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভা এবং অসামান্য শ্রুতিধর গায়ক আর দেখি নাই। সরল এবং জটিল, হাল্‌কা এবং ভারি ওজনের যে-কোনো রকমের কাজ তারাপদ অনায়াসে এমন শ্রুতিসুন্দরভাবে গলায় তুলিত, অন্য কোনো একজন গায়কের গলায় এত বৈচিত্র্যের উদাহরণ পাই নাই। আমার মাঝে মাঝে মনে হইত সেকালের অদ্বিতীয় শ্রুতিধর গায়ক যদুভট্ট বুঝি বা আরো পরিপক্ক হইয়া তারাপদ রূপে নব জন্ম নিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার দুর্লভ প্রতিভার জন্য যে স্বীকৃতি, যে সম্মান তাহার প্রাপ্য ছিল, তাহার এক দশমাংশও সে পাইয়া যায় নাই। এই দুঃখ, এই অভিমান নিয়াই তাহাকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই চলিয়া যাইতে হইল।"

যতদূর মনে পড়ে ১৯১৯ সালে ৺আবদুল করিম সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসে কিরানা ঘরানার সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর একবার এই রায় বাহাদুর কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ঘরোয়া আলোচনা-বৈঠকে বসেছিলেন, বালিগঞ্জ অঞ্চলে তারাপদবাবুর এক বিশিষ্টা ছাত্রীর ভবনে। বৈঠকে কেশববাবু এবং তারাপদবাবুর পাশে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শ্রীমতী হীরাবাঈ ঘোষণা করেছিলেন কলকাতায় তিনি একটি

'আবদুল করিম সঙ্গীত শিক্ষায়তন' প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী, যেখানে কিরানা ঘরানার শ্রেষ্ঠ গায়ক ৺আবদুল করিম খাঁ প্রবর্তিত স্টাইলে খেয়াল ও ঠুংরি শেখানো হবে। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীকে শ্রীমতী হীরাবাঈ কি অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখেন তার প্রমাণ পেয়ে অভিভূত হলাম। একবার কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে তারাপদবাবু গান গাইছিলেন। মঞ্চে তারাপদবাবুর অনতিদূরে বসে তাঁর গান শুনেছিলেন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব ; তারাপদবাবুর পরেই তাঁর গান গাইবার পালা। তারাপদবাবুর গান শেষ হতেই করিম খাঁ সাহেব ইসারায় তাঁকে কাছে ডেকে নিলেন, তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গীতে তারাপদ বাবুর মাথায় হাত রেখে বললেন, "বেটা, তুমি সুরকে ভালবেসেছ। সুর ও তোমাকে ভালবাসবে।" এই মর্মস্পর্শী ঘটনাটির উল্লেখ করে শ্রীমতী হীরাবাঈ বললেন, "অমর সুরসাধক আবদুল করিম তারাপদবাবুর গান শুনে অভিভূত হয়েছিলেন, যেমনটি আর কারো গান শুনে হন নি। অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভা তারাপদবাবুও খাঁ সাহেবের অনন্য গায়ন-শৈলী আপন মগজে, হৃদয়ে আর কণ্ঠে আত্মস্থ করে নিয়েছেন, যেমনটি আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। অতি বিস্ময়কর দুর্লভ শক্তির অধিকারী তারাপদবাবু। আমার বাসনা এবং প্রার্থনা আমার পরিকল্পিত আবদুল করিম সঙ্গীত শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ এবং প্রধান তালিমদাতা রূপে থাকবেন তারাপদবাবু ; এ পদের জন্য তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। আর আমার প্রার্থনা এই শিক্ষায়তনের পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি রূপে থাকবেন আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জগতে সর্বজনমান্য রায় বাহাদুর কেশববাবু।"

কেশববাবু এবং তারাপদবাবু, দুজনই সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। শ্রীমতী হীরাবাঈর পরিকল্পনা এবং তারাপদবাবু সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ উচ্চ ধারণা আমাকে পরম তৃপ্তি দিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল আমাদের তালিম দেবার সময়ে কখনো কখনো হঠাৎ

গাইবার মেজাজ এসে যেত তারাপদবাবুর। আমরা তাঁর এই অত্যন্ত লোভনীয় আকস্মিক মেজাজের প্রতীক্ষা করতাম। এবং তাঁর এ জাতীয় মেজাজ এলেই বলতাম, "আজ তাহলে তালিম থাক, আপনার গানই হোক।' (এবং মনে মনে বলতাম, "তাও তো এক রকম তালিমই হবে)। এই হঠাৎ এসে পড়া মেজাজে তিনি যখন আবদুল করিমের গান গাইতেন, তখন চোখ বুজে শুনলে মনে হতো স্বয়ং ৺আবদুল করিম গাইছেন।

শ্রীমতী হীরাবাঈ এই শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠার জন্য এত আগ্রহী হয়েছিলেন যে বলেছিলেন এটি চালু হলে তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে যাতায়াত করে এবং দরকার মতো থেকে বিনা দক্ষিণায় তালিম দিয়ে যাবেন। দুঃখের বিষয় শ্রীমতী হীরাবাঈর বাসনা পূর্ণ হয় নি, এবং শ্রীমতী সেজন্য গভীর মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন। আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গান অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সঙ্গীত প্রিয় বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিল বলে যেন বাঙালী জাতির প্রতি সপ্রশংস কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল শ্রীমতী হীরাবাঈর আবেগপ্রবণ শিল্পী হৃদয়। তাই তিনি চেয়েছিলেন কল্‌কাতায় একটি আবদুল করিম সঙ্গীত শিক্ষায়তনে নিয়মিত তালিমদানের মাধ্যমে আবদুল করিমের গায়ন শৈলীর ধারাটি বঙ্গদেশে প্রবাহিত থাকুক।

তাঁর বাসনা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু তাঁর এই বাসনাটির কাছে আমি ঋণী, কারণ এটি শ্রীমতীর মনে না এলে তাঁর সঙ্গে আমার কোনোদিনই পরিচয় ঘটত না।

শ্রীমতী হীরাবাঈ ছিলেন আমার চাইতে পাঁচ বছরের বড়ো, দিদি স্থানীয়া, এবং তারাপদবাবুর চাইতে দু বছরের ছোট, কনিষ্ঠা ভগিনী স্থানীয়া। সঙ্গীতাচার্যের স্নেহভাজন শিষ্যরূপে আমাকে তিনিও স্নেহভাজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাই ভেবে নিয়েছিলেন।

শ্রীমতী হীরাবাঈ সারা ভারতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা গায়িকা ; এই অনন্যা প্রতিভাময়ীর চোখে সঙ্গীতাচার্য তারাপদকে যেন নতুন করে দেখে আরো গভীর ভাবে অনুভব করলাম সঙ্গীত জগতের কি

অসাধারণ বিরাটপুরুষ আমাদের অতি অমায়িক আপনজন কাছের মানুষ তারাপদবাবু, আমরা যাঁর এত কাছে বলেই সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না তাঁর বিরাটত্ব। তারাপদ বাবু সম্বন্ধে আমার চোখ খোলাই ছিল, কারণ ১৯৩৫ সালে ঢাকার কার্জন হলে তাঁকে প্রথম দর্শন এবং শ্রবণের চমক-লাগানো অভিজ্ঞতাটি কোনোদিন ভুলতে পারি নি, কিন্তু শ্রীমতী হীরাবাঈ যেন আমার ছুই চোখ আরো অনেকখানি খুলে দিয়ে গেলেন।

তিনি যে কদিন কলকাতায় ছিলেন, তাঁর আশ্রয় ছিল হাজরা রোডের উত্তর ধারে মহারাষ্ট্র নিবাসে। সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি খুশী মনেই বলেছিলেন বিকেলে ছুটো থেকে চারটে পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘরে বিশ্রাম করেন, ঐ সময়ে যদি যাই তো সেই বিশ্রামের অঙ্গ হিসেবেই আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে তিনি খুশীই হবেন। তাঁর স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুগ্ধ আমি, তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সুলভ আচরণে অভিভূত হলাম।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, তামাম হিন্দুস্তানে পয়লা সারির "এমন বিরাট গুণী আপনার গুরু,—আপনি তো মহা সৌভাগ্যবান। তালিম কেমন চলছে? পাকা তবল্‌চির সঙ্গে রোজ 'রিয়াজ' করছেন তো?"

আমি বললাম, "সেরা সেরা বন্দিশের আস্থায়ী অন্তরার আর সুর বিহারের তালিম নিচ্ছি। আমার প্রতি গুরুজি তারাপদবাবুর স্নেহের অন্ত নেই, 'চিজ' দানে কিছুমাত্র দ্বিধা বা কার্পণ্য নেই, সুরের দিক দিয়ে আমার কণ্ঠে তাদের অমর্যাদা হবে না, আমার কণ্ঠের ওপর এই বিশ্বাস তাঁর আছে। গানের জন্যে যেটুকু সময় দিতে পারি সুরের দিকটাই রিয়াজ করি, তবল্‌চির সঙ্গে বসাটা আর হয়ে উঠছে না সময়ের অভাবে।"

"তাহলে তো আপনি কোনোদিনই আসরের গাইয়ে হতে পারবেন না।" ছুঃখের সঙ্গে বললেন শ্রীমতী হীরাবাঈ। মনে হলো আমার স্বীকারোক্তিতে তিনি স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা অনুভব

করেছেন। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন আমি সঙ্গীতাচার্যের একজন অনেকখানি অগ্রসর (advanced) শিষ্য।

তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন গানের পাখী ওড়ে স্থর আর লয়, এই দুটি পাখা সমান্তরালভাবে সচল রেখে। আগে স্থরের দিকটা ঠিক করে পরে স্থবিধা মতো লয়ের দিকটা ঠিক করে নেবো, তা হয় না। গাইয়ে হতে হলে প্রথম থেকেই তবলা সঙ্গতের সঙ্গে রীতিমতো রিয়াজ করতে হবে।

আমি তখন তাঁকে আমার সঙ্গীত-চর্চা সম্বন্ধে সত্য কথাটাই বললাম। তারাপদবাবু যা জানতেন তাই তাঁকেও জানালাম এই বলে ঃ

"আমার জীবনে সাধনার প্রধান ক্ষেত্র দুটি ঃ সাহিত্য এবং সঙ্গীত। এই দুটি বিষয়েরই চর্চা আমি করে আসছি বাল্যকাল থেকে। ক্রমে আমার জীবনে সাহিত্য এত প্রবলভাবে প্রধান হয়ে উঠে আমার সময়ের এত বেশী এলাকা দখল করে নিয়েছে, যে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তবলা-সঙ্গত-সহ রিয়াজের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আসরে গাইয়ে হবার বাসনা আমার নেই, কারণ আমি জানি তা হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সাহিত্য আমার ব্রত এবং বৃত্তি ('মিশন' এবং 'প্রোফেশন'), সঙ্গীত আমার শখ (হবি), আমার নিভৃতের সাধনা। আমার রচিত সাহিত্য আমি পরকে পড়াতে চাই ; কিন্তু আমার কণ্ঠের গান আমি অন্যকে শোনাতে চাই না, নিজেকেই শুনিয়ে নিজের স্থর-পিয়াসী আত্মাকে তৃপ্ত করতে চাই।"

শ্রীমতী হীরাবাঈর মতো অমন মধুর, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সহৃদয় শ্রোতা আমি জীবনে কমই পেয়েছি। তিনি আমার কথাগুলি শুধু কান পেতে নয় পুরো মন পেতে শুনলেন এবং বুঝলেন, বিশদ ব্যাখ্যা করে তাঁকে বোঝাতে হলো না। অনুভব করলাম আমার ভাষণ তাকে বিরক্ত করছে না, আমার আন্তরিকতা তাঁর দরদী অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে।

আমার যে কী ভালোই লাগছিল, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। ভারতের সঙ্গীতাকাশের এমন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কার সঙ্গে এমন সহজ অন্তরঙ্গভাবে কথা কইছি, এ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। সবই গুরুজি তারাপদ বাবুর কৃপায়। তাঁর স্নেহভাজন শিষ্য বলেই তো আমাকে এমন ভাবে আমল দিচ্ছেন শ্রীমতী হীরাবাঈর মতো বিরাট শিল্পী। এই ভেবে কথায় কথায় তাঁকে বললাম, "আমার জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি পুরাতন বিখ্যাত ঠুংরি গান, সেটি ওস্তাদ আবদুল করিম ও রেকর্ডে গেয়েছেনঃ যোগিয়া রাগে 'পিয়া মিলনকী আস।'..."

গানখানি অন্যান্য অনেকেরই মতোই শ্রীমতী হীরাবাঈর ও অত্যন্ত প্রিয়। তাই এর সম্বন্ধে আমার কাহিনী শুনবার জন্য তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

আমি বললাম, "গানখানা আমি প্রথম শুনেছিলাম সাত কি আট বছর বয়সে। চোঙা-ওয়ালা কলের গানের যুগে, কলকাতায় আমার প্রথম সঙ্গীত গুরু অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের বাড়িতে, যতদূর মনে পড়ছে 'জোনোফোন' মার্কা চাক্তি রেকর্ডে। গায়িকা সেকালের বিখ্যাত জোহরা বাঈ। গানখানি সম্ভবতঃ তাঁরই রচিত এবং সুরারোপিত। রেকর্ডখানি গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র ভীষণ পছন্দ করতেন এবং প্রায়ই বাজিয়ে খুব মন দিয়ে শুনতেন এবং তারিফ করতেন। জোহরাবাঈর সেই গান আমার কিন্তু তখন ভালো লাগে নি। আমার শিশু মন ভেবে পায় নি কৃষ্ণচন্দ্রের মতো অমন মধুর গায়কের কানে অমন অমধুর গান অত মধুবর্ষণ করছে কি করে। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠে গাওয়া এই গানখানাই ঢাকা শহরে একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে শুনে তার অসাধারণ করুণ মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম ১৯৩৪/৩৫ সালে।

"তার চাইতে ও বেশী গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছিলাম তার কয়েক বছর বাদে কলকাতা শহরে হাড়-কাঁপানো শীতের শেষ রাতে সারারাত্রিব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ শিল্পী সানাই-যাদুকর

বিসমিল্লা খাঁর সানাইতে এই গানটির সুর বাদন শুনে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল বিসমিল্লার যাদু সানাই প্রাণ-কাঁদানো করুন সুরে গাইছে "পিয়া মিলনকী আস।" প্রিয় মিলনের আশায় বিরহিনীর করুণ ক্রন্দন বিসমিল্লা খাঁ যেন ধ্বনিত করছিলেন তাঁর সানাইতে, সানাই কেঁদে কেঁদে বলছিল ঃ

"পিয়া মিলনকী আস।"

"আমার ধারণায় কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশকারী সঙ্গীত-সৃষ্টি-ক্ষমতার দিক দিয়ে সর্বপ্রকার সঙ্গীত-যন্ত্রেব মধ্যে সেরা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ, তারপরই সানাই। সঙ্গীত সম্মেলনে শীতের রাত্রে বিসমিল্লার সানাইতে গাওয়া 'পিয়া মিলনকী আস' আমার সাহিত্য-স্রষ্টা মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে শেষ পর্যন্ত তার ফল (কলকাতা বেতারের ভাষায় 'ফলশ্রুতি') দাঁড়াল আমার অনতিদীর্ঘ উপন্যাস 'সানাই', যার কাহিনীর কেন্দ্র হচ্ছে ভারতের সঙ্গীত জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়ে বাকি জীবনের জন্য পবিত্র মদিনা তীর্থে চলে যাবার আগে ভূতপূর্ব বিরাট ধনী জমিদার উদয়নারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র কন্যার বিবাহ উৎসবে সানাই-সম্রাট মকবুল হোসেন খাঁ সাহেবের শেষ সানাই বাদন।

"উপন্যাসটি এক প্রভাত থেকে অন্য প্রভাত পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনী! মাঝে মাঝে কিছু বিশ্রাম-বিরতি বাদে এই চব্বিশ ঘণ্টা সানাই সম্রাটের জীবনের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সানাই-সঙ্গীত পরিবেশনে মুখরিত। একই সানাই সঙ্গীত উপন্যাসটির বিভিন্ন চরিত্রের মনে বিভিন্ন রকমের অনুভূতি জাগাচ্ছে, এবং উপন্যাসটির শুরু ও শেষ দুই প্রান্তের দুই প্রভাতে সানাই সম্রাটের সানাইতে বেজে প্রত্যেক শ্রোতাকে অভিভূত করেছে একই গান ঃ

"পিয়া মিলনকী আস।"

শ্রীমতী হীরাবাঈকে বললাম, "আমার এই উপন্যাসটি আমার সঙ্গীত গুরু তারাপদবাবুর ভীষণ ভালো লেগেছিল বিশেষ করে এই গানটির কারণে।"

এই প্রসঙ্গে তাঁকে সংক্ষেপে বললাম তারাপদবাবুর জীবনের প্রথম দিকের কঠিন দিনগুলির কথা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মতোই তারাপদবাবুকেও নানা দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধ হতে হয়েছে। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ভারতের এই দুই রত্ন যেভাবে প্রচুর দুঃসহ দুর্ভোগ সহ্য করে বিজয়ী হয়েছেন, সঙ্গীত সাধনার ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

পিতৃহারা তারাপদবাবু কলকাতায় এসে মামাবাড়ির আশ্রয় থেকে গান শিখতে লাগলেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর তখনকার গুরু সাতকড়িবাবু এবং অন্যান্য সেরা গায়কদের গান শুনে তিনি বাড়ি ফিরতেন অসময়ে, যাতে বাড়ির লোকদের অসুবিধা হতো বলে মামা কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করেছিলেন। তাতে অপমানিত বোধ করে তারাপদবাবু মামাবাড়ির আশ্রয় পরিত্যাগ করে নির্দিষ্ট আশ্রয়-হীন অবস্থায় পড়েন, রাত কাটাতেন ফুটপাথে বা কোনো বাড়ির রকে। কোনোদিন আহার জুটত, কোনদিন অনশনে বা অর্দ্ধাহারে থাকতে হতো। এই অবস্থায় তিনি একবার এক পুলিশ কন্‌স্টেব্‌ল্ এর সন্দেহ দৃষ্টিতে পড়েন। তারাপদ বাবুর ভাষায়ঃ

"আমাকে ভাগ্যাবণ্ড, ক্রিমিন্যাল বা সন্ত্রাসবাদী ভেবেই হয়তো সেই পাহারাওয়ালা আমাকে ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজত বাস করাতে চেয়েছিল। আমি তাকে বললাম আমি নিরীহ গরিব ব্রাহ্মণ সন্তান, গান টান করি, কলকাতায় এসেছি আরো ভালো করে গান শিখব। সে বিশ্বাস করতে চায় না, পাকড়াও করে থানায় নিয়ে যেতে চায়। তখন আমি যে সত্যিই গায়ক সেটা প্রমাণ করার জন্যই একটি গান তাকে গেয়ে শোনালামঃ 'পিয়া মিলনকী আস।'

গানটি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল। পাহারাওয়ালা বলল, "ভাই, একি গান তুমি আমায় শোনালে? তুমি এত বড় গুণী, আর তোমার এই দুরবস্থা? আজ থেকে আমি তোমার দোস্ত হলাম।"

এই গরিব পাহারাওয়ালা দোস্ত দিয়ে কিছু উপকার হয়েছিল আশ্রয়হীন তারাপদবাবুর। গান শেখাবার বিনিময়ে একটি থাকবার

আশ্রয় ঠিক করে দিয়েছিল সে। আহারের ব্যবস্থা তারাপদবাবুর নিজেকেই করে নিতে হতো। যেদিন পারতেন না, সেদিন অনাহার।

কত কঠোর দুঃখ-দুর্দশার অগ্নি পরীক্ষায় অসাধারণ চরিত্র বলে উত্তীর্ণ হয়ে তারাপদবাবু সঙ্গীতাচার্য হয়েছেন, সেই গৌরবময় কাহিনী শ্রীমতী হীরাবাঈকে শোনালাম বোধ হয় আমিই প্রথম।

সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর জীবনকে ভিত্তি করে যে বাংলা সাহিত্যে একটি চমৎকার জীবনোপন্যাস রচিত হতে পারে, এ বিষয়ে 'জীবন কাহিনীর নায়ক' নিবন্ধে* সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন :

"বানানো গল্প-উপন্যাস বাংলায় ঢের হয়েছে। কিন্তু ভ্যান গগ বা লুত্রেকের মত শিল্পীর জীবন নিয়ে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, বাংলায় তার কোনো চেষ্টাই হয় নি।

'সাহিত্যে-সঙ্গীতে-শিল্পে যাঁরা সহজ পথে অতিখ্যাত, আমাদের চোখের সামনে শুধু সেই নামগুলিই ভেসে ওঠে। কিন্তু জীবন কাহিনীর নায়কের চরিত্র ভিন্ন। তিনি জন-সাফল্যে উজ্জ্বল নন, সিদ্ধিতে জ্যোতিষ্ক। তাঁর সাধনার পথ ওস্তাদের কাছে নাড়া-বাঁধার মতো পাতা রেল লাইন নয়। অর্থাৎ যে সাধারণ মানুষটি অসাধারণ গুণের গুণীন, যাঁর সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ সাধারণ মানুষের মতই, অথচ যাঁর তপস্যার মুহূর্তগুলি অসাধারণ, একমাত্র তিনিই হতে পারেন জীবন কাহিনীর নায়ক। অন্য সার্থক সফল শিল্পীরা যত মহৎ হোন না কেন, তাঁদের চিরকালই শিশু-পাঠ্য জীবনীর কারাগারেই বন্দী থাকতে হবে। জীবন সাহিত্যের আলোকে-আলোকিত হতে পারেন শুধু জীবন-শিল্পীরাই।

"জীবন কাহিনীর নায়কের সন্ধান করতে করতে আমি একজন মাত্র শিল্পীকে খুঁজে পেয়েছি। তিনি সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী।

---

* সঙ্গীতাচার্যের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উৎসবের স্মারক পত্রিকায় প্রকাশিত।

খ্যাতিলোলুপ সঙ্গীতজ্ঞদের ভিড়েও খ্যাতি তাঁর দিকে আপনা থেকেই ধাবিত হয়েছে। দারিদ্র্যকে তিনি জয় করেছেন, কিন্তু ঐশ্বর্যকে আসন পেতে ডেকে আনেন নি। নিষ্ঠাকে তিনি আয়ত্তে আনেন নি, নিষ্ঠা তাঁর চরিত্রের ধর্ম। এমন একটি নাটকীয় জীবন, অথচ সমস্ত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের নীচে একটি শান্ত স্থৈর্যের স্রোতস্বতী! তাঁকেই আমি জীবন-কাহিনীর নায়ক বলেছি, তার কারণ, তাঁর সাধনা, তাঁর সিদ্ধি—বাংলার সঙ্গীত-জীবনের প্রতীক।"

বিশিষ্ট সঙ্গীত-সাধক কুমারেশ বসু মহাশয় লিখেছেন ঃ

"সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী আজ অসাধারণত্বের উচ্চাসনে সমাসীন।—সঙ্গীতজ্ঞ-সমাজে তিনি বিশ্লেষণ ও গবেষণার বস্তু হয়ে বিবাজ করছেন। দুর্জনেরা অবশ্য তাঁর অস্বাস্থ্য পান ও অমঙ্গল কামনা করে আসছেন।

"দুঃখ, দারিদ্র্য, নৈরাশ্য, উপেক্ষা প্রভৃতি উচ্চস্তরের শিল্পীদের জীবনে প্রকট ভাবে দেখা দেয়, এবং তাঁরা সেগুলিকে অদম্য শক্তিতে পরাভূত করেন। আমার বন্ধুবর সঙ্গীতাচার্যকেও এদের ভয়াবহ আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বন্ধুবরের প্রতিভা অসাধারণ বলে বিশেষ করে সঙ্গীতজ্ঞ-সমাজের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের বাণে বার বার তাঁকে জর্জরিত হতে হয়েছে। ভগবদ্ ভক্তি ও অদম্য অধ্যবসায়ের অভেদ্যবর্ম শিল্পীবরকে ঘিরে থাকায় তাঁকে ওগুলি কোনোদিনই শক্তি-হীন বা মুহ্যমান করতে পারে নি।···

" 'সুর ব্রহ্ম' এই বদ্ধমূল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করে সঙ্গীতাচার্যের মতো সঙ্গীতের সাধনায় অগ্রসর হতে অন্য কোনো শিল্পীকে আমি অন্ততঃ দেখি নি। শ্রুতির সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে সঠিক অনুভূতি আয়ত্ত করবার মানসে কি কঠোর সাধনাই না তিনি করে আসছেন। বাইশটি শ্রুতির কোনো একটি কর্মযোগে এই সাধকের মনঃপূত না হলে তাঁর ধারণানুযায়ী ঐ শ্রুতির সূক্ষ্মতা আয়ত্তের চেষ্টায় তিনি মুহূর্তমাত্র বিরত হন না। তাই আজ তাঁর মত সুরেলা শিল্পী ভারতে অতি বিরল।......"

"সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি জনকল্যাণকর বিষয়ে পারদর্শী অতিমানবেরা আশৈশব একনিষ্ঠাযুক্ত কর্ম ও সাধনার প্রভাবে জয়যুক্ত হয়ে অবশেষে সমাজের কল্যাণ-বিধানে সমর্থ হন। জীবনের একটি মুহূর্তও তাঁদের অপব্যয়ে অতিবাহিত হয় না। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীও চিরদিন সঙ্গীতের কর্মযোগে লিপ্ত থেকে আচার্য বলে স্বীকৃত হয়েছেন। গান গাওয়া, গান রচনা করা, গান নিয়ে আলোচনা করা প্রভৃতি এই সাধকের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত হয়ে আছে যে সমাজে প্রচলিত সাধারণ মানবের আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে অশক্ত হয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রে নন্দিত না হয়ে নিন্দিত হয়ে থাকেন।

"দারিদ্র্যের দুঃসহ কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে জীবনের আদর্শকে ধূলিসাৎ করে অনেক শিল্প-প্রতিভা অর্থের প্রলোভনে নিজেকে বিকিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। পক্ষান্তরে এই সাধকের সত্যের তেজ এত প্রজ্বলিত যে মরণ পণ সংগ্রামে তিনি দুঃখ-দারিদ্র্যকে পরাভূত করে সঙ্গীতে সিদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। লোকনিন্দা তিনি গ্রাহ্য করেন না, এবং দুর্জনের অবহেলায় তিনি বিচলিত হন না। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই বাণী সঙ্গীতাচার্যের জীবনের পুঁজির প্রধান সম্পদ।"

বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষ তাঁর "আধুনিক যুগে বাংলা গান" নিবন্ধে লিখেছেন: "ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। বহু লোকে তাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু অনেকের হয় তো তাঁর কণ্ঠে বিভিন্ন ধরনের বাংলা গান শুনবার সৌভাগ্য হয় নি। আমার হয়েছিল। রাগ-সঙ্গীতের পূর্ণ ঐশ্বর্য ছিল তারাপদ বাবুর গানে, কিন্তু আজকের দিনেও এমন কোনো আধুনিক কারুকার্য নেই যা সেদিন তারাপদ বাবুর আধুনিক গানে ছিল না। তারাপদবাবুর মুখে শোনা সুমধুর বাংলা গান আজও কানে বাজে। মনে হয় সে গান যদি বেশী পরিমাণে শোনা যেত তাহলে বাংলা দেশের আধুনিক সঙ্গীত-সংস্কৃতি বিশেষভাবে লাভবান হতো।"

এই প্রসঙ্গে সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর 'সুরতীর্থ' গ্রন্থটি স্মরণে আসে। এতে সংকলিত ৫৪টি গীতি-কবিতা তাঁর রোমান্টিক কবি মনের এবং গীত রচনা প্রতিভার পরিচয় দেয়। নীচে তাঁর গানের রেকর্ডের তালিকা দেওয়া হলো। দুধের স্বাদ ঘোলে পাওয়া যায় না, কিন্তু রেকর্ডগুলি শুনলে তা থেকে সঙ্গীতাচার্যের গায়ন শৈলীর বৈশিষ্ট্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

তারাপদ চক্রবর্তীর রেকর্ডের তালিকা ঃ

বাংলা

আমি পাবো না শ্যামেরে পাবো না (বেহাগ), ঝরা ফুলের এই মালাটি (মিশ্র গারা), তব চরণ তলে দিব জীবন ডালি (মালকোষ), ঝোরো না ঝোরো না ঝোরো না আঁখি (ভৈরবী), পথ ভোলা ঐ মাতাল হাওয়ায় (রাগ প্রধান), কাল বলে কালা গেল মধুপুরে (কীর্তন), শাওন মেঘমায়া ছাইল (আল্লাহিয়া বিলাবল), ফুলে ফুলে কি কথা (গুর্জরী টোড়ি), খোলো খোলো মন্দির দ্বার (মিশ্র তিলং), চামেলি মেল আঁখি (ভূপালী টোড়ি), ফাগুনের সমীরণ সনে (দুর্গা), বনে বনে পাপিয়া (বাহার), কোথা গেল শ্যাম (মিশ্র ভৈরবী), মঞ্জুল মাধবী ফাল্গুন রাতে (রাগ প্রধান), ওগো মম ধ্রুবতারা (মালকোষ)।

হিন্দী

হে মাধব মধুসূদন (কৌশীক কানাড়া), গাগরী না ভরণ দেব (গারা ঠুংরি), মৌমদ শা দরবার (গুর্জরী টোড়ি), আয়সি চঞ্চলনার।

সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী বাংলা দেশের (আমি অবিভক্ত সম্পূর্ণ বাংলা দেশের কথা বলছি) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এদেশে বাংলা খেয়াল গানকে তিনিই প্রথম সর্বভারতীয় স্তরে উন্নীত করেন। তাঁর আগে বঙ্গদেশে এমন নিটোল পূর্ণাঙ্গ খেয়াল আর কেউ গান নি। তাছাড়া বিলম্বিত লয়ের খেয়াল গানকেও তিনি নতুন রূপ দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাতেও যে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল গানের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য সহ গাওয়া যায়, তিনি তা

উচ্চ মানের একাধিক পূর্ণাঙ্গ বাংলা খেয়াল গেয়ে প্রমাণ করেছিলেন।

কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে ২৪২ নং প্রিন্স্ আনোয়ার শাহ্ রোডে সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর বাড়িটির নাম তাঁর উদ্ভাবিত নতুন রাগের নাম অনুসারেই 'ছায়া-হিন্দোল'। এই ছায়া-হিন্দোলেই সঙ্গীতাচার্য ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নহৃদয়ে ইহজগত থেকে বিদায় নেন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৫ তারিখে। তাঁর তখন জীবনে মাত্র ৬৬টি বছর পূর্ণ হয়েছিল। যে স্বীকৃতি, যে মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য ছিল, তার এক-দশমাংশও তিনি পেলেন না, এই ক্ষোভ নিয়েই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো, সখেদে এই উক্তি করেছিলেন সঙ্গীত-বিশারদ রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯১৫ সালে তিনি দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রাপ্তির জন্য তিনি মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে এই বহু-বিলম্বিত সরকারী সম্মান অসম্মানেরই নামান্তর মনে করে তিনি উপাধিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি একমাত্র পুত্র মানসকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি এই সরকারী সম্মান প্রত্যাখ্যান করলে তা ভবিষ্যতে তাঁর সন্তান বলে মানসের অনুরূপ সরকারী সম্মান প্রাপ্তির পথে বাধা হতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে এক্ষেত্রে তাঁর কি করা উচিত?

মানস বলেছিল, "পিতার সম্মান সন্তানের কাছে তার নিজের ভবিষ্যতের চাইতে অনেক বড়ো। তোমার সম্মান যাতে একটুও ক্ষুণ্ণ না হয় তুমি তাই করো।"

পুত্রের সম্মতি পেয়ে সঙ্গীতাচার্য 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এখন তিনি এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অতীত। মৃত্যুর পূর্ববর্তী মধ্য রাতে একমাত্র পুত্র (এবং অন্যতম শিষ্য) মানসকে কাছে ডেকে তাকে শেষ আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন: "একনিষ্ঠ সাধনার বলে তুমি যে সাফল্য লাভ করেছ, তাতে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমাদের

চক্রবর্তী পরিবারের বহু সাধনায় অর্জিত সঙ্গীত ঐতিহ্যের তুমি যোগ্য অধিকারী হতে পেরেছ, অনলস সাধনায় তুমি তাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে। এই বিশ্বাস নিয়েই আমিপরম শান্তিতে বিদায় নিচ্ছি।"

তার আগে পুত্রকে তিনি একটি অতি মূল্যবান উপদেশও আবার মনে করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর প্রত্যেক শিষ্য শিষ্যাকেই দিতেন। সেটি তাঁর নিজের উক্তি থেকেই উদ্ধৃত করি ঃ

"শুধু সুকণ্ঠ হলেই উচ্চ মানের গায়ক হওয়া যায় না। অনেকে প্রতিভার কথা বলেন. কিন্তু ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাই তো যথেষ্ট নয়। অনেক মেহনৎ করে কণ্ঠ-সাধনার দরকার এবং সঙ্গীতের সাধনার একটা স্তরে উঠে বসে থাকা চলে না। রীতিমতো অভ্যাস (বা 'রিয়াজ') রাখাই অত্যন্ত আবশ্যক। নইলে অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা।"

সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী সম্পর্কিত আলোচনায় অপরিহার্য-ভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গীত জগতের অন্যতম অসাধারণ ব্যক্তি বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (১৯০৯—১৯১৫) মহাশয়ের কথা, সেতার-বাদনের ক্ষেত্রে যিনি 'কচিবাবু' নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং সেতারে একটানা তেরো বছর নিবিড়ভাবে তালিম পেয়েছিলেন সেকালের সেতার-সম্রাট ওস্তাদ ইনায়েৎ হোসেন খাঁ (১৮৯২—১৯১৫) সাহেবের কাছে।

তার আগে তিনি কৈশোরে এসরাজ বাদনে সেকালের বিখ্যাত এস্রাজী শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং খেয়াল গানে শীতল কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কাছে তালিম নিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েই তিনি কলকাতা বেতারের নিয়মিত সেতার-শিল্পী হন।

তাঁর প্রচুর শ্রমসাধ্য দীর্ঘ গবেষণার ফল "ভারতীয় সঙ্গীতকোষ" নামক ১৯১৫ সালে প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থটি ১৯১৫ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯১৫ সালে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ বইটির হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করেন।*

* সঙ্গীতপ্রেমী গবেষক এবং সেতার বাদক শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়

আমার সঙ্গে কিন্তু কচিবাবুর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল ভূতপূর্ব প্রথম শ্রেণীর অপেশাদার যাতুকর (ম্যাজিশিয়ান) বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী রূপে, সঙ্গীতশিল্পী এবং সঙ্গীতশাস্ত্রীরূপে নয়। ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে আমি যাতুবিদ্যার ইতিহাস এবং দেশ বিদেশের বিশিষ্ট যাতুকরদের বিচিত্র জীবনের নানা কাহিনী নিয়ে আমার "যাতুকাহিনী" গ্রন্থটি রচনা করছিলাম, যেটি পরে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়ে ১৯১৫ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নরসিং দাস' পুরস্কার পেয়েছিল বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় রচিত সর্ব প্রথম যাতু-সাহিত্য-গ্রন্থ রূপে। গ্রন্থটির রচনা কালে (১৯৫৯-৬০) টালিগঞ্জে আমার গরিবখানায় প্রায়ই পদার্পণ করে তাঁর যাতুজীবনের নানা কাহিনী শোনাতেন বন্ধুবর যাতু সম্রাট পি. সি. (প্রতুলচন্দ্র) সরকার (১৯১৩-১৯১৫)। তিনি এবং আমি একই সময়ে স্কুল জীবনে (১৯২৭) আধুনিক যাতু চর্চা শুরু করেছিলাম সেকালের তুজন অসাধারণ যাতুকরের অসাধারণ যাতু প্রদর্শন দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাঁরা ছিলেন যাতুকর গণপতি (মৃ. ১৯৩৯) এবং 'রয় দি মিস্টিক' নামে খ্যাত যতীন্দ্র নাথ রায় (১৮৯১-১৯১৫)। একদিন সকাল বেলায় বন্ধুবর পি. সি সরকারের বিচিত্র যাতুজীবনের অতিশয় চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচারণ শুনছি, এমন সময় পাশের ঘরে বেতার যন্ত্রে ঘোষণা শোনা গেল ঃ এবার ভৈরবী রাগিণীতে সেতার বাজিয়ে শোনাবেন বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। সরকার সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলা মুলতুবি রেখে সাগ্রহে বললেন, "বাজনাটা শোনা যাক।"

তন্ময় হয়ে বাজনা শুনলেন যাতু-সম্রাট। শেষ হতেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, "কেমন লাগল ?"

আমি বললাম, "খুব ভালো।" সত্যিই বিমলাকান্ত বাবুর বাজাবার স্টাইলে যে বিমলাকান্তী (আসলে বোধ হয় ৺ইনায়েতী)

কর্তৃক ঘরানা তালিকার সংশোধন ও সংযোজন সহ ১৩৯১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন বিমলাকান্ত কর্তৃক ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইমদাদখানী স্কুল অব সিতার-এর পক্ষে তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীসুভাষ চন্দ, যিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর 'গুরুজির সঙ্গীত ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন।

বিশেষত্ব ছিল, তার আবেদন ছিল বলিষ্ঠ, সুস্পষ্ট, সরল, শান্ত, গভীর। আধুনিক অনেক স্টাইলের মতো শস্তা চমকের বা বৈচিত্র্যের কোনো-রূপ প্রয়াস তাতে ছিল না।

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার বললেন, "সেতারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ সেতারে তাঁর পুরো মন, মেহনৎ আর সময় দেবার জন্যই বিমলাবাবু ম্যাজিক ছেড়েছিলেন। উনি ম্যাজিকে লেগে থেকে যাদুমঞ্চে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে আমি ম্যাজিকে এমন পসার জমাতে পারতাম না।"

খবরটি আমার কাছে একেবারে নতুন। বেতারে বিমলাকান্তর সেতার-বাদন তার আধুনিক-চাপল্যহীন সরল সৌন্দর্যের জন্য আমার অত্যন্ত ভালো লাগত, কিন্তু সেই ভালো লাগা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা জাগায় নি আমার মনে। কারণ কণ্ঠ সঙ্গীত আমাকে যত আকর্ষণ করে, যন্ত্রসঙ্গীত তত নয়। কিন্তু বাল্যকাল থেকে দুরারোগ্য যাদুনেশাগ্রস্ততার শিকার আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম ভূতপূর্ব যাদুকর বিমলাকান্তর সঙ্গে পরিচিত হতে, বিশেষ করে যখন মনে হলো আমার 'যাদু কাহিনী' গ্রন্থের জন্য অনেক মূল্যবান তত্ত্ব এবং তথ্য তাঁর কাছ থেকে পেতে পারব। পেয়েছিলাম। অনেকটা তারই ফল (বেতারের পরিভাষায় 'ফলশ্রুতি') দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার গ্রন্থটির নরসিং দাস পুরস্কার (১৯১৫) প্রাপ্তি।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগেই তিনি যাদু-চর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন; আর সেই সঙ্গে তাঁর আরেকটি দীর্ঘকালের নেশা জ্যোতিষ (Astrology) চর্চা। চলচ্চিত্র পরিচালক হবার প্রচণ্ড শখও ছিল তাঁর; তাই কিছুকাল তাঁর আত্মীয় সেকালের বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর সহকারী রূপে কাজও করেছিলেন ১৯৪৮ সালে তিনি অন্য সব নেশা ছেড়ে দিয়ে একনিষ্ঠভাবে সেতার সাধনায় মনোনিবেশ করলেন এবং তাঁর সেতার-শিক্ষার গুরু ইনায়েৎ খাঁর পিতা আধুনিক সেতারের জনক ইমদাদ খাঁ (১৮৪৮-১৯২০) সাহেবের স্মৃতির সম্মানে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইমদাদখানী স্কুল অব সিতার।'

বিমলাকান্ত লণ্ডনের ম্যাজিক সার্কল্ (Magic Circle) নামক যাদুকর সংস্থার আজীবন সদস্য (Life Member) ছিলেন। তাঁর সংগ্রহ থেকে যাদু সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়ে তিনি আমার যাদু-গ্রন্থ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন, যাদের একটি চীনা ভাষায় লিখিত। আমি তাগিদ দিয়ে 'মায়ামঞ্চ' যাদু-মাসিকপত্রে তাঁকে তাঁর যাদু-জীবনের স্মৃতিকথা ধারাবাহিকভাবে লিখিয়েছিলাম। বাংলার যাদু-সাহিত্যে সেটি একটি মূল্যবান সংযোজন। যাদুকর বিমলাকান্ত সম্বন্ধে আমি 'যাদু-কাহিনী' গ্রন্থে লিখেছি।

১৯১৯ সালে যখন আমাব 'যাদুকাহিনী' বইটি বেরিয়ে গেল (যার রচনায় তাঁর কাছ থেকে প্রচুর মূল্যবান সহায়তা পেয়েছিলাম), তারপর তিনি আর যাদু সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজি হন নি; বলেছিলেন, "ম্যাজিক চিরকালের জন্য বর্জন করেছি। এখন থেকে আপনার সঙ্গে সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না।"

এবং তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হতো শুধু সঙ্গীত সংক্রান্ত বিষয়ে।

আমি বিমলাকান্তবাবুর সঙ্গে প্রথম নিজেকে পরিচিত করেছিলাম তাঁর বেলতলা রোডের বাড়ির তিনতলার একা ঘরে। তারপর সাংসারিক বাস্তব বোধহীন শিল্পীমনা এই অসাধারণ মানুষটি সেই বাড়িটির মালিকানা হারিয়ে ভবানীপুরের একটি গলিতে (যদিও তার নাম নন্দন রোড) গ্যারাজের ওপর ছোট একটি ঘরে ভাড়াটে রূপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। একমাত্র সঙ্গী-সহায়ক একটি হিন্দী-ভাষা-ভাষী কিশোর, একদেহে ভৃত্য এবং পাচক। গৌরীপুরের (পূর্ব বাংলা) বিখ্যাত ধনকুবের সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অতি আদরের দৌহিত্র আভিজাত্য-পূর্ণ উচ্চমানের বিলাসবহুল জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত বিমলাকান্তের শেষ জীবনে এই অবস্থা দেখে আমি মনোবেদনা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ বিমলাকান্ত তাঁর অবস্থা-বিপর্যয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হন নি, হাসিমুখে আনন্দের সঙ্গেই তাকে মেনে নিয়েছিলেন। সাত নম্বর নন্দন

রোডের ঘরটি ছোট হলেও সেটিকে অতি সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছিলেন শিল্পী বিমলাকান্ত। ঘরের দেয়ালগুলির গায়ে হেলান দেওয়া র‍্যাকের তাকে তাকে সঙ্গীত এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের বই সাজানো। মেঝের ওপর ফরাস বিছানো। একপাশে বিছানা গুটানো, অদূরে দেওয়ালের কাছাকাছি বাঁয়া-তবলা সেতার। সব কিছু ঐ অল্প জায়গার মধ্যেই অতি সুন্দরভাবে গোছানো—ঘরে ঢুকলেই অনুভব করা যায় এখানে একজন খাঁটি সাধক শিল্পী বাস করেন। ভাগ্যের পরিহাস তাঁকে কিছুমাত্র বিব্রত বা বিষন্ন করতে পেরেছে বলে মনে হয়নি।

সুখী সাংসারিক জীবন বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি, তা তিনি পান নি। কিন্তু তাঁর সাত নম্বর নন্দন রোডের গ্যারাজের ওপর ছোট্ট যে ঘরটিতে তাঁর সঙ্গে বহুবার বসে সঙ্গীত এবং জীবন-দার্শনিক আলোচনায় প্রভূত আনন্দ এবং জ্ঞান লাভ করেছি, সেই ঘরেই একদিন তিনি কবি গুরুব একটি গানের লাইন স্মরণ করে আমাকে বলেছিলেন :

"কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি। বরং কি পেয়েছি, তার হিসেব মিলিয়ে আমি বেশ আনন্দে আছি। ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে নিয়মিত এসে তালিম নিয়ে যায়। আমার প্রাতঃস্মরণীয় ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের কাছ থেকে যে অমূল্য তালিম আমি পেয়েছি, সেই সম্পদ আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদের মর্মে সঞ্চারিত করে দিতে আর হাতে তুলে দিতে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। বিড়লা আকাদেমির সঙ্গীত বিভাগে সেতারের ক্লাস নিই। কলকাতা বেতারে মাঝে মাঝে বাজাই, ওস্তাদের কাছে তালিম পাওয়া চিজ যথাসম্ভব বিশুদ্ধতা রক্ষা করে বাজিয়ে শোনাই। এতে আমি অসীম আনন্দ পাই ; এ থেকে যে আয় হয় তাতেই আমার মোটামুটি চলে যায়। 'ইমদাদখানী স্কুল অব সিতার' প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে আমার এই বাসনা, যে, সেতার-বাদনে আমার ওস্তাদের স্টাইলটা যেন বঙ্গদেশে চালু থাকে। আমি চলে গেলে আমার প্রিয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে চালু রাখবে আমার প্রিয় শিষ্য সুভাষ চন্দ।"

আনন্দের বিষয় সুভাষবাবু তার গুরুজির আশা পূর্ণ করেছেন।

আমার সঙ্গীত-গুরু সঙ্গীতাচার্য ৺তারাপদ চক্রবর্তী সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা-পন্থী (purist) এবং নিখুঁতত্ব-প্রয়াসী (perfectionist) বলে তিনি তারাপদবাবুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন কারণ তাঁর নিজেরও সঙ্গীতাদর্শ ছিল রাগরাগিনীর বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং সঙ্গীতের প্রতিটি অঙ্গের নিঁখুত প্রয়োগ। তারাপদবাবুর মুখেও কচিবাবুর (বিমলাকান্ত) সঙ্গীত প্রতিভার এবং গবেষণার প্রশংসা শুনেছি।

বিমলাকান্তবাবুর আবেকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি বিদেশে সেতার সঙ্গীতের মাহাত্ম্য প্রচার। ১৯১৫ সালে জার্মানির কলোন (Cologn) বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে কয়েকটি অধিবেশনে তিনি সেতার ও সুরবাহার বাজিয়ে শোনান এবং ভারতীয় রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং সেতার ও সুরবাহার বাদন সম্বন্ধে বিশেষভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেন পাশ্চাত্য শ্রোতাদের উপযোগী করে। তারপর ইউরোপের বিভিন্ন শহরে সঙ্গীত পরিবেশন এবং ভাষণ সফরে তিনি খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোর্ড অব মিউজিক্যাল স্টাডিজ'-এর চেয়ারম্যানের পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮–১৯২৬) ছিলেন বিমলাকান্তের পিতামহী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী চৌধুরাণীর সহোদর ভ্রাতা। চরম অবস্থায় তাঁর স্বজনবৃন্দ তাঁকে স্থানান্তরিত করেন নাটোরের মহারাজার কলকাতা ভবনে।

সেখানে জীবনের শেষ কয়েকটি দিন অসুস্থ অবস্থায় কাটিয়ে তিনি ৫ জুলাই ১৯১৫ তারিখে দেহত্যাগ করেন। তাঁর আগে ১৯১৫ সালে পরলোকে চলে গিয়েছিলেন সঙ্গীতাচার্য তারাপদ। দুজনই বয়সে আমার চাইতে তিন বছরের বড়, প্রতিভায় এবং কৃতিত্বে আরো অনেক বেশী বড়। বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীত-চর্চার ইতিহাসে তাঁরা দুজনই সগৌরবে বেঁচে থাকবেন। তবু তাঁরা দুজনই আমাকে বন্ধু রূপেই গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।